প্রকাশ : ১৩৬৭ রাসপূর্ণিমা

প্যাপিরাস-এর পক্ষে
অরিজিৎ কুমার প্রকাশিত ও
প্রিন্টেক, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা ৪
থেকে শিবনাথ পাল মুদ্রিত।
বেঁধেছেন দীনেশ বিশ্বাস
১৯/১ই পাটোয়াবাগান লেন, কলকাতা ৯

সূচি

বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্যচর্চা :

উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়

প্রাচীন বাঙলার গৌরবের খতিয়ান করতে বসে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংস্কৃতচর্চার উল্লেখ করেছিলেন। সামবেদীয় পণ্ডিত ভবদেব, বেদব্যাখ্যাতা হলায়ুধ, গুণবিষ্ণু, সায়ন ও বাচস্পতি মিশ্র ; প্রশস্তপাদের টীকাকার দার্শনিক শ্রীধর ; স্মৃতিকার গোবিন্দরাজ, জীমূতবাহন, জিকন, শ্রীকর ; জ্যোতিষে জোগ্লোক, অন্ধ্রকভট্ট ও শ্রীনিবাস প্রমুখ আচার্যদের নাম উল্লেখ করেছিলেন তিনি। এঁরা শাস্ত্র শুধু স্মৃতিধার্য করে রাখেননি ; শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন, 'তাহারা যেটুকু পড়িত অর্থ করিয়া পড়িত ; নিজের কর্মকাণ্ডের জন্য যতখানি জানা দরকার সবটুকু বেশ ভাল করিয়া পড়িত।'[১] অর্থাৎ জীবনের সঙ্গে বিদ্যার সজীব এক সম্পর্ক ছিল বাঙালির পঠনপাঠনে।

কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরু (১২০১) থেকে একদিক্রম তুর্কি আক্রমণ চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুলতানী শাসনের প্রতিষ্ঠা (১৩৪৫) পর্যন্ত বাঙলার সামাজিক স্থিতিকে বিচলিত করে তুলেছিল। আবার পাঠান রাজশক্তির পতন ও মোগল রাজশক্তির উত্থানের পর্বে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৫৩৮-৭৬) ক্রান্তসন্ধির সামাজিক দুর্লক্ষণ প্রবল হয়ে উঠেছিল সুবা বাঙলায়।

অবশ্য মনে রাখতে হবে, সংস্কৃতের চর্চা মধ্যযুগের বাঙলায় সঙ্কীর্ণ ও স্তিমিত হয়ে এলেও অশ্রদ্ধেয় হয়ে পড়েনি কোনভাবে। বরং মনে হয়, ব্যাপ্তি কমে এল বলেই, বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্ডিতদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লোকমুখে প্রচারিত হতে পেরেছিল। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, সংস্কৃতবিদ্যা এইসময়ে মূলত তন্ত্র, নব্যন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রের চর্চাতেই নিবদ্ধ ছিল। ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙালির সংস্কৃতচর্চার প্রধান কীর্তিগুলো বিচার করলেও দেখা যাবে, সাহিত্যের চর্চা সেখানে ছিল গৌণ। তবে মুকুন্দরাম, বৃন্দাবনদাস, রূপরাম বা ভারতচন্দ্রের কাব্যে সংস্কৃত কবি-নাট্যকার ও তাঁদের গ্রন্থরাজির ইতস্তত উল্লেখ থেকে মনে করা

১ 'প্রাচীন বাংলার গৌরব' (কলিকাতা ১৩৫৩), পৃ ৪৮

যায়, সমাজের বিদগ্ধ শ্রেণীতে সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার অভাব ছিল না। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের প্রবহমান ধারার সঙ্গে তার সংযোগ কখনও ওতপ্রোত হয়ে ওঠেনি। শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী এই বিচ্ছেদের কয়েকটি কারণ নির্দেশের চেষ্টা করেছেন :[১]

১ মুসলমান শাসকবর্গ আরবি-ফারসি ছাড়া অন্য ভাষায় ধর্মবিরহিত কাব্য বা গীতাদির আস্বাদনকে পাপ বলে গণ্য করতেন। প্রয়োজনে হিন্দুর ধর্ম-সাহিত্য 'ভাষা'য় শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করলেও 'দেবভাষা'র রসসাহিত্য শোনার উৎসাহ তাঁদের ছিল না। এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিরেকে দেশীয় পণ্ডিতবর্গ রসসাহিত্যের চর্চায় সাহস সঞ্চয় করতে পারেননি।

২ ধর্মীয় অপঘাত থেকে সমাজ ও সংস্কৃতি রক্ষায় মনোযোগী হতে হয়েছিল বলেই রসসাহিত্য সৃষ্টির অবকাশ পাননি স্বদেশীয় কবি ও কোবিদেরা। বিপর্যয়ের সময় মানুষ ধর্মকেই আঁকড়ে ধরে ; তাই সে-যুগে সাহিত্য হয়েছে ধর্মকেন্দ্রিক, রসপ্রধান নয়।

৩ বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিরা ছিলেন হয় বৌদ্ধ, নয় নিম্নবর্ণের হিন্দু। উভয়েই লৌকিক সংস্কারের বাহক, ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের প্রতি বীতরাগ। পুরাণাশ্রয়ী সংস্কৃত রসসাহিত্য এমন অবস্থায় প্রকাশের পথ খুঁজে পায়নি।

৪ সংস্কৃত রসসাহিত্যের আদিরস আত্মসাৎ করেও বাংলা বৈষ্ণব কবিতা চৈতন্য-চরিতের অবলম্বন পেয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের আবেদনকেও ম্লান করে দিয়েছিল।

৫ একদিকে মুসলমান শাসকদের নাট্যকলা-বিরোধিতা, অন্যদিকে সংস্কৃত নাট্য-কলার ব্যয়বাহুল্যের জন্য স্বল্পব্যয়ের লৌকিক নাটযাত্রা জনপ্রিয় হওয়ায় সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের আকর্ষণ স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল।

৬ সংস্কৃত কথা-সাহিত্যের স্বাদ অনেকাংশেই পূরণ করেছিল আখ্যানমূলক বাংলা মঙ্গলকাব্য। ফলে সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের অনুবর্তনের কোন প্রয়োজন বোধ করেননি বাঙালি লেখকেরা।

মধ্যযুগের বাংলায় সংস্কৃত রসসাহিত্যের অপ্রসারতার অন্তরঙ্গ কারণ হিশেবে এই সূত্রগুলি মেনে নিয়েও বলতে হয়, বিভাষী শাসকসম্প্রদায়ের অনুগ্রহ-আনুকূল্য লাভের দাস্য মনোভাবও এর জন্য কম দায়ী ছিল না। রাজাবদল, রাজবংশের পতন-অভ্যুদয়ের নানা অভিজ্ঞতাই ছিল রাজানুগৃহীত সাহিত্যজীবীদের। কিন্তু

১ 'প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার', দ্বিতীয় খণ্ড

রাজাবদলের সঙ্গে-সঙ্গে ভাষাবদলের অভিজ্ঞতা এই প্রথম হল তাঁদের। এ আঘাতের ফলে রাজসভা থেকে তাঁদের এসে দাঁড়াতে হল রাজপথে। কিন্তু পরান্নপুষ্ট বিদ্যাজীবী সম্প্রদায় দীর্ঘদিন পথের পাশে থাকেননি, অচিরেই আবার রাজভাষা আয়ত্ত করে ফিরে গিয়েছিলেন রাজানুগ্রহের আরামপ্রদ নিরাপদ আশ্রয়ে। জয়ানন্দ দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন : 'ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে। / মোজা পায় নড়ি হাতে কামান ধরিবে ॥'[১] ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের লেখাতে জানতে পারা যাবে তার অন্তর্গূঢ় কারণ :

> The direct action of the Government, however, fostered our education in another and quite unexpected direction. Todar Mål's organisation of the State revenue service had forced the Hindu clerks and account-keepers to learn the Persian language, in which all records of this department had henceforth to be written. In Bengal Todar Mal's elaborate land system (zabti) was never applied ; but ambitious local Hindus and Muslims (of both of whom the mother tongue was Bengali) were now forced to learn the Persian language in order to get some share in the vastly extended secretarial work of the Mughal provincial administration.... It was only when Murshid Quli Khan established a local dynasty in Bengal that these high posts passed into the hands of Bengalis, many of whom were well versed in Persian composition.[২]

নদীয়া বর্ধমান মুর্শিদাবাদ রাজসভায় এঁরাই ছিলেন প্রধান অমাত্য। সেখানে স্থান পাওয়ার উচ্চাশায় ব্রাহ্মণ সন্তান পশ্চিমে যেতেন ফারসি আয়ত্ত করতে। ভারতচন্দ্র—রামমোহন পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। সমাজতাত্ত্বিকেরা যাকে বলেছেন Islamization, এ তারই সাংস্কৃতিক রূপভেদ মাত্র। ইসলামীকরণে যে সব পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল ধর্মের আবরণে কিন্তু শক্তির প্রয়োগে, West-

ernization-এ সেই একই রূপান্তরের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে প্রগতির নামে – কিন্তু এবার স্বেচ্ছায় বরণে। মধ্যযুগের ভাষাবদলের দৃষ্টান্ত থেকে পাঠ নিয়ে ইংরেজি শিক্ষায় তৎপর হয়ে উঠেছিল প্রাজ্ঞ বাঙালি। ১৮-১৯ শতকের পাঠ্যবিবর্তন লক্ষ করলে দেখতে পাব, কীভাবে রাজভাষা ফারসি থেকে অপ্রকৃতিস্থ দ্রুততায় ইংরেজির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে বাঙালি। রামমোহনকে এই প্রবণতার প্রতীক হিশেবেও নিতে পারি আমরা। যুগের রেওয়াজ অনুযায়ী পাঠশালার পড়া শেষ করে নয় বছর বয়সে তিনিও পাটনা গিয়েছিলেন আরবি ও ফারসি রপ্ত করতে। রংপুরে জন ডিগ্‌বির কাছে আঠাশ বছর বয়সে শুরু করেছিলেন ইংরেজির রীতি-মতো চর্চা। বলা বাহুল্য, শুধু ভাষার প্রতি অনুরাগই মধ্যশ্রেণীর এই আকর্ষণের মূলে একমাত্র প্রণোদন ছিল না। অথবা, বলা যাবে না, এ প্রদেশে দেশীয় সংস্কৃতি-চর্চা নির্বাসিত ছিল বলে আরবি / ফারসি / ইংরেজি চর্চাই বিকল্প ছিল। বরং উচ্চতর শিক্ষার একাধিক কেন্দ্র ছিল বাঙলায়, রাজন্য পৃষ্ঠপোষণা থেকেও সেগুলি বঞ্চিত ছিল না। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ায় মাসিক ২০০ টাকা জলপানি দিয়ে পণ্ডিতদের নিয়ে আসেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ড দেখেছিলেন, নদীয়ায় উচ্চতর শিক্ষার ৩১টি টোল ও ৭৪৭ জন ছাত্র ছিল। কলকাতায় ২৮টি টোলের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৭৩। কলকাতার উপকণ্ঠে বাঁশবেড়িয়ায় ১৪টি, কুমারহাটা ভাটপাড়া ও ত্রিবেণীতে ৮টি করে, গোঁদালপাড়া ও ভদ্রেশ্বরে ১০টি করে, জয়নগর-মজিলপুরে ১৮টি এবং আন্দুলে ১২টি টোল দেখেছিলেন তিনি। উইলসনের হিশেব অনুযায়ী ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়ায় ২৫টি টোলে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৫০০ / ৬০০। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাডাম বাঙলা-বিহারের ১,৫০,৭৮৪টি গ্রামে অন্তত ১ লক্ষ দেশি টোল-মাদ্রাসা দেখেছিলেন। শুধু সংস্কৃত ছাত্রের সংখ্যাই ছিল ১০৮০০ এবং শিক্ষকসংখ্যা ১৮০০ ; অর্থাৎ ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত ছিল ৬ : ১। আর রাজ-ভাষা ফারসি মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুরাই বেশি পড়ত। অ্যাডামের তৃতীয় সমীক্ষা অনুযায়ী এ-বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২০৯৬ ও ১৫৫৮। তবে যত ছাত্র মাদ্রাসা-মখতবা বা টোল-চতুষ্পাঠীতে পড়ত তার তুলনায় গ্রামীণ পাঠশালায় ছাত্রসংখ্যা প্রায় দশগুণ বেশি ছিল (১০৯.৯ : ১০০০)। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা অনেক প্রসারিত ছিল। এই শিক্ষাক্রমে সাহিত্য-ব্যাকরণ-আর্যা-শাস্ত্রপাঠের সঙ্গে-সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষারও গুরুত্ব কম ছিল না। আর ব্যয় এতই স্বল্প ছিল যে অর্থের অভাবে কোন ছাত্রের পড়ার ব্যাঘাত হত না – ক্যাম্বেলের প্রতিবেদনে তার প্রমাণ আছে। যুগের বিবর্তনের সঙ্গে এ শিক্ষা

ক্রমের সংস্কারের অবকাশ ছিল অবশ্যই। কিন্তু নতুন যুগের উপক্রমেই তাকে বর্জন করা হল 'the best calculated to keep this country in darkness'[১] অভিযোগে। এর মধ্যে বিত্তাজীবীর বেদনা মিশ্রিত বিনয় নেই, আছে সওদাগর ইংরেজের কাছে চাকরীর সওগাত লাভের সুযোগসন্ধানী সুবুদ্ধি। প্রাথমিকভাবে দেশীয় শিক্ষাধারার কোন সংস্কারে সাহসী না হলেও স্থানীয় গণ্যমান্যদের এই আগ্রহই বিদেশি শাসকবর্গকে শক্তি জুগিয়েছিল এদেশের শিক্ষাপদ্ধতির আমূল উচ্ছেদ করে তাঁদের স্বদেশীয় শিক্ষাক্রমের পুনর্বিন্যাস করতে। কারণ তাঁরা জানতেন সাম্রাজ্যের স্থায়ী সোপান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মোহর নিয়ে এদেশে প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল কলিকাতা মাদ্রাসা ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৭৯১-তে বারাণসী সংস্কৃত কলেজ। আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে যদি লক্ষ করি, চার্লস গ্রাণ্টের *Observations* মুসাবিদা হচ্ছে ১৭৯২-তে এবং ১৭৯৩-তেই হাউস অব কমন্সে উইলবারফোর্স দাবি জানাচ্ছেন ভারতবর্ষে 'useful knowledge'-এর প্রসারে বৃটিশ সরকারের সক্রিয় উদ্যোগের, তখনই বুঝতে অসুবিধে হয় না, প্রাচ্যবিদ্‌ ও ইঙ্গপন্থীদের বিরোধের বীজ উপ্ত হচ্ছে এখানেই। গ্রাণ্টেরই উৎসাহে ১৮১৩-র সনদে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল সেই বিখ্যাত ৪৩-তম ধারার সংস্থান :

> ...a sum of not less than one lac of rupees in each year shall be set apart and applied to the revival and improvement of literature and the encouragement of the learned natives of India, and for the introduction and promotion of a knowledge of the sciences among the inhabitants of the British territories in India.

কিন্তু ১৮১৪-র প্রথম শিক্ষা বিজ্ঞপ্তি সত্ত্বেও জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশন সংগঠন (১৮২৩) পর্যন্ত এই সদিচ্ছা বাস্তবে বিশেষ রূপায়িত হল না। ইতোমধ্যে ১৮১১-য় নদীয়া ও ত্রিহুতে সরকার-প্রতিশ্রুত সংস্কৃত কলেজ যখন প্রতিষ্ঠিত হল না, তার পরিবর্তে কলকাতাকে সংস্কৃত কলেজ উপহার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কোম্পানি ১৮২১-এ। বিধায়ক সমিতিকে সরকার পক্ষ থেকে অবশ্য স্পষ্ট জানানো হল :

১ 11 ডিসেম্বর 1823 গভর্নর-জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে লেখা রামমোহন রায়ের চিঠি।

The Committee will bear in mind that the immediate object of the institution is the cultivation of Hindu literature. Yet it is in the judgment of His Lordship in Council, a purpose of much deeper interest to seek every practicable means of effecting the gradual diffusion of European knowledge. It seems indeed no unreasonable anticipation to hope that if the higher and the educated classes among the Hindus shall, through the medium of their sacred language, be imbued with a taste for the European literature and science, general acquaintance with these and with the language whence they are drawn, will be as surely and as extensively communicated as by any attempt at direct instruction by other and humbler seminaries.[১]

অর্থাৎ প্রথম দুটি প্রতিষ্ঠানে প্রাচ্যবিদ্যার চর্চাই ছিল অবিকল্প উদ্দেশ্য, কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে ক্রমে তার মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে প্রতীচ্য বিদ্যাচর্চার গভীর ও সমান্তর এক আয়োজন—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, দিল্লি ও আগ্রায় ওরিয়েণ্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পেছনে এই মনোভাবই রূপ নিচ্ছিল, বলা বাহুল্য।

কোম্পানির পরিচালক ও এদেশে নিযুক্ত শাসকবর্গের ক্রমিক মত পরিবর্তন ঘটলেও জেনারেল কমিটি কিন্তু সম্পূর্ণ তাঁদেরই অনুসরণ করলেন না। অল্প কালের মধ্যেই দেখা গেল কমিটির সদস্যদের মধ্যে প্রাচ্যবিদ্ ও ইঙ্গপন্থীদের দুটি শিবির সৃষ্টি হয়েছে এবং বিরোধের উপলক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে ১৮১৩-র সনদের অর্থবরাদ্দের শর্ত ব্যাখ্যা। ১৮৩৪-এ তর্ক যখন তুঙ্গে উঠল, তখন দশজন সদস্যের সমিতিতে প্রথম পক্ষে রয়েছেন: শেক্সপিয়র, সাদারল্যাণ্ড, ম্যাকনাটেন, হেনরি ও জেম্‌স্ প্রিন্সেপ; দ্বিতীয়ে: বার্ড, সণ্ডার্স, বুশবি, কলভিন ও ট্রেভেলিয়ন। একটু লক্ষ করলেই অবশ্য দেখা যাবে, বিতর্ক হলেও ধারাটিতে প্রাঞ্জলতার অভাব ছিল না। আইন সমিতির সদস্য মেকলের তা দৃষ্টি এড়ায়নি; তাই প্রয়োজন হলে তিনি ধারাটি বাতিল করার কথাও বলতে

১ H Sharp, *Selections from Educational Records*, Part I: 1781-1839 (Calcutta 1920), p. 79.

ভোলেননি।[১] অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে তর্ক ব্যক্তিগত মত-বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করলেও ১৮৩৩-এর সনদে কর্তৃপক্ষের সমর্থন এবং মেকলের মতো পণ্ডিতজনের নেতৃত্ব ইঙ্গপন্থীদের উগ্রতায় ইন্ধন জুগিয়েছিল। ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫-এ মেকলের বিখ্যাত ঘোষণায় যতি পড়ল এই তর্কে। ভারতবাসীর ভাষাবদলের দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার সূচনা হল। যদিও তর্কের নিবৃত্তির জন্য অপেক্ষা করতে হল ২৪ নভেম্বর ১৮৩৯-এ ক্যাম্বেলের ঘোষণা পর্যন্ত। সমিতির সামনে মঞ্জুরী অর্থ বিনিয়োগের সম্ভাব্য ক্ষেত্র ছিল তিনটি: ভারতীয়দের মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে, সংস্কৃত/আরবি/ফারসির চর্চায় বা ইংরেজির মাধ্যমে য়ুরোপীয় বিদ্যার অনুশীলনে। দুঃখের হলেও, স্বাভাবিকভাবেই বিদেশি এই শিক্ষাবিধায়কদের কেউই প্রথম বিকল্পটি আলোচনার যোগ্য মনে করেননি। মেকলে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন:

> All parties seem to be agreed on one point, that the dialects commonly spoken among the natives of this part of India contain neither literary nor scientific information, and are moreover so poor and rude that, until they are enriched from some other quarter, it will not be easy to translate any valuable work into them. It seems to be admitted on all sides, that the intellectual improvement of those classes of the people who have the means of pursuing higher studies can at present be effected only by means of some language not vernacular amongst them.[২]

সংস্কৃত বা আরবির দাবিও তিনি নস্যাৎ করে দিলেন এই যুক্তিতে যে:

> I am quite ready to take the oriental learning at the valuation of the orientalists themselves. I have never found one among them who could deny that a single shelf of a good

১ 'If the Council agree in my construction no legislative act will be necessary. If they differ from me, I will propose a short act rescinding that clause of the Charter of 1813 from which the difficulty arises.' *Idem*, p. 108.

Idem

European library was worth the whole native literature of India and Arabia.[1]

তৃতীয় বিকল্প ইংরেজির শ্রেষ্ঠতা নিয়ে অবশ্য কোন তর্ক ছিল না সমিতির সদস্য-দের মনে। তদুপরি মেকলে স্মরণ করিয়ে দিতে ভুললেন না : 'In India, English is the language spoken by the ruling class.'[2]

মেকলের প্রতিবেদনে যখন সম্মতি জানালেন বেণ্টিঙ্ক (৭ মার্চ ১৮৩৫) তখন থেকে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার কেন্দ্রগুলি বন্ধ হল না বটে, কিন্তু প্রাচ্যভাষায় গ্রন্থপ্রকাশের সব অনুদান রহিত হয়ে গেল অবিলম্বে। এই উদ্দেশ্যে অর্থ বরাদ্দ পুনর্মঞ্জুর করলেন অকল্যাণ্ড। তাঁর ঘোষণাবলে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার কেন্দ্রগুলিও আবার ইংরেজি বিভাগ খোলার অনুমতি পেল। কিন্তু শিক্ষাসঙ্কোচনের এক পূর্বাভাসও রয়ে গেল তাঁর সিদ্ধান্তে; মাদ্রাজ সরকারের ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩০-এর এক প্রস্তাব সমর্থন করলেন তিনি :

The improvements in education, however, which most effectually contribute to elevate the moral and intellectual condition of a people are those which concern the education of the higher classes of persons, possessing leisure and natural influence over the minds of their countrymen. *By raising the standard of instruction among these classes you would eventually produce a much greater and more beneficial change in the ideas and feelings of the community than you can hope to produce by acting directly on the more numerous class.*[3]

ইংরেজি শিক্ষার নিম্নমুখী পরিস্রাবণ তত্ত্বের উৎসও বলা যেতে পারে এই ঘোষণাকে। তা সত্ত্বেও প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা সম্মানজনক অস্তিত্বরক্ষার সুযোগটুকু পেয়ে কৃতজ্ঞ রইল অকল্যাণ্ডের কাছে।

কিন্তু সাহিত্যের পাঠাভ্যাস যে ভাষার মাধ্যমেই চলুক-না কেন, তার প্রকাশের গোমুখী মাতৃভাষা। ১৮৩৬-এই মেকলে জেনারেল কমিটির সভাপতি হিশেবে তাঁর প্রতিবেদনে বলেছিলেন :

১ *Idem*
২ *Idem*
৩ *Idem*, p. 179.

We are deeply sensible of the importance of encouraging the cultivation of the vernacular languages. We do not conceive that the order of the 7th March precludes us from doing this, and we have constantly acted on this construction....We conceive the formation of a vernacular literature to be the ultimate object to which all our efforts must be directed.[১]

বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত ও ব্যয়সংক্ষেপের বিচারে অকল্যাণ্ডও তাঁর ঘোষণার ২২তম অনুচ্ছেদে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কিন্তু বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদানে সমর্থ এক শিক্ষকশ্রেণী গড়ে তোলার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু এর অনেক আগেই, ১৮২৭ থেকে ৩৫ পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজে অনুরূপ উদ্দেশ্যে ইংরেজি পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ছিল। ১৮৪২ সালে ইংরেজি শ্রেণী পুনঃপ্রচলিত হলেও বিদ্যাসাগরের কলেজ পুনর্গঠনের (১৮৫৩) আগে পর্যন্ত তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্দিষ্ট না থাকায় বিভাগটি ফলপ্রসূ হয়নি। শিক্ষাপর্ষদের সচিব মোআটকে দেওয়া রিপোর্টে বিদ্যাসাগর ইংরেজি শিক্ষা সংস্কৃত কলেজের ছাত্রের পক্ষে বাধ্যতামূলক করার পরামর্শ দেন; কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই লেখেন সংস্কৃত ভাষায় সামান্য ব্যুৎপত্তি না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রদের ইংরেজি শিখতে দেওয়া হবে না।[২] ১৮৫৩-য় পরিদর্শক ব্যালেণ্টাইনের সুপারিশ প্রসঙ্গে ৭ সেপ্টেম্বরের মন্তব্যে বা ৫ অক্টোবর মোআটকে লেখা চিঠিতে এর গভীর উদ্দেশ্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

Leave me to teach Sanscrit for the leading purpose of thoroughly mastering the vernacular and let me superadd to it the acquisition of sound knowledge through the medium of the English and you may rest assured that before a few years are over I shall be enabled, if supported and encouraged by the Council, to furnish you with a body of young men who will be better qualified by their writings and teaching

১ C M Trevelyan, *On the Education of the People of India* (London 1842), pp. 22-23. উদ্ধৃত : J P Naik & S Nurullah, *A History of Education in India* (Bombay 1951), p. 141.

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড : ১৮২৪-৫৮ (কলিকাতা ১৯৪৮), পৃ ৮১-৮২

to disseminate widely among the people sound information than it has hitherto been possible to accomplish through the instrumentality of the educated eleves of any of your colleges whether English or Oriental.[১]

শিক্ষা সংস্কৃতেই হোক্ বা ইংরেজিতে, তার প্রয়োগের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম যে মাতৃভাষায় এই বিশ্বাস বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে লাভ করেছিল বাঙালি। ইংরেজি এবং সংস্কৃতের চর্চা ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে একইভাবে প্রচলিত হলেও, বঙ্গ-প্রদেশের মতো দ্রুত তাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি কারণ তাদের মধ্যে বিদ্যাসাগর ছিলেন না। মনে রাখা দরকার, এ শুধু সময়ের ঋতু উপযোগী ফলপ্রসব নয়। বরং বলা যায়, সময়ের সহযোগও অর্জন করে নিতে হয়েছিল তাঁকে। তখন অনেক বৃত্তি ও পারিতোষিকের প্রলোভন সত্ত্বেও সংস্কৃত শিক্ষার্থী যথেষ্ট জোটেনি। এমনকি বিদ্যাসাগরকেও সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করা হয়েছিল ইঙ্গবঙ্গ সমাজের স্পর্শকলুষ থেকে বাঁচানোর জন্য, সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি অনুরাগবশতই নয়। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের প্রতিপত্তি বিশেষত শাসক সমাজে তাঁর অবাধ প্রবেশাধিকার অনেক উত্তরপুরুষকে আকৃষ্ট করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ঈর্ষারও উদ্রেক করেছে। পদ্মলোচন দত্তের প্রসঙ্গে হুতোম লিখছেন, 'ইংরাজি পড়লে পাছে খানা খেয়ে কৃশ্চান হয়ে যায়, এই ভয়ে তিনি ছেলেগুলিকে ইংরিজি পড়ান নি—অথচ বিদ্যাসাগরের উপর ভয়ানক বিদ্বেষ নিবন্ধন সংস্কৃত পড়ানও হয়ে ওঠে নাই।'[২] এই প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে বিদ্যা-সাগরকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল প্রায় অস্তিত্বহীন এক পক্ষ অবলম্বন করে: মাতৃভাষা। ইংরেজি ও সংস্কৃতে শিক্ষিত কিন্তু আবেগ ও মননের প্রকাশ করতে পারেন মাতৃভাষায়—উনবিংশ শতাব্দীর সব্যসাচী এই শিক্ষিত বাঙালি সম্প্রদায়ের গোত্রপিতা ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর। এবং কোন শিক্ষাই তাঁর কাছে তত্ত্বমাত্র ছিল না বলেই এই পত্র ও প্রতিবেদন রচনাকালেই তিনি সংকলন করেছিলেন 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব।'

বিদ্যাসাগরের সমকালেই এবং প্রায় সমান্তরে দ্বিতীয় একটি সংস্কৃতচর্চার ধারা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল বাংলায়, যাঁদের গৌরববোধের প্রধান উৎস ছিল য়ুরোপে

১ ইন্দ্রমিত্র, 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' (কলিকাতা ১৩৬৩), পৃ ৭৩৭-৩৮

২ "বাবু পদ্মলোচন দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতার", 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র' (কলিকাতা ১৩৬৩), পৃ ৯৭

সংস্কৃতবিদ্যার প্রভাব ও প্রতিপত্তি। সপ্তদশ শতাব্দীর আত্মতৃপ্ত মুগ্ধতা কাটিয়ে উঠতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রতীচ্যে যে প্রাচ্যবিদ্যা ও জীবনদর্শনের প্রতি আগ্রহ সূচিত হয়েছিল, তারই অন্তর্গত ছিল প্রধানত সংস্কৃত ভাষা এবং প্রসঙ্গত সাহিত্যের অনুশীলন। নতুন বিদ্যাক্ষেত্র, তুলনামূলক শব্দতত্ত্বের একটি প্রধান উপাদান হিশেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল বৈদিক ও সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার। এই চর্চার পালে হাওয়া ভারি করে তুলেছিল উপনিবেশ বিস্তারের রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা। ভারত সাম্রাজ্য অধিগত হওয়ার পর ইংল্যাণ্ডে সংস্কৃতের চর্চা ক্রমে আশ্রয় নিল বিদ্যায়তনিক পাণ্ডিত্যের কোটরে কিন্তু য়ুরোপের মূল ভূখণ্ডে বিশেষ করে জর্মানিতে—হয়ত সাম্রাজ্যলাভ হল না বলেই তার ক্ষতিপূরণস্বরূপ—সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা চলতে থাকল সজীব ঔৎসুক্য নিয়ে। অন্যদিকে ভারতীয় প্রাচ্যবিদেরা যেন স্বাধীনতাহরণের মধ্যেও দেখতে পেলেন এই অন্ধকার উপমহাদেশ জ্ঞানবিজ্ঞানে আলোকিত করার এক ঐশ্বরিক পরিকল্পনা। প্রতীচীর সেই প্রতিফলিত আলোয় সংস্কৃত সাহিত্যকে চিনেছিলেন তাঁরা। ক্রমে যখন ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স-জর্মানির প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার প্রতিজ্ঞা ও সিদ্ধান্তে ভিন্নতা ঘটে গেল, ইতিহাসের কৌতুকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিস্তারেও অনেকটাই প্রেরণা জুগিয়েছিল য়ুরোপীয় মূল ভূখণ্ডের সংস্কৃতচর্চা। প্রতীচ্য সংস্কৃতচর্চার ধারা-উপধারার সন্ধান নিলেই স্পষ্ট হবে এঁদের উৎসাহ ও উদ্‌-যোগের উৎস ও কারণ। এই মুখাপেক্ষিতায় ব্যাহত হয়েছিল তাঁদের মৌলিকতা। বলা বাহুল্য, শুধুই দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতীচীপ্রবণ ছিলেন এঁরা, গবেষণার প্রকরণেও অনুবর্তন করেছিলেন তাঁদের। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্যচর্চায় আধুনিক গবেষণা রীতিপদ্ধতি প্রয়োগের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব কিন্তু এই বর্গের সন্ধানীদের এবং সেক্ষেত্রে তাঁদের দক্ষতাও ছিল অবিংসবাদী। এঁদের কুলগুরু বলা যায় রাজেন্দ্র-লাল মিত্রকে।

বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার তৃতীয় এবং স্বাবলম্বী ধারাটির সূচনা হয়েছিল শতাব্দীর শেষ ত্র্যংশে। একদিকে এঁদের মধ্যে যেমন প্রচ্ছন্ন—কখনও-বা প্রকাশ্য—ছিল মেকলের দম্ভোক্তির প্রতিক্রিয়া, অন্যদিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে এই প্রজন্মের অধিকাংশই অচিরে অতিক্রম করে যেতে পেরেছিলেন সে উত্তেজনা—অথবা বলা যায়, তাকেই রূপান্তরিত করেছিলেন সাহিত্য-সন্ধিৎসুর সংকল্পে। সাহিত্যকে এই বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে উপভোগ ও বিচার এবং সেই সূত্রে তার পারম্পরিকতার সন্ধানে সংস্কৃত সাহিত্য-অভিজ্ঞতার পুনর্মূল্যায়নের শিক্ষা বাঙালি

পেয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র ও 'বঙ্গদর্শনে' তাঁরই অনুগামী লেখকগোষ্ঠির রচনার মধ্য দিয়ে। য়ুরোপীয় ও সংস্কৃত সাহিত্যের—বিশেষ করে শেক্সপিঅর ও কালিদাসের তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তাঁর সতীর্থ চন্দ্রনাথ বসু বা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীরও পক্ষপাত যে প্রতীচ্য সাহিত্যের প্রতি, সে দুর্বলতা গোপন করার কোন চেষ্টাই করেননি তাঁরা। কিন্তু যখনই য়ুরোপীয়দের সংস্কৃত সাহিত্যবিচারের প্রসঙ্গ এসেছে, তাঁদের স্বাদেশিক অভিমানও গুপ্ত থাকেনি। "অনুকরণ" প্রবন্ধে যে বঙ্কিমচন্দ্র লিখতে পেরেছিলেন :

> যখন উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্টে একত্রিত হয়, তখন অপকৃষ্ট স্বভাবতই উৎকৃষ্টের সমান হইতে চাহে। সমান হইবার উপায় কি ? উপায়, উৎকৃষ্ট যেরূপ করে সেইরূপ কর, সেইরূপ হইবে। তাহাকেই অনুকরণ বলে। বাঙ্গালি দেখে, ইংরেজ সভ্যতায়, শিক্ষায়, বলে, ঐশ্বর্য্যে, সুখে সর্ব্বাংশে বাঙ্গালি হইতে শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালি কেন না ইংরেজের মত হইতে চাহিবে ?···বাঙ্গালির স্বভাবের দোষে এ অনুকরণপ্রবৃত্তি নহে।···এ অনুকরণ স্বাভাবিক, এবং পরিণামে মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে।[১]

এর মাত্র বারো বছর পরে "দ্রৌপদী" দ্বিতীয় প্রস্তাবে তিনিই লেখেন :

> ইউরোপীয়েরা এদেশীয় প্রাচীন গ্রন্থ সকল কিরূপ বুঝেন, তদ্বিষয়ে আমাকে সম্প্রতি কিছু অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত বেদ স্মৃতি দর্শন পুরাণ ইতিহাস কাব্য প্রভৃতির অনুবাদ, টীকা, সমালোচনা পাঠ করার অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক সাহিত্যজগতে আর কিছুই নাই। এখনও অনেক বাঙ্গালি তাহা পাঠ করেন, তাঁহাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য এ কথাটা কতক অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি লিখিতে বাধ্য হইলাম।[২]

এই আত্মবিরোধই শতাব্দী-সায়াহ্নের সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার মানচিহ্ন। সে দ্বিধা সত্ত্বেও মানতেই হয়, প্রাচ্য-প্রতীচ্য সংস্কৃতির আদান-প্রদানের জটিল ও বিশাল পারিপার্শ্বিকের অন্তর্গত করে বিচারের পথ প্রথম খুলে দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাত্ত্বিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যচর্চার প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথ পূর্বসূরীরই অনুযাত্রী হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যাখ্যানের পূর্বের ও পরের শকুন্তলার

তুলনা খুঁজে পেয়েছিলেন মিরন্দা ও ডেসডিমোনার মধ্যে, রবীন্দ্রনাথ 'প্যারাডাইস লস্ট' ও 'প্যারাডাইস রিগেইণ্ড'-এর সঙ্গে। শতাব্দী-শেষের স্ববিরোধে তিনিও স্পৃষ্ট হয়েছিলেন। সাহিত্যের সর্বজনীন সার্বভৌমিকতা স্বীকার করেও তাঁকে তৎপর হতে হয়েছিল প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যের 'আন্তরিক অনৈক্য' প্রমাণ করতে; এমনকি প্রাচীন ভারতবর্ষের 'অসামান্যতা'র তালিকায় তিনি 'বিবসন নিরভূষণ ভিক্ষাচর্যের গৌরব'কেও[১] নিবিষ্ট করেছিলেন। কিন্তু এরই পাশাপাশি তাঁর কবিদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল ভাবশরীরী ভারতবর্ষের এক ধ্যান— সত্যদ্রষ্টা রাজর্ষি ধ্যানী কবি তার গাথাকার। বিংশ শতাব্দীর বাঁক ফিরে আরও একজন কবির সাক্ষাৎ পাব আমরা তাঁর রচনায়। 'সে ভাষা ভুলিয়া গেছি, নাম দোহাকার'-এর আত্মবিস্মরণের যবনিকা ভেদ করে যার দীক্ষা হবে 'সৌম্য' বিষাদে, অভিষেক হবে 'নানাবর্ণ মর্তের আলোতে', 'তরঙ্গিত প্রাণের প্রবাহে'। বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্যের সেই অপরোক্ষ আত্মবশ অনুভবের দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ।

সংকলন প্রসঙ্গে

এই সংকলনের পরিকল্পনা একান্তভাবেই ছাত্রপাঠ্য হিশেবে। বহু দুষ্প্রাপ্য রচনা সংগ্রহ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না ; অথচ সংস্কৃত সাহিত্য-ঐতিহ্যে নব্য বাঙালির সংবেদনের রূপরেখা জানতে হলে এই রচনাগুলি অপরিহার্য। ছাত্রপাঠ্য বলেই সংকলয়িতাকে বিষয়গত পূর্ণতার চাইতে বেশি লক্ষ দিতে হয়েছে দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্যের দিকে। বলা বাহুল্য, সেদিক থেকে আরও সংযোজনের অবকাশ ছিল। কিন্তু কলেবরবৃদ্ধির আশঙ্কায় নিরস্ত হতে হয়েছে। মুদ্রণলভ্য অন্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় রচনা (যেমন, চন্দ্রনাথ বসুর 'শকুন্তলাতত্ত্ব') বর্তমান সংকলনে অন্তর্ভূত করা হয়নি একই কারণে।
ঊনবিংশ শতাব্দী সময়সীমা হলেও 1909 পর্যন্ত রচনা এ-খণ্ডে সংকলিত হল ; কারণ মনোভাবে তা পূর্ববর্তী যুগেরই অনুক্রম। রচনা-সংগ্রথনে চারটি ক্ষেত্রে কালানুক্রমিকতার অভাব লক্ষ করা যাবে। রাজেন্দ্রলাল ও ঈশ্বরচন্দ্রের রচনা সাজানয় ব্যুৎক্রম ইচ্ছাকৃত—মনোভঙ্গির স্তরপরম্পরা বিচারের সুবিধার জন্যই করা। রমেশচন্দ্র দত্তের রচনাটি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের আগে স্থান পাওয়া সঙ্গত ছিল, মুদ্রণবিভ্রাটে পরে এসেছে। "তপোবন" প্রবন্ধটি হরপ্রসাদের প্রবন্ধের পরে না এনে, একই লেখকের রচনা বলে "শকুন্তলা"র পরেই সন্নিবিষ্ট হয়েছে।
বর্তমান সংকলনের প্রধান লক্ষ্য ইংরেজি-শিক্ষিত নব্য বাঙালির সাহিত্যবোধে সংস্কৃত সাহিত্যের অভিঘাত ও তার স্বরূপ স্পষ্ট করে তোলা। সুতরাং এই সম্প্রদায়ের বাইরে দেশীয় শিক্ষায় শিক্ষিত গোষ্ঠীর সংস্কৃত সাহিত্যচর্চারও একটি সমৃদ্ধ ও সুবিস্তৃত ইতিহাস থাকলেও তার প্রবণতা দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিপ্রায় স্বতন্ত্র বলে বর্তমান সংকলনে গৃহীত হয়নি।

এ সত্য আজ অস্বীকার করা কঠিন, জ্যোতিষ ন্যায় স্মৃতির বাইরে সংস্কৃত সাহিত্যেরই নানা প্রসঙ্গের চর্চা যে পুনঃপ্রচল হল ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য জড়িয়ে আছে য়ুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। কখনও সেই আদর্শের প্রবর্তনায় কখনও-বা প্রতিক্রিয়ায়, কখনও হীনম্মন্যতায় কখনও-বা গৌরববোধে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চায় নিবিষ্ট হয়েছিল বাঙালি। এবং দুই অসম সংস্কৃতির মিলনে শুরু হয়েছিল যে মূল্যমন্থন, তার চিহ্ন রয়ে গেছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পর্বে-পর্বে।

'প্রস্তাব' সংকলনের সময় বিদ্যাসাগরের প্রাথমিক লক্ষ্য হয়ত ছিল সংস্কৃত সাহিত্যের কালানুসারী কোন ইতিক্রম রচনা করা। কিন্তু কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই স্খলিত হয়ে পড়েছিল তাঁর ঐতিহাসিক-শোভন নিরপেক্ষতা; তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছিল প্রাচ্য সাহিত্যবোধ ও সাহিত্য-শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য, ব্যাখ্যা, তার পদ্ধতি নির্মাণ। অন্যদিকে প্রতীচ্যে পরিণীত হয়ে যে সংস্কৃতের চর্চা প্রচলিত হয়েছিল ভারতবর্ষে, অনিবার্যতই তা প্রণোদিত করেছিল তুলনায়। তারই নিদর্শন আছে রাজেন্দ্রলালের নিবন্ধ তিনটিতে, 'পঞ্চতন্ত্র' ও ঈশপের তুলনায়।

আখ্যানের প্রকরণগত সাদৃশ্য থেকে যিনি আমাদের সাহিত্যবোধের তুলনার গভীরে নিয়ে গেলেন তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। 'কাননে সাগরে তুলনা হয় না।'—এই পূর্বকৃত সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও তুলনা-সূত্র সন্ধান তাঁকে পৌঁছে দিল সাহিত্যদর্শনগত এক ভিন্নতার বোধে। সংস্কৃত সাহিত্যচর্চা উপলক্ষ করে সংস্কৃতি-সংকরতার এক অনুবন্ধী সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন পাঠকের।

উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপের দুই নতুন বিদ্যা তুলনামূলক শব্দতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞান প্রভাবিত করেছে রমেশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের গবেষণারীতিকে। সাহিত্যের মূল্য এখানে স্বাশ্রয়ী নয়, ঔপকরণিক। আবার শুধুমাত্র সাহিত্যব্যাখ্যারই বিশ্লেষণী ও সংশ্লেষণী পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যাবে ভূদেবের "মৃচ্ছকটিক" ও রবীন্দ্রনাথের "শকুন্তলা" প্রবন্ধদুটির মধ্যে।

হরপ্রসাদের "মেঘদূত ব্যাখ্যা"কে বলা যায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমালোচনাপদ্ধতির শ্রেষ্ঠগুণসমূহের সমবায়ের চেষ্টা। দুয়েরই লক্ষ্য অভিন্ন: অনুভবের সঞ্চার। প্রতিটি ভৌগোলিক উল্লেখের মধ্য দিয়ে কালিদাস কীভাবে মেঘের চেতনা সম্পাদন করছেন, অথবা পাঠকমনে সেই প্রতীতি জাগিয়ে তুলছেন, ঘটমান জীবনপ্রবাহের ধারাভাষ্য রচনার মতো, কথকতার ঢঙে রসবস্ত করে তুলেছেন অলোচক।

কিন্তু জীবনের শুধু দর্পণরূপে নয়, জীবনসমগ্রতারই অন্য এক প্রতিমা যেখানে বিভাসিত হয়ে ওঠে সাহিত্যে, শ্রীরূপ থেকে নিয়ে যায় স্বরূপের সন্ধানে, যেখানে বিচার বোধ অনুভব সব সমীকৃত হয়ে যায় যে সৃজনের শান্ত দৃষ্টিতে, "তপোবন" প্রবন্ধে আত্মজ্ঞানব্রত ভারতবর্ষের সেই শাশ্বত স্বভাবই সাহিত্যের সাক্ষ্যে উন্মোচন করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

আর সবকটি প্রবন্ধেই যে কোন না কোন সূত্রে অবতারণা হল তুলনার, তারও মূল নিহিত আছে ভারত সংস্কৃতির গভীরে। বহুসংকর এই কৃষ্টিই তুলনামূলক সাহিত্য বিচার অপরিহার্য করে তুলেছে ভারতীয় সাহিত্যে।

[রাজেন্দ্রলাল মিত্র]

ইউরোপে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন

সংস্কৃত অতি প্রাচীন ও বিশুদ্ধ ভাষা। পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ বহুবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া এই ভাষারে সম্যক্ মার্জ্জিত ও নানা অলঙ্কারে সুশোভিত করিয়া গিয়াছেন। এমন কোন অভিপ্রায় নাই, যাহা এই ভাষায় সুন্দররূপে ব্যক্ত করিতে না পারা যায়। এই সংস্কৃত ভাষায় যে কোন্ সময়ে কোন্ গ্রন্থ বিরচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য স্বভাবতঃ অনেকেরই অন্তঃকরণে ইচ্ছা জন্মে ; কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস-বিরহে সে ইচ্ছা চরিতার্থ না হইয়া বরং দুঃখেরই উদয় হয়।

সংস্কৃত ভাষাতে যে উৎকৃষ্ট কাব্য নাটকাদি ছিল, এক শত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা তাহা অবগত ছিলেন না। যে চিরস্মরণীয় মহানুভাব প্রথমতঃ সংস্কৃত গ্রন্থ ইউরোপে প্রচারিত করেন, তাঁহার নাম সর উইলিয়ম্ জোন্‌স। তিনি বহু কালাবধি এতদ্দেশীয় সাহিত্য, শব্দবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র ও পূর্ব্বকালীন বিষয় সকলের তত্ত্বানুসন্ধান করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন ও এই সংকল্প সাধনের মানসে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ-মাসে কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োজিত হইয়া এতদ্দেশে আগমন করেন। তিনি একদা কোন ব্যক্তির প্রমুখাৎ "নাটক" এই শব্দটী শুনিয়া তাহার অর্থ জানিতে সমুৎসুক হইলেন ও মনে মনে ভাবিলেন, আমরা যাহাকে (হিস্‌টরি) ইতিহাস কহি, বোধহয়, এতদ্দেশীয়েরা তাহাকেই নাটক বলিয়া থাকেন। কিন্তু তথাপি সন্দিহান হইয়া এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের নিকটে নাটক শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তিনি প্রথমতঃ কিছুকাল উহার সদুত্তর প্রাপ্ত হইতেপারিলেন না। কেহ কেহ বলিলেন, নাটক ইতিহাস নহে, উহা গল্পপূর্ণ পুস্তক ; পূর্ব্বতন ভূপালেরা সভামণ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া সভাসদ্ জনগণের সহিত যেরূপ কথোপকথন করিতেন, নাটকে তাহাই বাহুল্য

রূপে বর্ণিত আছে। কেহ কেহ বলিলেন, নাটক শ্লোকময় গ্রন্থ। সে যাহা হউক, পরিশেষে একজন সুবিচক্ষণ ব্রাহ্মণ এই বলিয়া তাঁহার সন্দেহ দূর করিয়া দিলেন যে, আপনারা শীতকালে এই কলিকাতা নগরে যে পুস্তকের (প্লে) অভিনয় করেন, এতদ্দেশীয়েরা তাহাকেই নাটক কহিয়া থাকেন। এই বাক্য শুনিবামাত্র সর উইলিয়ম্ জোন্সের অন্তঃকরণ যে কি অভূতপূর্ব্ব বিস্ময় ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে পরিপূর্ণ হইল, তাহা কোন রূপেই অনুভব করিতে পারা যায় না। তখন তিনি উল্লিখিত ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! কোন্ নাটক সর্ব্বোৎকৃষ্ট? ব্রাহ্মণ এই রূপে পৃষ্ট হইয়া উত্তর করিলেন, সংস্কৃত ভাষায় যত নাটক আছে, তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ কাব্যকার কালিদাসপ্রণীত শকুন্তলা নামক নাটকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করা বহু কালাবধি সর উইলিয়ম্ জোন্সের অভিলষণীয় ছিল, এক্ষণে আবার ঐ ভাষায় নাটক আছে, জানিতে পারিয়া তাঁহার সেই অভিলাষ দ্বিগুণতর হইয়া উঠিল; কিন্তু তৎকালে ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের পবিত্র সংস্কৃত ভাষা যবন জাতিকে শিক্ষা দিতেন না, এজন্য সর উইলিয়ম্ জোন্স এতদ্দেশে আসিয়াও কতিপয় বৎসর আপনার সেই চির সংকল্পিত বিষয়টী সুসিদ্ধ করিতে পারেন নাই। অনন্তর আড়িয়াদহনিবাসী সংস্কৃত ভাষাবিশারদ রামনারায়ণ সেনগুপ্ত নামক জনৈক বৈদ্য মাসিক পাঁচ শত টাকা বেতনে তাঁহার শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী হয়েন। সর উইলিয়ম্ জোন্স ভাষা শিক্ষা-বিষয়ে অতিশয় নিপুণ ছিলেন, তিনি অল্পকালমধ্যে সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে এরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন যে, ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী ভাষাতে অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকের অনুবাদ প্রকাশ করেন। সহৃদয় ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ঐ শকুন্তলা নাটকের অনুবাদ পাঠ করিয়া উহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন; বিশেষতঃ কবিশ্রেষ্ঠ গেথি উহা পাঠ করিয়া এরূপ প্রীত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে, তিনি শকুন্তলার প্রশংসাবিষয়িণী একটী কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন।

শকুন্তলা নাটকের অনুবাদ ইউরোপমধ্যে প্রচারিত হইলে ইউরোপীয় শাব্দিক, ইতিহাসবিৎ ও নৈয়ায়িক মহোদয়গণ নিঃসংশয়ে অনুমান করিলেন যে, সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যবিষয়ক নানাবিধ পুস্তক আছে, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শকুন্তলা নাটকই তাহার একমাত্র নিদর্শন। যেরূপ সংস্কৃত এতদ্দেশীয় ভাষার, সেইরূপ লাটিন ও গ্রীক্ ইউরোপীয় যাবতীয় ভাষার মূল। অতএব ইউরোপীয়ানেরা লাটিন ও গ্রীক্ ভাষা অধ্যয়ন করিয়া যাদৃশ উপকার লাভে সমর্থ হয়েন, সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিয়া তাদৃশ ফল লাভের প্রত্যাশা করিতে পারেন না। তথাপি তাঁহারা সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে বিশেষ মনোনিবেশ করিলেন। ইংলণ্ডে উইলসন, কোলব্রুক্, সর উইলিয়ম্ জোন্স, ফ্রান্সে বরনফু, জারমেনিতে সেলিগাল, বফ, লাসন প্রভৃতি সহৃদয় মহোদয়গণ সংস্কৃত-ভাষা অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন ও বেদবেদাঙ্গাদি দুরূহ শাস্ত্রসমূহের অনুবাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সত্তর বৎসর অতিবাহিত হইল, ইউরোপখণ্ডে সংস্কৃত শকুন্তলা নামক নাটকের অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে; এই কালের মধ্যে উল্লিখিত ইউরোপীয় মহোদয়গণের উৎসাহে ও প্রযত্নে যে সমস্ত সংস্কৃত পুস্তক ও সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে, যদিও তাহার সংখ্যা অধিক নহে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে, সন্দেহ নাই।

অধুনা জারমেন দেশীয় লণ্ডন নগরবাসী সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মেক্স মূলার মহোদয় মৃতপ্রায় প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বেদ বেদাঙ্গাদি দুরূহ শাস্ত্র সকলকে পুনরুজ্জীবিত করিবার মানসে যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, তাহা অতীব আশ্চর্য্য। তিনি মাধবাচার্য্য-কৃত ভাষ্যসম্বলিত ঋক্ বেদসংহিতা মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অদ্যাপি তাহা শেষ করিয়া তুলিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু যতদূর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও বিস্তর উপকার হইতেছে। ইহা ব্যতীত তিনি হিস্টরি অফ এনসিএন্ট সংস্কৃট্ লিটারেচর নামক যে

গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা অধ্যয়ন করিলেও উক্ত বিষয়ের জ্ঞান লাভ দুরূহ হয় না। গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইলে বেদ বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রের মর্ম্ম পরিগ্রহ অনায়াসেই করিতে পারা যায়।

আমরা পাঠকবর্গের প্রীত্যর্থ উক্ত মহোপকারী গ্রন্থের সারাংশ সঙ্কলন করিয়া সময়ে সময়ে প্রকটন করিব।

'বিবিধার্থ-সংগ্রহ'। পর্ব ৭/৭৯ খণ্ড। কার্ত্তিক ১৭৮৩ শক। পৃ. ১৩০-৩২

পঞ্চতন্ত্র

এতদ্দেশের প্রাচীন উপন্যাসসকল সঙ্গ্রহ করিয়া বিষ্ণুশর্ম্মা 'পঞ্চতন্ত্র' নামক এক নীতিগ্রন্থ প্রকটন করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থের উপন্যাস-সকল অতীব মনোরম্য এবং সদ্ভাব-কল্পিত। পৃথিবীর প্রায় সকল খণ্ডে ঐ গ্রন্থের উপাদেয়তা বহুকাল পরিচিত আছে, এবং ইউরোপ ও আশিয়ার সকল সভ্য ভাষায় তাহার অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে। পরন্তু এক ভাষার গ্রন্থ অন্য ভাষায় অনুবাদিত করিলে তাহার কোন কোন স্থান পরিবর্জ্জিত হইয়া থাকে। তৎপ্রযুক্ত অনুবাদকেরা প্রয়োজনমত স্থলবিশেষ পরিত্যাগ এবং পরিবর্ত্তন করাতেই প্রস্তাবিত গ্রন্থ এরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে যে তাহার সংশোধন ব্যতীত মূলের সহিত ঐক্য হইবার সম্ভাবনা নাই। অনুবাদেই এই দশা ঘটিয়াছে এমত নহে; সংস্কৃত ভাষার মূল পঞ্চতন্ত্রেও অনেক রূপান্তর দেখা যায়। হিতোপদেশ গ্রন্থই তাহার উদাহরণ। অনেকের ভ্রম আছে, পণ্ডিতগণাগ্রগণ্য বিষ্ণুশর্ম্মা হিতোপদেশ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পদার্থতঃ বিষ্ণুশর্ম্মার সহিত হিতোপদেশের কোনো সম্পর্কই ছিল না, এবং যৎকালে হিতোপদেশ সঙ্কলিত হইয়াছিল তৎকালে বিষ্ণুশর্ম্মা

জীবিতই ছিলেন কিনা, তাহা সন্দেহস্থল। পঞ্চতন্ত্র হইতে সঙ্কলন করিয়া হিতোপদেশের সৃষ্টি হয়, তৎপ্রমাণ হিতোপদেশের প্রথম প্রকরণের নবম শ্লোকেই ব্যক্ত আছে। পরন্তু কোন মহাত্মা বিষ্ণুশর্ম্মা-কৃত পঞ্চতন্ত্রের চারি পাদ মাত্র গ্রহণ করিয়া পাদৈক পরিত্যাগপূর্ব্বক কি উদ্দেশে ইহার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন, এবং অন্যান্য স্থল হইতে ভাবালঙ্কারাদি কুড়াইয়া ইহাতে বিন্যাস করিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা অত্যন্ত দুষ্কর। ফলতঃ ইহা বলা বাহুল্য যে পঞ্চতন্ত্রের অকারণ চারি ভাগ সঙ্কলন করিয়া তাহাতে অন্য গ্রন্থের ভাব ও অলঙ্কার বিন্যস্ত করিয়া বিষ্ণুশর্ম্মা স্বকৃত গ্রন্থের গৌরবের হানি কখনই করেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ সর্ উইলিয়ম্ জোন্স ও সর্ চার্লস্ উইল্কিন্স সাহেব হিতোপদেশের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া ইউরোপীয় পাঠকবর্গের মহোপকার করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। ফলতঃ মূল গ্রন্থ দেখিয়া অনুবাদ করাই ভদ্র ছিল; যেহেতু মূলের সহিত হিতোপদেশের এতাদৃশ অল্প প্রভেদ-সম্বন্ধ যে তন্নিমিত্ত আবার পঞ্চতন্ত্রের স্বতন্ত্ররূপে অনুবাদের আবশ্যক করে না। পরন্তু তৎকালে পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থ ঐ সাহেবদিগের নিকট বিদিত ছিল না।

প্রায় ৯ শত বৎসর গত হইল এতদ্দেশে 'বৃহৎকথা' নামে আর একখানি গ্রন্থের সৃষ্টি হয়। হিতোপদেশে ও পঞ্চতন্ত্রে যেরূপ অল্পই প্রভেদ-সম্বন্ধ আছে পঞ্চতন্ত্রে এবং তদ্গ্রন্থেও প্রায় সেইরূপ সম্বন্ধ। ইহার কোন কোন স্থান পরিত্যক্ত এবং পরিবর্ত্তিত হইয়া আরবী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। মূল সংস্কৃত এবং আরবী অনুবাদদ্বারা পঞ্চতন্ত্র ইউরোপ ও আশিয়ার সকল ভাষায় প্রচারিত আছে। আশিয়ার পশ্চিম খণ্ডে উক্ত গ্রন্থ "পিল্পের উপন্যাস" বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। আরবী অনুবাদক বিদ্পের নামাপভ্রংশে পিল্পে শব্দ ব্যবহার করায় তাহাই প্রচারিত হয়। এতদ্গ্রন্থ কিরূপে অন্য দেশে প্রচার হয় তদ্বৃত্তান্ত জানিতে পাঠকবর্গ অবশ্যই উৎসুক আছেন। তৎপ্রযুক্ত এই স্থলে তাহার সঙ্ক্ষেপ বৃত্তান্ত উল্লেখ করা যাইতেছে।

পারস্য দেশের জগদ্বিখ্যাত অধিপতি নৌসেরবাঁ ৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে পারস্য জাতীয়েরা অগ্নিপূজা করিত, সুতরাং নৌসেরবাঁও যে তেজোপাসক ছিলেন, তাহা বলিবার আর অপেক্ষা রাখে না। মুসলমানেরা বিদ্বেষী হইলেও নৌসেরবাঁকে অগ্নিপূজক জানিয়াও "ন্যায়পরায়ণ" ও "শ্রেষ্ঠ" উপাধি দ্বারা সম্বোধন করিত। অধিকন্তু উক্ত জাতীয়দিগের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মুহম্মদ স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে "তাদৃশ পুণ্যাত্মা রাজার সময়ে আমি জন্মগ্রহণ করিয়া আত্মাকে শ্লাঘ্য করিয়া মানিতেছি।" গোলেস্তাঁ এবং অন্যান্য গ্রন্থে নৌসেরবাঁর অপরিসীম যশঃকীর্ত্তি বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। বাস্তবিক পারস্য দেশের নৌসেরবাঁ ও অস্মদ্দেশের বিক্রমাদিত্য উভয়ে তুল্যরূপে স্বদেশহিতৈষী, বিদ্যানুরাগী ও গুণগ্রাহী ছিলেন; অতএব অল্পমাত্র লিপিবিন্যাসে তাঁহার কীর্ত্তিকলাপের কিছুই পরিচয় হইতে পারে না। একদা উক্ত অশেষ গুণান্বিত রাজচূড়ামণি শ্রবণ করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষস্থ কোন রাজার গ্রন্থাগারে "পঞ্চতন্ত্র" নামক এক অতি চমৎকার গ্রন্থ আছে; তদ্দ্বারা নীতিজ্ঞান-বিষয়ে বিবিধার্থ লাভ হয়। রাজা এতৎ শ্রবণমাত্র মন্ত্রিকে উক্ত গ্রন্থ আনয়নার্থ আদেশ করিলে তিনি বুজর্‌চিমিহর্ নামা এক সংস্কৃতাভিজ্ঞ বৈদ্যকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। উক্ত পারসী এতদ্দেশে আগমনপূর্ব্বক রাজার অজ্ঞাতে কোন ব্যক্তিদ্বারা গ্রন্থাগার হইতে পুস্তক আনাইয়া দিবারাত্র অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে অল্পদিবসের মধ্যে তাহার অনুবাদ সঙ্গ্রহ করিয়া পারস্য দেশে যাত্রা করেন। পারস্য-রাজসভায় সেই গ্রন্থ পঠিত হইলে সভাস্থ সকলেই। চমৎকৃত ও বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। উক্ত অনুবাদে বুজর্‌চিমিহরের পূর্ব্ববৃত্তান্ত ও তল্লাভ প্রসঙ্গে যে যে আপদ ঘটিয়াছিল তৎ সমস্ত লিখিত আছে।

বুজর্‌চিমিহর্ এতদ্‌গ্রন্থ পারস্য দেশের প্রাচীন পহলবী ভাষায় অনুবাদ করেন। আরবী অনুবাদক বিদ্‌পে তাহার কোন কোন স্থান প্রত্যাখ্যান এবং পরিযোজনার দ্বারা তাহা আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা এরূপ চমৎকার ও সুমধুর হইয়াছিল যে

পারস্য দেশের পহলবী ভাষা বিলুপ্ত হইলে তদ্দেশবাসিরা উক্ত গ্রন্থ পুনর্ব্বার আরবী ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়াছিল। পরন্তু উক্ত গ্রন্থ এইরূপে বহুবার অনুবাদিত ও রূপান্তর প্রাপ্ত হইলেও তাহার চমৎকারিত্বের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় নাই। অদ্যাপি তাহার বিশেষ আদর সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে।

ইংরাজীতে মূল পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ নাই ; কিন্তু তাহার স্থূল মর্ম্মের অনেকগুলি অনুবাদ আছে। তন্মধ্যে চারিখানি অনুবাদ বিশেষ প্রসিদ্ধ। যথা,

১ হ্যারিস্ সাহেবের কৃত পারসির অনুবাদ।

২ সর্ উইলিয়ম্ জোন্স্-কৃত সংস্কৃত হিতোপদেশের অনুবাদ।

৩ সর্ চার্লস্ উইলকিন্স্-কৃত ঐ অনুবাদ।

৪ নচ্ধুল্-কৃত আরবীয় অনুবাদ হইতে অনুবাদ।

মূল পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ ইংরাজীতে না হইলেও পণ্ডিতবর উইল্সন্ সাহেব বিলাতের 'রয়াল এশিয়াটিক্ সোসাইটী' নাম্নী সভার কার্য্য-প্রকাশিকায় মূল গ্রন্থের চূর্ণক অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করাতেই তদভাবের লাঘব হইয়াছে।

আশিয়া খণ্ডের উপন্যাসমাত্রেই সর্ব্বাদৌ একটীমাত্র গল্প আরব্ধ হয়। তদনন্তর পর পর তাহা শাখা-প্রশাখায় বিস্তারিত হইয়া এরূপ নিবিড় ভাব ধারণ করে যে অল্পায়াসে তন্মধ্যে কাহারও প্রবেশের পথ থাকে না। "আরব্য উপন্যাস" এবং "পঞ্চতন্ত্র" তাহার উদাহরণ। পঞ্চতন্ত্র উপন্যাসের আদি প্রকরণ ভাগীরথীতীরে পাটলীপুত্র নগরে সুদর্শন নামা সর্ব্বগুণোপেত রাজা ছিলেন। বিষ্ণুশর্ম্মা তাঁহার পুত্রদিগের নীতি-শিক্ষার্থে পাঁচটী গল্প বলেন। তৎশ্রবণে রাজপুত্রেরা ৬ মাসের মধ্যে বৈদগ্ধ্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ফলতঃ ৬ মাসের মধ্যে পঞ্চতন্ত্রের গল্প শেষ করা বিষ্ণুশর্ম্মার পক্ষে বিশেষ প্রশংসনীয় হউক বা না হউক ঐ কাল মধ্যে পাণ্ডিত্য লাভ করা রাজপুত্রদিগের অসাধারণ অভ্যাস-বিষয়ে সকলেই সন্দেহান্বিত হইবেন।

প্রথম উপন্যাস সুহৃদ্ভেদ। এক বৃষের প্রাণবধের নিমিত্ত করটক ও দমনক নামক দুই শৃগালের এক সিংহের সহিত পরামর্শ। আরবী অনুবাদক ঐ দুই শৃগালের নাম হইতেই স্বগ্রন্থের "কলিলা ও দিম্না" নামকরণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় উপন্যাস মিত্রলাভ। এতৎ প্রকরণে কাক, কূর্ম্ম, মূষিক, ও হরিণের দৃঢ়বন্ধুত্ব-স্থাপন। এই অধ্যায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বোধ হয় তজ্জন্যই হিতোপদেশ-সঙ্গ্রহকার সর্ব্বাগ্রেই তাহা গ্রন্থের আদ্যংশে বিন্যস্ত করিয়াছেন।

তৃতীয় প্রকরণ বিগ্রহ। এই অধ্যায় কাক ও পেচকের যুদ্ধে বিনিযুক্ত। এতদধ্যায়ের ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভের গল্প ইংরাজী সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভের উপন্যাসের আদর্শ।

চতুর্থ প্রকরণ প্রাপ্তবস্তুর অপহ্নব। এতৎ পরিচ্ছেদে আরবী অনুবাদক বৃদ্ধ কপি ও মকরের গল্পে কূর্ম্মের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

পঞ্চম উপাখ্যানের উদ্দেশ্য অবিবেচনা। এতৎ অধ্যায়ের অনেকগুলি উপন্যাস ইংরাজী উপকথা সদৃশ। ইহার অপোগণ্ড শিশু ও নকুলের গল্প ইংরাজী বাৎজিহার্ট নামক উপন্যাসের সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রাখিয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরব্য উপন্যাসের আলনস্করের গল্প পারস্য অনুবাদের অপর এক গল্পের তুল্য : এবং শহরে ইন্দুর ও পল্লীগ্রামের ইন্দুর, তথা উদ্যানপাল, ভালুক, এবং মক্ষিকার গল্প, ইউরোপে বিশেষ সুপ্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু মূল-গ্রন্থে ইন্দুরের স্থলে বিড়াল এবং মালীর স্থলে রাজার নাম প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ অনুবাদকেরা ইচ্ছামত এইরূপ করাতেই পঞ্চতন্ত্র ভিন্নদেশে বহু রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে।

'রহস্য-সন্দর্ভ'। পর্ব ৪/৪১ খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৯২৩ সংবৎ। পৃ. ৬৮-৭০

শুদ্ধ নীতিগর্ভ উপদেশ কদাপি মনোহর বোধ হয় না। এই প্রযুক্ত পূর্ব্বকালে পণ্ডিতেরা রম্য-উপন্যাসচ্ছলে বালকদিগের নীতি শিক্ষা করাইতেন। ঐ সকল উপন্যাস অনায়াসে বোধগম্য হয়, ও বালকেরা তাহা আহ্লাদপূর্ব্বক শিক্ষা করে, অধিকন্তু তাহা দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধির কোন ব্যাঘাত হয় না। অতএব তাহা যে জনসমাজে সমাদৃত হইবে ইহা আশ্চর্য্য নহে। অপর রাজাদিগের দোষ স্পষ্টরূপে উল্লিখিত করিলে তাঁহাদিগের বিরাগভাজন হইতে হয় : এই নিমিত্ত সদুপদেষ্টারা এরূপ কৌশলপূর্ব্বক গল্পচ্ছলে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন যে নৃপদিগের বিরাগ প্রকাশ করা দূরে থাকুক তাঁহারা আহ্লাদ ও আগ্রহাতিশয্য সহকারে ঐ সকল গল্প শ্রবণ ও পাঠ করিতেন ; এবং ভক্তি প্রদর্শন-পূর্ব্বক তদ্রচয়িতৃদিগকে সভাসদ করিয়া রাখিতেন।

দুই সহস্র ও তিন চারি শত বৎসর হইল ইউরোপ খণ্ডের গ্রীশ-দেশে ঈসপ নামা কোন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি এইরূপ গল্প রচনায় সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। তাঁহাদ্বারা রচিত গল্পসকল অতীব মনোহর, এবং তাহা পাঠ করিলে যথেষ্ট উপকার দর্শিয়া থাকে। এই প্রযুক্ত ইঙ্গরাজি প্রভৃতি ইউরোপের অনেক ভাষাতে অনুবাদিত হইয়া তাহা প্রচলিত আছে। এস্থলে ঈদৃশ অসাধারণ ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্তের কথঞ্চিৎ উল্লিখিত করিলে অন্যায্য হইবেক না।

ঈসপের বাল্যকাল দাসত্ব পর্য্যবসিত হয়। তাঁহার বাহ্য অবস্থা এমন ছিল না যে সহসা প্রধান ব্যক্তির আলাপনাস্পদ হইতে পারিতেন ; কেবল নিজ অসাধারণ বৈদগ্ধ্য-গুণ-প্রভাবে রাজাদিগের সভাস্থ হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গল্প রচনা করাতে জগতে তাঁহার ঈদৃশ যশঃ প্রচ[া]রিত রহিয়াছে যে তাৎকালিক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদিগেরও প্রায়ঃ সেরূপ হয় নাই বলিলে অসঙ্গত বোধ হইবেক না।

ঈসপের পূর্ব্বে ইউরোপ-খণ্ডে গদ্যরচনার তাদৃশ সুশৃঙ্খলা ছিল না ; সুতরাং ইতিহাসসকল কেবল ঐতিহ্যপ্রমাণে প্রচলিত থাকিত, এবং স্মৃতি সৌকর্য্যার্থ অনেক বিষয় পদ্যেতেও রচিত হইত। খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে আশিআ খণ্ডে গ্রীশদেশীয়দের গমনাগমন হওয়াতে রাজাগণ বিদ্যারসাস্বাদনে সমর্থ হইয়া নানা দিগ্ দেশান্তর হইতে পণ্ডিত আনাইয়া বৃত্তি-প্রদান-পূর্ব্বক নিজ ২ সভায় রাখিতে আরব্ধ করেন। তাহাতে ক্রমে গদ্যরচনার সুপ্রচার হইতে লাগিল। আশিআ খণ্ডে লিডিয়া দেশাধিপতি অতুল-ঐশ্বর্য্যশালি কৃশস্ অর্থ-লাভের বশীভূত হইয়াও দেশদেশান্তর হইতে পণ্ডিত আনয়ন করাইয়া ছিলেন। ঐ সময়ে ঈসপ গ্রীশদেশ হইতে তথায় নীত হন। ঈসপ যে কেবল অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে রসিকতাশক্তি প্রকাশ করিতেন তাহা নহে ; ঐ শক্তি তিনি নীতি শাস্ত্র ও রাজনীতি শিক্ষাতেও প্রয়োগ করিয়াছেন। কৃশস্ ঈসপকে সাতিশয় প্রীতি করিতেন ; এবং কখন ২ রাজ্য সম্বন্ধীয় গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহের ভার দিয়া স্থানান্তরে প্রেরণ করিতেন। ঈসপ, যে কার্য্য সহজে সিদ্ধ হইবেক না বুঝিতেন, গল্প করিয়া লোকের মন বশীকৃত করণপূর্ব্বক তাহা সম্পন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেন।

একদা কৃশস্ গ্রীশদেশে ডেলফাই-বাসীদিগের প্রাপ্য অর্থ পরি-শোধিত করিয়া দিবার নিমিত্ত ঈসপকে তথায় প্রেরণ করেন। কোন কারণবশতঃ তত্রত্য ব্যক্তিরা ঈসপের প্রতি রোষপরবশ হইয়া উঠিল। তিনি তাহাদিগের প্রীতি জন্মাইবার অব্যর্থোপায়-স্বরূপ নিজ অসাধারণ কৌতুককারিত্ব শক্তির অবলম্বন করিলেন। কিন্তু দৌর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সে চেষ্টা ফলোপধায়িকা হইল না। ডেলফাই নগরস্থ দেবমন্দিরের পুরোহিতেরা তাঁহাকে কোন উচ্চ স্থান হইতে নিক্ষিপ্ত করে। তদ্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

ঈসপের মৃত্যুর পর গ্রীশদেশে মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে সাধারণের এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ঈসপকে হত্যারূপ তাহাদিগের কৃতাপরাধের অমোঘদণ্ডস্বরূপ ঐ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

ঈসপের জীবদ্দশায় লোকের তাঁহার প্রতি যত শ্রদ্ধা না জন্মিয়াছিল তাঁহার মৃত্যুর কিছু কাল পরে অপেক্ষাকৃত অধিক শ্রদ্ধা জন্মে। তাঁহার রচিত গল্পগুলির বিলক্ষণ অনুশীলন হইতে লাগিল, বিশেষতঃ গ্রীশদেশে তাঁহার গল্পানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে অত্যন্ত মূর্খ বলিয়া সমাজে ঘৃণাস্পদ হইতে হইত। ঈসপের মৃত্যুর দুই শতাব্দীর পর প্রসিদ্ধ ভাস্কর লিসিপস্কৃত তাঁহার এক প্রতিরূপ এথনস্ নগরে স্থাপিত হয়।

ঈসপের রচিত বলিয়া গ্রীকভাষাতে গদ্যে যে সকল গল্প আছে, অনেকে তাহা তাঁহার রচিত নয় বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করেন। সন্দিগ্ধ ব্যক্তিরা ইহাও নির্দ্দেশিত করিয়া থাকেন, যে সঙ্কলন ও সংশোধন এবং অনুবাদের দোষে ঈসপের রচিত গল্পের বিপর্য্যয়ও ঘটিয়াছে, পরন্তু অনেকে পক্ষান্তরে ফিডরস্ প্রণীত ঈসপের গল্পগুলিকে সটীক বলিয়া থাকেন। যাহা হউক বিপর্য্যাসই ঘটিয়া থাকুক আর সটীকই থাকুক, তাহার চমৎকারিত্বের ও ফলোপধায়কত্বের যে ব্যত্যয় ঘটে নাই ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

বিদেশীয়েরা এতদ্দেশীয় গ্রন্থাদির প্রতি যে রূপ যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন, অন্যত্রের উৎকৃষ্ট গ্রন্থের প্রতি আমাদের সেরূপ অনুরাগ থাকে ইহা বাঞ্ছনীয়। ঈসপের গল্পসকলের বাঙ্গালা অনুবাদ হয় ইহা আমাদিগের ইচ্ছা ছিল, তিন বৎসর হইল শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা ভাষাতে ৬৮টী গল্পের অনুবাদ করিয়া সেই মনোরথ সিদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদের নাম "কথামালা"। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা অতীব সরল : সুতরাং তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে একথা বলা বাহুল্যমাত্র। প্রায়ঃসকল বাঙ্গালা পাঠশালাতেই বালক-দিগের পঠনার্থ তৎকৃত কথামালা ব্যবহৃত হইয়াছে।

ঈসপের জীবন-বৃত্তান্ত-প্রসঙ্গে এতদ্দেশীয় গল্প রচকদিগের উল্লেখ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না, যেহেতু গল্প রচনা বিষয়ে তিনি যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন এমত নহে। আশিআ খণ্ডেও তাঁহার মত গল্প রচয়িতা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা অনায়াসে নির্দ্দেশিত করিতে

পারা যায়। অতি প্রাচীন কালে এতদ্দেশে বিষ্ণুশর্ম্মা নামে এক ব্যক্তি পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার রচিত পঞ্চাধ্যায় বিশিষ্ট পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থ অতি চমৎকার বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তাহার উপাখ্যানগুলি যেরূপ মনোহর তদ্রূপ নীতিপূর্ণ। নানা ভাষাজ্ঞ সর উইলিয়ম জোন্‌স সাহেব ইহার সম্বন্ধে বর্ণন করিয়াছেন, "বিষ্ণুশর্ম্মার রচিত গল্প সকল যদিচ অত্যন্ত প্রাচীন না হউক, কিন্তু পৃথিবীতে এমন নীতিগর্ভ চমৎকার গল্প আর নাই।" সভ্যজাতি মাত্রই বিষ্ণুশর্ম্মপ্রণীত পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের সমাদর করিয়া থাকেন। কোলব্রুক সাহেব স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন, যে "হিতোপদেশ যত ভিন্ন ২ ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, বাইবল ভিন্ন আর কোন গ্রন্থের তদ্রূপ হয় নাই।" ফলতঃ বিদ্যার আস্বাদগ্রাহী জাতি মাত্রেই স্বস্বদেশ-ভাষায় ইহার অনুবাদ করণে প্রয়াস পাইয়াছেন।

এই প্রসিদ্ধ নীতিশাস্ত্রবেত্তা কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহরূপে নিরূপিত হয় নাই। পরন্তু তিনি যে বহুকালাবধি এতদ্দেশে প্রসিদ্ধ আছেন ইহা কেহই অজ্ঞাত নহেন। নীতিশাস্ত্র বিষয়ে ইহাঁর পারদর্শিতা কেবল চাণক্যের সুখ্যাতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, যেহেতু উভয়েই অর্থশাস্ত্র হইতে নীতিশাস্ত্রের উদ্ধার কর্ত্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ভারতবর্ষে অধুনা যে ২ নীতিবিষয়ক গ্রন্থ আছে তাহা প্রায়ঃ সকলই ঐ আচার্য্যদ্বয়ের মতানুসারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরন্তু নীতিবিষয়ে চাণক্য কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার নির্দ্দেশ নাই; অথচ কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ না রচনা করিলে তিনি যে প্রকার বিখ্যাত হইয়াছেন তদ্রূপ বিখ্যাত হওয়া যায় না। অপর তাদৃশ বিখ্যাত ব্যক্তির গ্রন্থ যে লুপ্ত হইবে এমত সম্ভাবনীয় নহে; অতএব বোধ করা যাইতে পারে যে তাঁহার গ্রন্থ অন্য কোন নামে প্রচলিত আছে। সেই নামের অনুসন্ধান করিতে হইলে তাঁহার শিষ্য কামন্দকীর নীতিসার গ্রন্থে তথা মুদ্রারাক্ষসে ব্যক্ত হয় যে তাঁহার অপর নাম বিষ্ণুগুপ্ত। ঐ নামের সঙ্ক্ষেপ বিষ্ণু, তাহাতে ব্রাহ্মণবোধক উপাধি শর্ম্মার যোগ করিলে,

চানক্য ও পঞ্চতন্ত্রকার বিষ্ণুশর্ম্মাকে এক ব্যক্তি স্বীকার করিতে হয়। এই সমন্বয় কোন মতে অসঙ্গত বোধ হয় না ; এবং ইহা সিদ্ধ হইলে বিষ্ণুশর্ম্মাকে রাজা চন্দ্রগুপ্তের সমকালবর্ত্তী মানিতে হইবে ; সুতরাং তিনি বিক্রমাদিত্যের সংবৎ সংস্থাপনের আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

অন্যূন ত্রয়োদশ শত বৎসর হইল, পারস্যাধিপ নৌশেরয়াঁ বাদশাহ তদীয় হাকিম বুজর্জেমিহরকর্ত্তৃক পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ করান। ঐ অনুবাদ পহলবি* ভাষাতেই সম্পন্ন হয়। সেই অবধি ভিন্ন দেশীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ আরব্ধ হয়। অনন্তর আরব জাতি পারস্য দেশ বিজিত করিলে আরব্য ভাষায় ইহা অনুবাদিত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত বোধহয় আন্‌বর সোহেলী পারস্য উপাখ্যান বাহারদানশ প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে পঞ্চতন্ত্রের অধিকাংশের অবিকল অনুবাদ ও কোন ২ স্থলে বিপর্য্যাস লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ অনবর্ সোহেলি পঞ্চ-তন্ত্রের অনুবাদ ব্যতীত আর কিছু নহে, কেবল নাম ভেদ মাত্র। অপর আরবেরা ক্রমশঃ ইউরোপ খণ্ডে প্রবিষ্ট হইলে, ইউরোপে পঞ্চতন্ত্র পিল্‌পের গল্প বলিয়া প্রচারিত হয় : ও লাটীন গ্রীকাদি প্রভৃতি নানা ভাষাতে ইহার অনুবাদ সিদ্ধ হয়।

বিষ্ণুশর্ম্মা পঞ্চতন্ত্রের দুইটি উপাখ্যান লইয়া নিজ হিতোপদেশ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। অনন্তভট্ট কথামতনিধি নামক গ্রন্থ ঐ আদর্শ হইতে সঙ্ক]ক[লিত করিয়াছেন। হিতোপদেশের বাঙ্গালা অনুবাদ অনেক আছে ; সুতরাং তাহাতে পঞ্চতন্ত্রের যে দুই তন্ত্র আছে, তাহাও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পরন্তু এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ উন্নতি ও অনু-শীলন হইতেছে, তাহাতে পঞ্চতন্ত্রের ন্যায় দেশদেশান্তরে সমাদৃত গ্রন্থের অনুবাদ হয় ইহা বাঞ্ছনীয়। অনুবাদক-সমাজের আনুকূল্যে সেই বাঞ্ছিত বিষয়ের সিদ্ধি হইয়াছে। শ্রীযুত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়

* সংস্কৃতের সহিত প্রাকৃত ভাষার যেরূপ সাদৃশ্য আছে, প্রাচীন জেন্দ ভাষার সহিত পাহলবি ভাষারও সেইরূপ আছে।

হিতোপদেশ গ্রন্থে গৃহীত দুই তন্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর তিন তন্ত্রের অনুবাদ করিয়াছেন। ঐ অনুবাদগ্রন্থের নাম "নীতিকথামালা"। তাহাতে পণ্ডিত মহাশয় আপনার সরল-রচনাশক্তির এক উৎকৃষ্ট আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

ববিধার্থ-সংগ্রহ'। পর্ব ৫/৫৬ খণ্ড। অগ্রহায়ণ ১৭৮০ শক। পৃ. ১৮৭-৯০

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর

মহাকাব্য

কোনও দেবতার, অথবা সদ্বংশজাত অশেষসদ্‌গুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ের, অথবা একবংশোদ্ভব বহু ভূপতিদিগের বৃত্তান্ত লইয়া যে কাব্য রচিত হয়, তাহাকে মহাকাব্য বলে। মহাকাব্য নানা সর্গে অর্থাৎ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। সর্গসংখ্যা অষ্টাধিক না হইলে, তাহাকে মহাকাব্য বলে না। সংস্কৃত ভাষায় যত মহাকাব্য আছে, তাহাতে দ্বাবিংশতির অধিক সর্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন মহাকাব্য আদ্যোপান্ত এক ছন্দে রচিত নহে ; এক এক সর্গ এক এক ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে রচিত। সর্গের অবসানে এক, দুই, অথবা তদধিক অন্য অন্য ছন্দের শ্লোক থাকে। সকল সর্গই যে এক এক ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে রচিত এমন নহে। মহাকাব্যে দুই, তিন, চারি, পাঁচ সর্গও এক ছন্দে রচিত দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও সর্গ নানা ছন্দেও রচিত হইয়া থাকে। সর্গ সকল অতি সংক্ষিপ্ত অথবা অতি বিস্তৃত নহে। সর্গের শেষে পর সর্গের বৃত্তান্তসূচনা থাকে। মহাকাব্য সকল আদিরস অথবা বীররস প্রধান, মধ্যে মধ্যে অন্যান্য রসেরও প্রসঙ্গ থাকে। কবি, কিংবা বর্ণনীয় বিষয়, অথবা নায়কের নামানুসারে মহাকাব্যের নাম নির্দ্দেশ হয়।

র ঘু বং শ

সংস্কৃত ভাষায় যত মহাকাব্য আছে, কালিদাসপ্রণীত রঘুবংশ সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। কালিদাস কীদৃশকবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, বর্ণনা করিয়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। যাঁহারা কাব্যের যথার্থরূপ রসাস্বাদে অধিকারী, সেই সহৃদয় মহাশয়েরাই বুঝিতে পারেন, কালিদাস কিরূপ কবিত্বশক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক

লিখিয়া গিয়াছেন। বোধ হয়, কোনও দেশের কোনও কবি, আমাদের কালিদাসের ন্যায়, সকল বিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না।

তিনি যে অলৌকিক কবিত্বশক্তি পাইয়াছিলেন, স্বরচিত কাব্যসমূহে সেই শক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা সকল পাঠ করিয়া চমৎকৃত ও মোহিত হইতে হয়, তাহাতে অত্যুক্তির সংশ্রবমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না ; আদ্যোপান্ত স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। বস্তুতঃ, এবংবিধ সম্পূর্ণরূপ স্বভাবানুযায়িনী ও একান্ত হৃদয়-গ্রাহিণী বর্ণনা সংস্কৃত ভাষায় আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কালিদাসের উপমা যার পর নাই মনোহারিণী ; বোধ হয়, কোনও দেশের কোনও কবি উপমা বিষয়ে কালিদাসের সমকক্ষ নহেন। তিনি এরূপ সংক্ষেপে, ও এরূপ লোকসিদ্ধ বিষয় লইয়া, উপমা সঙ্কলন করিয়াছেন যে পাঠক মাত্রেরই অনায়াসে ও আবৃত্তি মাত্র উপমান ও উপমেয়ের সৌসাদৃশ্য হৃদয়ঙ্গম হয়। তাঁহার রচনা সংস্কৃত রচনার আদর্শ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা তাঁহার পূর্ব্বে সংস্কৃত রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিংবা যাঁহারা তাঁহার উত্তরকালে সংস্কৃত রচনা করিয়াছেন, কি কবি, কি অন্যান্য গ্রন্থকার, কাহারই রচনা তাঁহার রচনার ন্যায় চমৎকারিণী ও মনোহারিণী নহে। তাঁহার রচনা সরল, মধুর ও ললিত। তিনি একটীও অনাবশ্যক অথবা পরিবর্ত্তসহ শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। কালিদাসের গ্রন্থ পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সমস্ত তাঁহার লেখনীর মুখ হইতে অক্লেশে ও অনর্গল নির্গত হইয়াছে, রচনা বা ভাবসঙ্কলনের নিমিত্ত, তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তও চিন্তা করিতে হয় নাই। বস্তুতঃ, এরূপ রচনা ও এরূপ কবিত্বশক্তি এই উভয়ের একত্র সজ্ঘটন অতি বিরল। এই নিমিত্তই কালিদাস প্রণীত কাব্যের এত আদর ও এত গৌরব ; এই নিমিত্তই ভারতবর্ষীয় লোকেরা কালিদাসকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ; এই নিমিত্তই প্রসন্ন-রাঘবকর্ত্তা জয়দেব, স্বীয় নাটকের প্রস্তাবনাতে, কালিদাসকে কবি-

কুলগুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; এবং এই নিমিত্তই, কি স্বদেশে কি বিদেশে, কালিদাসের নাম অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কালিদাস, এইরূপ অলৌকিক কবিত্বশক্তি ও এইরূপ অদ্বিতীয় রচনাশক্তিসম্পন্ন হইয়াও, এরূপ অভিমানশূন্য ছিলেন এবং আপনাকে এরূপ সামান্য জ্ঞান করিতেন যে শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তিনি রঘুবংশের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্ ।
প্রাংশুলভ্যে ফলে মোহাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥ ১ । ৩

যেমন বামন উন্নতপুরুষপ্রাপ্য ফলের গ্রহণাভিলাষে বাহুপ্রসারিত করিয়া উপহাসাস্পদ হয়, সেইরূপ, আমি কবিকীর্ত্তিলাভে অভিলাষী হইয়াছি, উপহাসাস্পদ হইব।

কালিদাস, অদ্বিতীয় বিদ্যোৎসাহী, গুণগ্রাহী, বিখ্যাতনামা বিক্রমাদিত্যের সভায়, নবরত্নের অন্তর্বর্ত্তী ; সুতরাং ঊনবিংশতি শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

কালিদাসের যে সমস্ত গুণ বর্ণিত হইল, প্রায় তৎপ্রণীত যাবতীয় কাব্যেই সে সমুদয় সুস্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। রঘুবংশে সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। এই মহাকাব্য ঊনবিংশতি সর্গে বিভক্ত। প্রথম আট সর্গে দিলীপ, রঘু, অজ এই তিন রাজার বর্ণন আছে। নবম অবধি পঞ্চদশ পর্য্যন্ত সাত সর্গে দশরথের ও দশরথতনয় রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। অবশিষ্ট চারি সর্গে, কুশ অবধি অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত, রামের উত্তরাধিকারীদিগের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত আছে। রঘুবংশের আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। যে অংশ পাঠ করা যায়, সেই অংশেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়! কিন্তু এতদ্দেশীয় সংস্কৃতব্যবসায়ীরা এমনই সহৃদয় ও এমনই রসজ্ঞ যে সংস্কৃত ভাষার সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য রঘুবংশকে অতি সামান্য কাব্য জ্ঞান করিয়া থাকেন।

কালিদাসের দ্বিতীয় মহাকাব্য কুমারসম্ভব। কুমারসম্ভব অনেক অংশে রঘুবংশের তুল্য। এই মহাকাব্যের স্থূল বৃত্তান্ত এই ; তারকনামে এক মহাবল পরাক্রান্ত অতিদুর্দ্দান্ত অসুর, ব্রহ্মদত্ত বরের প্রভাবে অত্যন্ত গর্ব্বিত ও দুর্জ্জয় হইয়া, দেবতাদিগকে স্ব স্ব অধিকার হইতে চ্যুত করিয়া, স্বয়ং স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। দেবতারা, দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া, ব্রহ্মার শরণাগত হইলে, তিনি তাহাদিগকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন যে পার্ব্বতীর গর্ভে শিবের যে পুত্র জন্মিবেন, তিনি তোমাদের সেনাপতি হইয়া, তারকাসুরের প্রাণ সংহার করিয়া, তোমাদিগকে পুনর্ব্বার স্ব স্ব অধিকার প্রদান করিবেন। তদনুসারে, দেবতারা উদ্যোগী হইয়া হরগৌরীর পরিণয় সম্পাদন করিলে, কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হয়। অনন্তর, তিনি, দেবসৈন্য সমভিব্যাহারে সমরসাগরে অবতীর্ণ হইয়া, দুর্বৃত্ত তারকাসুরের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক, দেবতাদিগকে আপন আপন অধিকারে পুনঃস্থাপিত করেন। এই বৃত্তান্ত সুচারুরূপে কুমারসম্ভবে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

কুমারসম্ভব সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম সাত সর্গেরই সর্ব্বত্র অনুশীলন আছে, অবশিষ্ট দশ সর্গ একবারে অপ্রচলিত ও বিলুপ্ত-প্রায় হইয়া আসিয়াছে—এমন অপ্রচলিত যে ঐ দশ সর্গ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে বলিয়া, অনেকেই অবগত নহেন। এই দশ সর্গ, কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও, যে এরূপ অপ্রচলিত ও অপরিজ্ঞাত হইয়া আছে, তাহার হেতু এই বোধ হয়, অষ্টম সর্গে হরগৌরীর বিহার বর্ণনা আছে; তাহাও, সামান্য নায়ক নায়িকার বিহারের ন্যায়, বর্ণিত হইয়াছে। নবমে হরগৌরীর কৈলাস-গমন এবং দশমে কার্ত্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই দুই সর্গেও হরগৌরীঘটিত অশ্লীল বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ভারত-বর্ষীয় লোকেরা হরগৌরীকে জগৎপিতা ও জগন্মাতা জ্ঞান করেন। জগৎপিতা ও জগন্মাতা সংক্রান্ত অশ্লীল বর্ণনা পাঠ করা একান্ত অনুচিত

বিবেচনা করিয়া, লোকে কুমারসম্ভবের শেষ দশ সর্গের অনুশীলন রহিত করিয়াছে। আলঙ্কারিকেরাও কুমারসম্ভবের হরগৌরীবিহার-বর্ণনাকে অত্যন্ত অনুচিত ও অত্যন্ত দূষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একাদশ অবধি সপ্তদশ পর্য্যন্ত সাত সর্গে কার্ত্তিকেয়ের বাল্যলীলা, সৈনাপত্যগ্রহণ, তারকাসুরের সহিত সংগ্রাম ও সেই সংগ্রামে তারকাসুরের নিপাত, এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। এই সাত সর্গে অশ্লীল বর্ণনার লেশমাত্র নাই। কিন্তু অষ্টম, নবম, দশম এই তিন সর্গের দোষে, ইহারাও একবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আছে।

এরূপ কিংবদন্তী আছে, এক কুম্ভকার কালিদাসের পরম মিত্র ছিলেন। কালিদাস, কুমারসম্ভব রচনা করিয়া, ঐ কুম্ভকার মিত্রকে দেখাইতে লইয়া যান। কুম্ভকার পাঠ করিয়া, সম্মুখবর্ত্তী একখান কাঁচা সরার উপর রাখিয়া দেন। তাহাতে কালিদাস বোধ করিলেন, এই গ্রন্থ কাঁচা হইয়াছে, এবং সেই নিমিত্ত তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ পুস্তক হস্তে লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া, ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কুম্ভকার তদ্দর্শনে সাতিশয় সঙ্কুচিত হইলেন, এবং অশেষ প্রয়াসে প্রথম সাত সর্গ মাত্র সঙ্কলন করিতে পারিলেন; অবশিষ্ট দশ সর্গ বিলুপ্ত হইয়া গেল। এই অমূলক অকিঞ্চিৎকর কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া, অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, কুমারসম্ভবের প্রথম সাত সর্গই বিদ্যমান আছে, অবশিষ্ট দশ সর্গ একবারে লোপ পাইয়াছে।

কুমারসম্ভবের যে শেষভাগের কথা উল্লিখিত হইল, ইহার পুস্তক বাঙ্গালা দেশে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালা দেশে কুমারসম্ভবের অন্যধিক এক শেষ ভাগ আছে। এই শেষ ভাগ পাঠ করিলে, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কুমারসম্ভবের শেষ ভাগ বিলুপ্ত হইয়াছে এই স্থির করিয়া, এতদ্দেশীয় কোনও আধুনিক কবি ঐ অংশ রচনা করিয়া গিয়াছেন। উহা পাঠ করিলে, কালিদাসের রচিত বলিয়া কোন ক্রমেই প্রতীতি জন্মিতে পারে না। কুমারসম্ভবে যে বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, শিবপুরাণেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই গ্রন্থে ইতিবৃত্তের

যেরূপ ঐক্য আছে, দুই এক শ্লোকেরও সেইরূপ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। (১) যদি শিবপুরাণকে বেদব্যাসবিরচিত, ও তদনুসারে কালিদাসের কুমারসম্ভব অপেক্ষা প্রাচীন, গ্রন্থ বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, কালিদাস শিবপুরাণের বৃত্তান্ত লইয়া কুমারসম্ভব রচনা করিয়াছেন, এবং মধ্যে মধ্যে, ঐ গ্রন্থের শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত করিয়া আপন কাব্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু কালিদাস অলৌকিক কবিত্বশক্তিসম্পন্ন হইয়া যে আপন কাব্যে অন্যদীয় শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত করিবেন, ইহা কোনও ক্রমে সম্ভাবিত নহে। যে কয়েকটি শ্লোকে ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে, কুমারসম্ভবের অথবা কালিদাসের অন্যান্য গ্রন্থের রচনার সহিত সেই সেই শ্লোকের রচনার সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য দৃশ্যমান হইতেছে ; কিন্তু শিবপুরাণের কোন অংশের রচনার সহিত কোন অংশেই উহাদের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ, শিবপুরাণ কুমারসম্ভব অপেক্ষা প্রাচীন কিনা, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সংশয় আছে। যাবতীয় পুরাণ বেদব্যাসপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু পুরাণ সকলের রচনাপ্রণালী পরস্পর এত বিভিন্ন, এবং এক বিষয় ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে এরূপ বিভিন্ন প্রকারে সঙ্কলিত হইয়াছে যে, ঐ সমস্ত গ্রন্থ এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া, কোন ক্রমেই প্রতীতি জন্মে না। যাঁহাদের সংস্কৃত রচনার ইতরবিশেষ বিবেচনা করিবার শক্তি আছে, তাঁহারা নিরপেক্ষ হইয়া বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, প্রভৃতি পাঠ করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারেন, এই সকল গ্রন্থ এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত নহে। বাস্তবিক, পুরাণ সকল এক ব্যক্তিরও রচিত নয়, এক কালেও রচিত নয়, বোধ হয়, পুরাণনাম-

১ তদিচ্ছামি বিভো স্রষ্টুং সেনান্যং তস্য শান্তয়ে।
কর্ম্মবন্ধচ্ছিদং ধর্ম্মং ভবস্যেব মুমুক্ষবঃ॥
যমোঽপি বিলিখন্ ভূমিং দণ্ডেনাস্তমিতত্বিষা।
বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্॥
শিবপুরাণ, উত্তরখণ্ড, চতুর্দ্দশ অধ্যায়। কুমারসম্ভব, দ্বিতীয় সর্গ।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমুদায়ের অধিকাংশই প্রাচীন নহে। শিবপুরাণ যে বিক্রমাদিত্যের সময়ের পূর্ব্বের রচিত গ্রন্থ, এবং তাহা দেখিয়া কালিদাস কুমারসম্ভব লিখিয়াছেন, এবং তাহা হইতে অবিকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আপন কাব্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন, পুরাণের উপর নিতান্ত ভক্তি না থাকিলে এরূপ বিশ্বাস হওয়া কঠিন; বরং বিপরীত পক্ষই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়। যোগবাশিষ্ঠে ও কুমারসম্ভবেও শ্লোকের ঐক্য আছে। (২) কিন্তু যোগবাশিষ্ঠ যে আধুনিক গ্রন্থ, প্রাচীন ও ঋষিপ্রণীত নহে, এ বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না।

কিরাতার্জ্জুনীয়

রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের পর, সংস্কৃত মহাকাব্যের উল্লেখ করিতে হইলে, উৎকর্ষ ও প্রাথম্য অনুসারে, সর্ব্বাগ্রে কিরাতার্জ্জুনীয়ের নির্দ্দেশ করিতে হয়। এই মহাকাব্যের রচনা অতি প্রগাঢ়, কিন্তু কিঞ্চিৎ দুরূহ, কালিদাসের রচনার ন্যায় সরল নহে। রচনাপ্রণালী দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হয়, কিরাতার্জ্জুনীয়কর্ত্তা ভারবি কালিদাসের উত্তর কালে, এবং মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির বহুকাল পূর্ব্বে, প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

কিরাতার্জ্জুনীয়ের স্থূল বৃত্তান্ত এই: যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চপাণ্ডব, রাজ্যাধিকার হইতে নিষ্কাশিত হইয়া, দ্বৈতবনে বাস করেন। এক দিবস, ব্যাসদেব আসিয়া তাঁহাদিগকে কহেন, দৈব অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমাদিগের নষ্ট রাজ্যের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই; অতএব অর্জ্জুন হিমালয়ে গিয়া ইন্দ্রের আরাধনা করুন। তদনুসারে অর্জ্জুন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া দেবরাজের আরাধনা আরম্ভ করেন। দেবরাজ, তদীয়

২ আকাশভবা সরস্বতী।
শফরীং হ্রদশোষবিহ্বলাং
প্রথমা বৃষ্টিরিবান্বকম্পয়ৎ॥

যোগবাশিষ্ঠ, ভূকৈলাসনিবাসী রাজশ্রীসত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুরের মুদ্রিত পুস্তকের ১২৩ পৃষ্ঠা। কুমারসম্ভব। চতুর্থ সর্গ।

আরাধনায় তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে শিবের আরাধনা করিতে পরামর্শ দেন। অর্জ্জুন শিবের আরাধনা আরম্ভ করিলে, মূক নামে এক দুর্বৃত্ত দানব, বরাহের রূপ ধারণ করিয়া, তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে আইসে। সেই সময়ে শিবও কিরাতরাজের আকার পরিগ্রহ করিয়া অর্জ্জুনের আশ্রমে উপস্থিত হন। অর্জ্জুন, বরাহরূপী দানবের প্রাণদণ্ডার্থে শরাসনে শর সন্ধান করিয়াছেন, এমন সময়ে, কিরাতরাজ এক শর নিক্ষেপ করিয়া বরাহের প্রাণসংহার করিলেন। এই উপলক্ষে, কিরাতরাজের সহিত অর্জ্জুনের সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই সংগ্রামে, অর্জ্জুনের অসাধারণ বল বীর্য দর্শনে, যৎপরোনাস্তি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া, কিরাতরূপী মহাদেব তাঁহাকে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করাইলেন। সেই শিক্ষার প্রভাবে অর্জ্জুন অস্ত্রবিদ্যায় অদ্বিতীয় ও অপ্রতিহতপ্রভাব হইয়া উঠিলেন।

ভারবি কবিত্বশক্তি বিষয়ে কালিদাস অপেক্ষা ন্যূন; কিন্তু ভারতবর্ষের একজন অতি প্রধান কবি ছিলেন, তাহার কোনও সংশয় নাই। কোন সহৃদয় ব্যক্তি এই মহাকাব্যের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ সর্গ পাঠ করিয়া সাতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত না হন এবং পদে পদে অসাধারণ কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ প্রমাণ না পান। কিরাতার্জ্জুনীয় অষ্টাদশ সর্গে বিভক্ত।

শিশুপালবধ

কাব্যকর্ত্তা মাঘনামা কবি স্বগ্রন্থের শেষে লিখিয়াছেন,

— সুকবিকীর্ত্তিদুরাশয়াদঃ
কাব্যং ব্যধত্ত শিশুপালবধাভিধানম্॥

মাঘ, কবিকীর্ত্তি লাভের দুরাশাগ্রস্ত হইয়া, এই শিশুপালবধনামক কাব্য রচনা করিলেন।

মাঘ, অতিপ্রধান কবি ছিলেন এবং তৎপ্রণীত শিশুপালবধ অতি প্রধান মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের স্থূল বৃত্তান্ত এই; কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া, সপরিবারে ইন্দ্রপ্রস্থ প্রস্থান করেন।

যিনি সর্ব্বাংশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হন, তিনিই যজ্ঞে অর্ঘ্য পাইয়া থাকেন। যুধিষ্ঠির, রাজসূয় সমাপ্ত হইলে, ভীষ্মের উপদেশ অনুসারে, কৃষ্ণকে সর্ব্বাংশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থির করিয়া, অর্ঘ্য দান করেন। কৃষ্ণের পিতৃষ্বস্থপুত্র শিশুপাল তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি, কৃষ্ণের এইরূপ অসামান্য সম্মান দর্শনে, অসূয়াপরবশ হইয়া, ভীষ্মের যথোচিত তিরস্কার করিয়া, স্বপক্ষীয় নরপতিগণ সমভিব্যাহারে, সভামণ্ডপ হইতে প্রস্থান করিলেন এবং দূত দ্বারা কৃষ্ণের অনেক তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন। অনন্তর, উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল, এবং সেই সংগ্রামেই কৃষ্ণ শিশুপালের প্রাণ সংহার করিলেন।

শিশুপালবধ কিরাতার্জ্জুনীয়ের প্রতিরূপ স্বরূপ। মাঘ, কিরাতার্জ্জুনীয়কে আদর্শস্বরূপ করিয়া, শিশুপালবধ রচনা করিয়াছেন, তাহার কোনও সংশয় নাই। ভারবি যে প্রণালীতে কিরাতার্জ্জুনীয় রচনা করিয়াছেন, মাঘ শিশুপালবধের রচনাকালের আদ্যোপান্ত সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছেন। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, মহর্ষি ব্যাস আসিয়া পাণ্ডবদিগকে কর্ত্তব্যের উপদেশ দিতেছেন; শিশুপালবধে দেবর্ষি নারদ আসিয়া কৃষ্ণকে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে উদযুক্ত করিতেছেন। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, যুধিষ্ঠির, ভীম, দ্রৌপদী, এই তিনজনের রাজনীতিসংক্রান্ত বাদানুবাদ; শিশুপালবধেও কৃষ্ণ, বলরাম ও উদ্ধবের সেইরূপ রাজনীতিসংক্রান্ত বাদানুবাদ। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, তপস্যা নিমিত্ত, অর্জ্জুনের হিমালয় পর্ব্বতে অবস্থান; শিশুপালবধেও, কৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থ প্রস্থান কালে রৈবতক পর্ব্বতে অবস্থান। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, হিমালয় পর্ব্বতের বহু বিস্তৃত বর্ণনা এবং বর্ণনাসংক্রান্ত শ্লোক সকলের অধিকাংশ যমকালঙ্কার যুক্ত; শিশুপালবধেও, রৈবতক পর্ব্বতের অবিকল সেইরূপ বর্ণনা ও সেইরূপ যমকালঙ্কৃত শ্লোক। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, সুরাঙ্গনাদিগের বনবিহার, নায়কসমাগম, বিরহ, মান প্রভৃতির বর্ণনা আছে; শিশুপালবধেও, অবিকল সেই সমস্ত বর্ণনা আছে। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, কিরাতরাজ অর্জ্জুনের উত্তেজনার নিমিত্ত, তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন;

শিশুপালবধেও, শিশুপাল কৃষ্ণের ভৎ‍‍র্সনার্থে তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। অনন্তর উভয় কাব্যেই উভয় পক্ষের সৈন্যসজ্জা, সৈন্যপ্রয়াণ ও সংগ্রাম বর্ণন আছে। কিরাতার্জ্জুনীয়ের পঞ্চদশ সর্গে যুদ্ধবর্ণন ও একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর, যমক প্রভৃতি শ্লোক অনেক : শিশুপালবধের ও ঊনবিংশ সর্গে যুদ্ধবর্ণন ও ঐরূপ একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর, যমক প্রভৃতি শ্লোক অনেক। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, প্রতিসর্গের শেষ শ্লোকে সর্গসমাপ্তিসূচক লক্ষ্মীশব্দ প্রয়োগ আছে : শিশুপালবধেও, প্রত্যেক সর্গের শেষ শ্লোকে সর্গসমাপ্তিসূচক শ্রীশব্দ প্রয়োগ আছে। কোন স্থলে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, শিশুপালবধে কিরাতার্জ্জুনীয়ের ভাব অবিকল ভিন্ন ছন্দে সঙ্কলিত হইয়াছে। ফলতঃ অভিনিবেশ পূর্ব্বক উভয় কাব্য আদ্যন্ত পাঠ করিলে, ইহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়, কিরাতার্জ্জুনীয় আদর্শ ও শিশুপালবধ তৎপ্রতিরূপ। উভয় কাব্যের রচনাপ্রণালী আলোচনা করিয়া দেখিলে, বিপরীত পক্ষ কোন ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম হয় না। কিরাতার্জ্জুনীয় শিশুপালবধ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ, ইহাতে সংশয় হইবার বিষয় নাই।

মাঘ অদ্ভুত কবিত্বশক্তি ও অদ্ভুত বর্ণনাশক্তি পাইয়াছিলেন। যদি তাঁহার, কালিদাস ও ভারবির ন্যায়, সহৃদয়তা থাকিত, তাহা হইলে তদীয় শিশুপালবধ সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য হইত, সন্দেহ নাই। তিনি সকল বিষয়েরই বহুবিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনা সকল আরম্ভে একান্ত মনোহর, কিন্তু অবসানে নিতান্ত নীরস। মাঘ অধিক বর্ণনা এত অধিক ভালবাসিতেন, যে শেষাংশ নিতান্ত অশক্তিকৃত হইতেছে দেখিয়াও, ক্ষান্ত হইতে পারিতেন না। কখনও কখনও ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, একটি শ্লিষ্ট অথবা সুশ্রাব্য শব্দের অনুরোধে, একটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। সেই শ্লোকের সেই শব্দটি ভিন্ন আর কোন অংশেই আর কোনও চমৎকারিতা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার রচনা প্রগাঢ়, ওজস্বী ও গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক, কিন্তু কালিদাসের অথবা ভারবির ন্যায় পরিপক্ক নহে।

অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের বহুবিস্তৃত বর্ণনা মাঘের অতিপ্রধান দোষ।

তিনি বিংশতিসর্গাত্মক কাব্যের নয় সর্গ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে সমর্পিত করিয়াছেন। কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থ প্রস্থান কালে, প্রথম দিন রৈবতক পর্ব্বতে অবস্থান করেন। এই উপলক্ষে, মাঘ রৈবতক প্রভৃতির অত্যন্ত অধিক বর্ণনা করিয়াছেন। চতুর্থ সর্গে রৈবতক বর্ণন, পঞ্চমে শিবির-সন্নিবেশ, ষষ্ঠে ঋতুবর্ণন, সপ্তমে বনবিহার, অষ্টমে জলবিহার, নবমে সন্ধ্যাবর্ণন, দশমে সুরাপান ও বিহার, একাদশে প্রভাতবর্ণন, দ্বাদশে সৈন্যপ্রয়াণ ; এইরূপ এক এক সর্গে এক এক বিষয় মাত্র বর্ণিত হইয়াছে। মাঘ, এই সমস্ত বর্ণনাতে, স্বীয় অদ্ভুত কবিত্বশক্তি ও বর্ণনাশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল বর্ণনা যেমন অতিবিস্তৃত, তেমনি অপ্রাসঙ্গিক ; প্রকৃতবিষয় শিশুপালবধে উহাদের কোনও উপযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই নয় সর্গ পরিত্যাগ করিলেও কাব্যের ইতিবৃত্ত কোনও ক্রমেই অসংলগ্ন হয় না।

শিশুপালবধ, এইরূপ দোষাশ্রিত হইয়াও যে, এক অত্যুৎকৃষ্ট মহা-কাব্য, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা যে ইহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন (৩), ইহা কোনও ক্রমেই অঙ্গীকার করিতে পারা যায় না। সম্যক্ সহৃদয়তা সহকারে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে শিশুপালবধ রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও কিরাতার্জ্জুনীয় অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

নৈ ষ ধ চ রি ত

এরূপ কিংবদন্তী আছে, শ্রীহর্ষ দেবতার আরাধনা করিয়া তৎপ্রসাদে অলৌকিক কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছিলেন; নৈষধচরিত সেই দেবপ্রসাদ-লব্ধ অলৌকিক কবিত্বশক্তির ফল। শ্রীহর্ষের যে কবিত্বশক্তি অসাধারণ

উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ॥
পুষ্পেষু জাতী নগরেষু কাঞ্চী নারীষু রম্ভা পুরুষেষু বিষ্ণুঃ।
নদীষু গঙ্গা নৃপতৌ চ রামঃ কাব্যেষু মাঘ কবি কলিদাসঃ॥

ছিল, তাহার কোনও সংশয় নাই ; কিন্তু তাঁহার তাদৃশী সহৃদয়তা ছিল না। তিনি নৈষধচরিতকে আদ্যোপান্ত অত্যুক্তিতে এমন পরিপূর্ণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার রচনা এমন মাধুর্য্যবর্জ্জিত, লালিত্যহীন, সারল্যশূন্য ও অপরিপক্ক যে ইহাকে কোনও ক্রমে অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ, অথবা পূর্ব্বোল্লিখিত মহাকাব্য চতুষ্টয়ের তুলনা করিতে পারা যায় না।

শ্রীহর্ষের অত্যুক্তি এমন উৎকট যে, তদ্দ্বারা তদীয় কাব্যের উপাদেয়ত্ব না জন্মিয়া, বরং হেয়ত্বই ঘটিয়াছে। তিনি নলরাজার বর্ণনাকালে কহিয়াছেন, "নলরাজার যুদ্ধযাত্রাকালে সৈন্য দ্বারা যে ধূলি উত্থাপিত হইয়াছিল, সেই ধূলি ক্ষীরসমুদ্রে পতিত হইয়া পঙ্কভাব প্রাপ্ত হয়; উৎপত্তিকালে চন্দ্রের গাত্রে সেই পঙ্ক লাগিয়া কলঙ্ক হইয়াছে।"(৪) নলরাজা যখন অশ্বারোহণ করিয়া, বয়স্যবর্গসমভিব্যাহারে, উপবনবিহারে গমন করিতেছেন, শ্রীহর্ষ তদীয় অশ্বের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, "আমাদিগের চলিবার নিমিত্ত এই পৃথিবী কয়পদ হইবেক ; অতএব সমুদ্রও স্থল হউক ; এই মনে করিয়াই যেন অশ্বগণ, সমুদ্রের জল শুষ্ক করিয়া স্থল করিবার নিমিত্ত, পদ দ্বারা ধূলি উত্থাপিত করিতেছে।" (৫) নৈষধচরিত এইরূপ উৎকট বর্ণনায় পরিপূর্ণ। এরূপ উৎকট বর্ণনা পাঠ করিয়া, কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি প্রীত বা চমৎকৃত হইবেন।

শ্রীহর্ষ অত্যন্ত অনুপ্রাসপ্রিয় ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় অনুপ্রাস সাতিশয় মধুর হইয়া থাকে, কিন্তু অত্যন্ত অধিক হইলে, অত্যন্ত কর্কশ হইয়া উঠে। সুতরাং অনুপ্রাস-বাহুল্য দ্বারা নৈষধচরিতের মাধুর্য্য সম্পাদন না হইয়া, সাতিশয় কার্কশ্যই ঘটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা,

৪ যদস্য যাত্রাসু বলোদ্ধতং রজঃ স্ফুরৎপ্রতাপানলধূমমঞ্জিম।
তদেব গত্বা পতিতং সুধাম্বুধৌ দধাতি পঙ্কীভবদঙ্কতাং বিধৌ॥
প্রথম সর্গ। ৮ শ্লোক।

প্রয়াতুমস্মাকমিয়ং কিয়ৎপদং ধরা তদম্ভোধিরপি স্থলয়াতাম্।
ইতীব বাহৈর্নিজবেগদর্পিতৈঃ পয়োধিরোধক্ষমমুদ্ধতং রজঃ॥
প্রথম সর্গ। ৬৯ শ্লোক।

বিশেষতঃ নৈয়ায়িকমহাশয়েরা, এমন অত্যুক্তিপ্রিয় ও অনুপ্রাসভক্ত যে তাঁহারা সকল কাব্য অপেক্ষা নৈষধচরিতের সমধিক প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে নৈষধচরিত সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য।(৬) যাহা হউক, নৈষধচরিতে মধ্যে মধ্যে অনেক অত্যুৎকৃষ্ট অংশ আছে। অন্য অন্য অংশ পাঠ করিয়া, যেরূপ অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইতে হয়, ঐ সকল অত্যুৎকৃষ্ট অংশ পাঠ করিয়া সেইরূপ প্রীত ও চমৎকৃত হইতে হয়।

এই মহাকাব্য দ্বাবিংশতি সর্গে বিভক্ত, এবং সকল মহাকাব্য অপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে নলরাজার চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

নৈষধচরিতের বিষয়ে এক অতিকৌতুকাবহ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শ্রীহর্ষ, নৈষধচরিত রচনা করিয়া, স্বীয় মাতুল প্রধান আলঙ্কারিক মম্মট ভট্টকে দেখাইতে লইয়া যান। মম্মট ভট্ট, আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, শ্রীহর্ষকে কহিয়াছিলেন, বাপু হে! যদি তুমি কিছু পূর্ব্বে তোমার গ্রন্থখানি আনিতে, তাহা হইলে আমার শ্রমের অনেক লাঘব হইত। বহু পরিশ্রমে অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়া, আমায় অলঙ্কার গ্রন্থের দোষপরিচ্ছেদের উদাহরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। কিন্তু সেই সময় তোমার নৈষধচরিত পাইলে আমায় এত পরিশ্রম করিতে হইত না; এক গ্রন্থ হইতে সমুদয় উদাহরণ উদ্ধৃত করিতে পারিতাম।

ভ ট্টি কা ব্য

ভট্টিকাব্যে রামের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। এই মহাকাব্য দ্বাবিংশতি সর্গে বিভক্ত। গ্রন্থকর্ত্তা স্বরচিত কাব্যের শেষে আপনার একপ্রকার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু নাম নির্দ্দেশ করেন নাই। প্রামাণিক প্রাচীন টীকাকার জয়মঙ্গল কহেন, এই মহাকাব্য ভট্টনামক কবির রচিত। ভট্টিকাব্য নাম দ্বারাও ইহাই সম্যক্ প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু অধুনা-

৬ উদিতে নৈষধে কাব্যে ক্ব মাঘঃ ক্ব চ ভারবিঃ।

তন টীকাকার ভরতমল্লিক, আপন মতের প্রতিপোষক প্রমাণ প্রদর্শন ব্যতিরেকেই, ভট্টিকাব্যকে ভর্ত্তৃহরি প্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরিও এই কাব্যের রচয়িতা, উভয়েই অতি প্রধান বৈয়াকরণ ছিলেন, বোধ হয়, এই সাদৃশ্য দর্শনেই, ভরতমল্লিকের ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। গ্রন্থকর্ত্তা কাব্যের শেষ শ্লোকে (৭) লিখিয়াছেন, আমি, বলভীপতি নরেন্দ্র রাজার রাজধানীতে থাকিয়া, এই কাব্য রচনা করিলাম। যদি ভরতমল্লিক এই শ্লোক দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি ঐ ভ্রমে পতিত হইতেন না। যেরূপ জনশ্রুতি আছে, তদনুসারে ভর্ত্তৃহরি স্বয়ং রাজা ছিলেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং রাজা হন, তিনি, অমুক রাজার রাজধানীতে থাকিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিলাম, আপন গ্রন্থে কদাচ এরূপ নির্দ্দেশ করেন না। ভরতমল্লিক শেষ চারি শ্লোকের টীকা করেন নাই; তাহাতেই বোধ হইতেছে, এই চারি শ্লোক তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই।

ভট্টিকাব্যের রচনা স্থানে স্থানে অতি সুন্দর। বিশেষতঃ, দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে যে হৃদয়গ্রাহিণী শরদ্বর্ণনা আছে, তদ্দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তার অসাধারণ কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ব্যাকরণের উদাহরণপ্রদর্শন গ্রন্থকর্ত্তার যেরূপ উদ্দেশ্য ছিল, কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করা তাদৃশ উদ্দেশ্য ছিল না। এই নিমিত্তই, ভট্টিকাব্যের অধিকাংশ অত্যন্ত নীরস ও অত্যন্ত কর্কশ। যদি তিনি, ব্যাকরণের উদাহরণ প্রদর্শনে ব্যগ্র না হইয়া, কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করিতেন, তাহা হইলে ভট্টিকাব্য উৎকৃষ্ট মহাকাব্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিত, সন্দেহ নাই।

এই যে ছয় মহাকাব্যের বিষয় উল্লিখিত হইল, ইহারাই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও অত্যন্ত প্রচলিত। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশেই এই ছয়ের সচরাচর অনুশীলন আছে।

৭ কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং
শ্রীধরসেননরেন্দ্রপালিতায়াম্।
কীর্ত্তিরতো ভবতান্ন পস্য তস্য
ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপো যত প্রজানাম্॥

'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' ১৮৫৩

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা

প্রথম : শকুন্তলা ও মিরন্দা

উভয়েই ঋষিকন্যা ; প্রস্পেরো ও বিশ্বামিত্র উভয়েই রাজর্ষি। উভয়েই ঋষিকন্যা বলিয়া, অমানুষিক সাহায্যপ্রাপ্ত। মিরন্দা এরিয়লরক্ষিতা, শকুন্তলা অপ্সরোরক্ষিতা।

উভয়েই ঋষি-পালিতা। দুইটিই বনলতা—দুইটিরই সৌন্দর্যে উদ্যানলতা পরাভূতা। শকুন্তলাকে দেখিয়া, রাজাবরোধবাসিনীগণের ম্লানীভূত রূপলাবণ্য দুষ্মন্তের স্মরণ-পথে আসিল ;

> শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য
> দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ॥

ফর্দিনন্দও মিরন্দাকে দেখিয়া সেইরূপ ভাবিলেন,

> Full many a lady
> I have eyed with best regard, and many a time
> The harmony of their tongues hath into bondage
> Brought my too diligent ear : for several virtues
> Have I liked several women ;
> ···but you, O you,
> So perfect and so peerless, are created
> Of every creature's best !

উভয়েই অরণ্যমধ্যে প্রতিপালিতা ; সরলতার যে কিছু মোহমন্ত্র আছে, উভয়েই তাহাতে সিদ্ধ। কিন্তু মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া, সুন্দর, সরল, বিশুদ্ধ রমণীপ্রকৃতি, বিকৃতি প্রাপ্ত হয়—কে আমায় ভালবাসিবে, কে আমায় সুন্দর বলিবে, কেমন করিয়া পুরুষ জয় করিব, এই সকল কামনায়, নানা বিলাস বিভ্রমাদিতে, মেঘবিলুপ্ত চন্দ্রমাবৎ, তাহার

মাধুর্য্য কালিমাপ্রাপ্ত হয়। শকুন্তলা এবং মিরন্দায় এই কালিমা নাই; কেন না, তাঁহারা লোকালয়ে প্রতিপালিতা নহেন। শকুন্তলা বল্কল পরিধান করিয়া ক্ষুদ্র কলসী হস্তে আলবালে জলসিঞ্চন করিয়া, দিনপাত করিয়াছেন—সিঞ্চিত জলকণাবিধৌত নব মল্লিকার মত নিজেও শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক, প্রফুল্ল, দিগন্তসুগন্ধবিকীর্ণকারিণী। তাঁহার ভগিনীস্নেহ, নব মল্লিকার উপর; ভ্রাতৃস্নেহ, সহকারের উপর; পুত্রস্নেহ, মাতৃহীন হরিণশিশুর উপর; পতিগৃহ গমনকালে ইহাদিগের কাছে বিদায় হইতে গিয়া, শকুন্তলা অশ্রুমুখী, কাতরা, বিবশা। শকুন্তলার কথোপকথন তাহাদিগের সঙ্গে; কোন বৃক্ষের সঙ্গে ব্যঙ্গ, কোন বৃক্ষকে আদর, কোন লতার পরিণয় সম্পাদন করিয়া শকুন্তলা সুখী। কিন্তু শকুন্তলা সরলা হইলেও অশিক্ষিতা নহেন। তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন, তাঁহার লজ্জা। লজ্জা তাঁহার চরিত্রে বড় প্রবলা; তিনি কথায় কথায় দুষ্মন্তের সম্মুখে লজ্জাবনতমুখী হইয়া থাকেন—লজ্জার অনুরোধে আপনার হৃদ্গত প্রণয় সখীদের সম্মুখেও সহজে ব্যক্ত করিতে পারেন না। মিরন্দার সেরূপ নহে। মিরন্দা এত সরলা যে, তাহার লজ্জাও নাই। কোথা হইতে লজ্জা হইবে? তাহার জনক ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখন দেখেই নাই। প্রথম ফর্দিনন্দকে দেখিয়া মিরন্দা বুঝিতেই পারিল না যে, কি এ?

Lord, how it looks about! Believe me, sir,
It carries a brave form. But 'tis a spirit.

সমাজপ্রদত্ত যে সকল সংস্কার, শকুন্তলার তাহা সকলই আছে, মিরন্দার তাহা কিছুই নাই। পিতার সম্মুখে ফর্দিনন্দের রূপের প্রশংসায় কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই—অন্যে যেমন কোন চিত্রাদির প্রশংসা করে, এ তেমনি প্রশংসা;

I might call him
A thing divine, for nothing natural
I ever saw so noble.

অথচ স্বভাবদত্ত স্ত্রীচরিত্রের যে পবিত্রতা, যাহা লজ্জার মধ্যে লজ্জা, তাহা মিরন্দায় অভাব নাই, এজন্য শকুন্তলার সরলতা অপেক্ষা মিরন্দার সরলতায় নবীনত্ব এবং মাধুর্য্য অধিক। যখন পিতাকে ফর্দিনন্দের পীড়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া মিরন্দা বলিতেছে,

O dear father,
Make not too rash a trial of him, for
He's gentle and not fearful.

যখন পিতৃমুখে ফর্দিনন্দের রূপের নিন্দা শুনিয়া মিরন্দা বলিল,

My affections.
Are then most humble ; I have no ambition
To see a goodlier man.

তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, মিরন্দা সংস্কারবিহীনা, কিন্তু মিরন্দা পরদুঃখকাতরা, মিরন্দা স্নেহশালিনী ; মিরন্দার লজ্জা নাই। কিন্তু লজ্জার সারভাগ যে পবিত্রতা, তাহা আছে।

যখন রাজপুত্রের সঙ্গে মিরন্দার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাঁহার হৃদয় প্রণয়সংস্পার্শশূন্য ছিল ; কেন না, শৈশবের পর পিতা ও কালিবন ভিন্ন আর কোন পুরুষকে তিনি কখন দেখেন নাই। শকুন্তলাও যখন রাজাকে দেখেন, তখন তিনিও শূন্যহৃদয়, ঋষিগণ ভিন্ন পুরুষ দেখেন নাই। উভয়ই তপোবনমধ্যে—এক স্থানে কণ্বের তপোবন—অপর স্থানে প্রস্পেরোর তপোবন—অনুরূপ নায়ককে দেখিবামাত্র প্রণয়-শালিনী হইলেন। কিন্তু কবিদিগের আশ্চর্য্য কৌশল দেখ ; তাঁহারা পরামর্শ করিয়া শকুন্তলা ও মিরন্দা-চরিত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, অথচ একজনে দুইটি চিত্র প্রণীত করিলে যেরূপ হইত, ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। যদি একজনে দুইটি চরিত্র প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে কবি শকুন্তলার প্রণয়লক্ষণে ও মিরন্দার প্রণয়লক্ষণে কি প্রভেদ রাখিতেন ? তিনি বুঝিতেন যে, শকুন্তলা, সমাজপ্রদত্ত, সংস্কারসম্পন্না, লজ্জাশীলা অতএব তাহার প্রণয় মুখে অব্যক্ত থাকিবে, কেবল লক্ষণেই

ব্যক্ত হইবে ; কিন্তু মিরন্দা সংস্কারশূন্যা, লৌকিক লজ্জা কি, তাহা জানে না, অতএব তাহার প্রণয়লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে। পৃথক্ পৃথক্ কবি-প্রণীত চিত্রদ্বয়ে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। দুষ্মন্তকে দেখিয়াই শকুন্তলা প্রণয়াসক্তা ; কিন্তু দুষ্মন্তের কথা দূরে থাক্, সখীদ্বয় যত দিন তাঁহাকে ক্লিষ্টা দেখিয়া, সকল কথা অনুভবে বুঝিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া কথা বাহির করিয়া না লইল, ততদিন তাহাদের সম্মুখেও শকুন্তলা এই নূতন বিকারের একটি কথাও বলেন নাই, কেবল লক্ষণেই সে ভাব ব্যক্ত—

স্নিগ্ধং বীক্ষিতমন্যতোঽপি নয়নে যৎ প্রেরয়ন্ত্যা তয়া,
যাতং যচ্চ নিতম্বয়োর্গুরুতয়া মন্দং বিলাসাদিব।
মাগা ইত্যুপরুদ্ধয়া যদপি তৎ সাসূয়মুক্তা সখী,
সর্ব্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো ! কামঃ স্বতাং পশ্যতি ॥

শকুন্তলা দুষ্মন্তকে ছাড়িয়া যাইতে গেলে গাছে তাঁহার বল্কল বাঁধিয়া যায়, পদে কুশাঙ্কুর বিঁধে। কিন্তু মিরন্দার সে সকলের প্রয়োজন নাই—মিরন্দা সে সকল জানে না, প্রথম সন্দর্শনকালে মিরন্দা অসঙ্কুচিত চিত্তে পিতৃসমক্ষে আপন প্রণয় ব্যক্ত করিলেন,

This
Is the third man that e'er I saw, the first
That e'er I sigh'd for :

এবং পিতাকে ফর্দিনন্দের পীড়নে উদ্যত দেখিয়া, ফর্দিনন্দকে আপনার প্রিয়জন বলিয়া, পিতার দয়ার উদ্রেকের যত্ন করিলেন। প্রথম অবসরেই ফর্দিনন্দকে আত্মসমর্পণ করিলেন।

দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ, এক প্রকার লুকাচুরি খেলা। "সখি, রাজাকে ধরিয়া রাখিস্ কেন ?"—"তবে, আমি উঠিয়া যাই"—"আমি এই গাছের আড়ালে লুকাই"—শকুন্তলার এ সকল "বাহানা" আছে ; মিরন্দার সে সকল নাই। এ সকল লজ্জাশীলা কুলবালার বিহিত, কিন্তু মিরন্দা লজ্জাশীলা কুলবালা নহে—

মিরন্দা বনের পাখী—প্রভাতারুণোদয়ে গাইয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না; বৃক্ষের ফুল—সন্ধ্যার বাতাস পাইলে মুখ ফুটাইয়া ফুটিয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না। নায়ককে পাইয়াই, মিরন্দার বলিতে লজ্জা করে না যে—

By my modesty,
The jewel in my dower, I would not wish
Any companion in the world but you;
Nor can imagination form a shape,
Besides yourself, to like of.

পুনশ্চ:—

Hence, bashful cunning!
And prompt me, plain and holy innocence!
I am your wife, if you will marry me;
If not, I'll die your maid: to be your fellow
You may deny me; but I'll be your servant,
Whether you will or no.

আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, মিরন্দা ফর্দিনন্দের এই প্রথম প্রণয়ালাপ, সমুদায় উদ্ধৃত করি, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন। সকলেরই ঘরে সেক্ষপীয়র আছে, সকলেই মূল গ্রন্থ খুলিয়া পড়িতে পারিবেন। দেখিবেন, উদ্যানমধ্যে রোমিও জুলিয়েটের যে প্রণয়সম্ভাষণ জগতে বিখ্যাত, এবং পূর্ব্বতন কালেজের ছাত্রমাত্রের কণ্ঠস্থ, ইহা কোন অংশে তদপেক্ষা ন্যূনকল্প নহে। যে ভাবে জুলিয়েট বলিয়াছিলেন যে, "আমার দান সাগরতুল্য অসীম, আমার ভালবাসা সেই সাগরতুল্য গভীর", মিরন্দাও এই স্থলে সেই মহান চিত্তভাবে পরিপ্লুত। ইহার অনুরূপ অবস্থায়, লতামণ্ডপতলে, দুষ্মন্ত শকুন্তলায় যে আলাপ,—যে আলাপে শকুন্তলা চিরবদ্ধ হৃদয়কোরক প্রথম অভিমত সূর্য্যসমীপে ফুটাইয়া হাসিল—সে আলাপে তত গৌরব নাই—মানবচরিত্রের কূলপ্রান্তপর্য্যন্তপ্রঘাতী

সেরূপ টল টল চঞ্চল বীচিমালা তাহার হৃদয়মধ্যে লক্ষিত হয় না। যাহা বলিয়াছি, তাই—কেবল ছি ছি, কেবল যাই যাই, কেবল লুকা-চুরি—একটু একটু চাতুরী আছে—যথা "অদ্ধপধে স্থমরিঅ এদস্স হত্থত্তংসিনো মিণালবলঅস্সকদে পড়িণিবুত্তহ্মি।" ইত্যাদি। একটু অগ্রগামিনীত্ব আছে, যথা দুষ্মন্তের মুখে—"ননু কমলস্য মধুকরঃ সন্তুষ্যতি গন্ধমাত্রেণ।" এই কথা শুনিয়া শকুন্তলার জিজ্ঞাসা, "অসন্তোসে উণ কিং করেদি?"—এই সকল ছাড়া আর বড় কিছুই নাই। ইহা কবির দোষ নহে—বরং কবির গুণ। দুষ্মন্তের চরিত্র-গৌরবে ক্ষুদ্রা শকুন্তলা এখানে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ফর্দিনন্দ বা রোমিও ক্ষুদ্র ব্যক্তি, নায়িকার প্রায় সমবয়স্ক, প্রায় সমযোগ্য অকৃতকীর্ত্তি—অপ্রথিতযশাঃ, কিন্তু সসাগরা পৃথিবীপতি মহেন্দ্রসখ দুষ্মন্তের কাছে শকুন্তলা কে? দুষ্মন্ত মহাবৃক্ষের বৃহচ্ছায়া এখানে শকুন্তলা-কলিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—সে ভাল করিয়া মুখ খুলিয়া ফুটিতে পারিতেছে না। এ প্রণয়সম্ভাষণ নহে—রাজক্রীড়া, পৃথিবীপতি কুঞ্জবনে বসিয়া সাধ করিয়া প্রেম করা-রূপ খেলা খেলিতে বসিয়াছেন; মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শকুন্তলা-নলিনী-কোরককে শুণ্ডে তুলিয়া, বনক্রীড়ার সাধ মিটাইতেছেন, নলিনী তাতে ফুটিবে কি?

যিনি এ কথাগুলি স্মরণ না রাখিবেন, তিনি শকুন্তলা-চরিত্র বুঝিতে পারিবেন না; যে জলনিষেকে মিরন্দা ও জুলিয়েট ফুটিল, সে জল-নিষেকে শকুন্তলা ফুটিল না; প্রণয়াসক্তা শকুন্তলায় বালিকার চাঞ্চল্য, বালিকার ভয়, বালিকার লজ্জা দেখিলাম; কিন্তু রমণীর গাম্ভীর্য্য, রমণীর স্নেহ কই? ইহার কারণ কেহ কেহ বলিবেন, লোকাচারের ভিন্নতা; দেশভেদ। বস্তুতঃ তাহা নহে। দেশী কুলবধূ বলিয়া শকুন্তলা লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়িল,—আর মিরন্দা বা জুলিয়েট বেহায়া বিলাতী মেয়ে বলিয়া মনের গ্রন্থি খুলিয়া দিল, এমত নহে। ক্ষুদ্রাশয় সমা-লোচকেরাই বুঝান না যে, দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয় মাত্র; মনুষ্যহৃদয় সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মনুষ্যহৃদয়ই

থাকে। বরং বলিতে গেলে—তিন জনের মধ্যে শকুন্তলাকেই বেহায়া বলিতে হয়—"অসন্তোসে উণ কিং করেদি?" তাহার প্রমাণ। যে শকুন্তলা, ইহার কয় মাস পরে, পৌরবের সভাতলে দাঁড়াইয়া দুষ্মন্তকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল—"অনার্য্য! আপনার হৃদয়ের অনুমানে সকলকে দেখ?"—সে শকুন্তলা যে, লতামণ্ডপে বালিকাই রহিল, তাহার কারণ, কুলকন্যাসুলভ লজ্জা নহে। তাহার কারণ—দুষ্মন্তের চরিত্রের বিস্তার। যখন শকুন্তলা সভাতলে পরিত্যক্তা, তখন শকুন্তলা পত্নী, রাজমহিষী, মাতৃপদে আরোহণোদ্যতা, সুতরাং তখন শকুন্তলা রমণী: এখানে তপোবনে,—তপস্বিকন্যা, রাজপ্রসাদের অনুচিত অভিলাষিণী,—এখানে শকুন্তলা কে? করিশুণ্ডে পদ্মমাত্র। শকুন্তলার কবি যে টেম্পেস্টের কবি হইতে হীনপ্রভ নহেন, ইহাই দেখাইবার জন্য এস্থলে আয়াস স্বীকার করিলাম।

দ্বিতীয়: শকুন্তলা ও দেস্‌দিমোনা

শকুন্তলার সঙ্গে মিরন্দার তুলনা করা গেল—কিন্তু ইহাও দেখান গিয়াছে যে, শকুন্তলা ঠিক মিরন্দা নহে। কিন্তু মিরন্দার সহিত তুলনা করিলে শকুন্তলা-চরিত্রের এক ভাগ বুঝা যায়। শকুন্তলা-চরিত্রের আর এক ভাগ বুঝিতে বাকি আছে। দেস্‌দিমোনার সঙ্গে তুলনা করিয়া সে ভাগ বুঝাইব, ইচ্ছা আছে।

শকুন্তলা এবং দেস্‌দিমোনা, দুই জনে পরস্পর তুলনীয়া। তুলনীয়া—কেন না, উভয়েই গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। গৌতমী শকুন্তলা সম্বন্ধে দুষ্মন্তকে যাহা বলিয়াছেন, ওথেলোকে লক্ষ্য করিয়া দেস্‌দিমোনা সম্বন্ধে তাহা বলা যাইতে পারে—

• নাবেক্‌খিদো গুরুঅণো ইমিএ ণ তুএবি পুচ্ছিদো বন্ধু।
এক্কক্কস্সঅ চরিএ ভণাদু কিং এক্কএক্কস্মিং॥

তুলনীয়া—কেন না, উভয়েই বীরপুরুষ দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া-

ছেন—উভয়েরই "দুরারোহিণী আশালতা" মহামহীরুহ অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বীরমন্ত্রের যে মোহ, তাহা দেস্‌দিমোনায় যাদৃশ পরিস্ফুট, শকুন্তলায় তাদৃশ নহে। ওথেলো কৃষ্ণকায়, সুতরাং সুপুরুষ বলিয়া ইতালীয় বালার কাছে বিচার্য্য নহে, কিন্তু রূপের মোহ হইতে বীর্য্যের মোহ নারীহৃদয়ের উপর বলবত্তর। যে মহাকবি, পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকে অর্জ্জুনে অধিকতম অনুরক্তা করিয়া, তাঁহার সশরীরে স্বর্গারোহণপথ রোধ করিয়াছিলেন, তিনি এ তত্ত্ব জানিতেন, এবং যিনি দেস্‌দিমোনার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ইহার গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

তুলনীয়া—কেন না, দুই নায়িকারই "দুরারোহিণী আশালতা" পরিশেষে ভগ্না হইয়াছিল—উভয়েই স্বামিকর্ত্তৃক বিসর্জ্জিতা হইয়াছিলেন। সংসার অনাদর, অত্যাচারপরিপূর্ণ। কিন্তু ইহাই অনেক সময়ে ঘটে যে, সংসারে যে আদরের যোগ্য, সেই বিশেষ প্রকারে অনাদর অত্যাচারে প্রপীড়িত হয়। ইহা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত অশুভ নহে; কেন না, মনুষ্যপ্রকৃতিতে যে সকল উচ্চাশয় মনোবৃত্তি আছে, এই সকল অবস্থাতেই তাহা সম্যক্‌ প্রকারে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। ইহা মনুষ্যলোকে সুশিক্ষার বীজ—কাব্যের প্রধান উপকরণ। দেস্‌দিমোনার অদৃষ্টদোষে বা গুণে সে সকল মনোবৃত্তি স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবার অবস্থা তাহার ঘটিয়াছিল, শকুন্তলারও তাহাই ঘটিয়াছিল। অতএব দুই চরিত্র যে পরস্পর তুলনীয় হইবে, ইহার সকল আয়োজন আছে।

এবং দুইজনে তুলনীয়া—কেন না, উভয়েই পরম স্নেহশালিনী—উভয়েই সতী। স্নেহশালিনী এবং সতী ত যে সে। আজকাল রাম, শ্যাম, নিধু, বিধু, যাদু, মাধু যে সকল নাটক উপন্যাস নবন্যাস প্রেতন্যাস লিখিতেছেন, তাহার নায়িকামাত্রেই স্নেহশালিনী সতী। কিন্তু এই সকল সতীদিগের কাছে একটী পোষা বিড়াল আসিলে, তাঁহারা স্বামীকে ভুলিয়া যান, আর পতিচিন্তামগ্না শকুন্তলা দুর্ব্বাসার ভয়ঙ্কর "অয়মহম্ভোঃ" শুনিতে পান নাই! সকলেই সতী, কিন্তু জগৎসংসারে অসতী নাই

বলিয়া, স্ত্রীলোকে অসতী হইতেই পারে না বলিয়া দেস্‌দিমোনার যে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার মর্ম্মের ভিতর কে প্রবেশ করিবে ? যদি স্বামীর প্রতি অবিচলিত ভক্তি—প্রহারে, অত্যাচারে, বিসর্জ্জনে, কলঙ্কেও যে ভক্তি অবিচলিত, তাহাই যদি সতীত্ব হয়, তবে শকুন্তলা অপেক্ষা দেস্‌দিমোনা গরীয়সী। স্বামীকর্তৃক পরিত্যক্তা হইলে শকুন্তলা দলিতফণা সর্পের ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া স্বামীকে ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। যখন রাজা শকুন্তলাকে অশিক্ষা সত্ত্বেও চাতুর্য্যপটু বলিয়া উপহাস করিলেন, তখন শকুন্তলা ক্রোধে, দম্ভে, পূর্ব্বের বিনীত, লজ্জিত, দুঃখিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "অনার্য্য, আপনার হৃদয়ের ভাবে সকলকে দেখ ?" যখন তদুত্তরে রাজা, রাজার মত, বলিলেন, "ভদ্রে ! দুষ্মন্তের চরিত্র সবাই জানে," তখন শকুন্তলা ঘোর ব্যঙ্গে বলিলেন,

তুম্মে জ্জেব পমাণং জাণধ ধম্মত্থিদিঞ্চ লোঅস্স।
লজ্জাবিণিজ্জিদাও জাণন্তি ণ কিম্পি মহিলাও ॥

এ রাগ অভিমান, এ ব্যঙ্গ দেস্‌দিমোনায় নাই। যখন ওথেলো দেস্‌দিমোনাকে সর্ব্বসমক্ষে প্রহার করিয়া দূরীভূত করিলেন, তখন দেস্‌দিমোনা কেবল বলিলেন, "আমি দাঁড়াইয়া আপনাকে আর বিরক্ত করিব না।" বলিয়া যাইতেছিলেন, আবার ডাকিতেই "প্রভু!" বলিয়া নিকটে আসিলেন। যখন ওথেলো অকৃতাপরাধে তাঁহাকে কুলটা বলিয়া অপমানের একশেষ করিয়াছিলেন, তখনও দেস্‌দিমোনা "আমি নিরপরাধিনী, ঈশ্বর জানেন," ঈদৃশ উক্তি ভিন্ন আর কিছুই বলেন নাই। তাহার পরেও পতিস্নেহে বঞ্চিত হইয়া, পৃথিবী শূন্য দেখিয়া, ইয়াগোকে ডাকিয়া বলিয়াছেন,

O good Iago,
What shall I do to win my lord again ?
Good friend, go to him ; for, by this light of heaven,
I know not how I lost him. Here I kneel :

ইত্যাদি। যখন ওথেলো ভীষণ রাক্ষসের ন্যায় নিশীথশয্যাশায়িনী

সুপ্তা সুন্দরীর সম্মুখে "বধ করিব !" বলিয়া দাঁড়াইলেন, তখনও রাগ নাই—অভিমান নাই—অবিনয় বা অস্নেহ নাই—দেস্‌দিমোনা কেবল বলিলেন, "তবে ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন।" যখন দেস্‌দিমোনা, মরণভয়ে নিতান্ত ভীতা হইয়া, একদিনের জন্য, এক রাত্রির জন্য, এক মুহূর্ত্তজন্য জীবন ভিক্ষা চাহিলেন, মূঢ় তাহাও শুনিল না, তখনও রাগ নাই, অভিমান নাই, অবিনয় নাই, অস্নেহ নাই। মৃত্যুকালেও যখন ইমিলিয়া আসিয়া তাঁহাকে মুমূর্ষু দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কার্য্য কে করিল ?" তখনও দেস্‌দিমোনা বলিলেন, "কেহ না, আমি নিজে। চলিলাম। আমার প্রভুকে আমার প্রণাম জানাইও। আমি চলিলাম।" তখনও দেস্‌দিমোনা লোকের কাছে প্রকাশ করিল না যে, আমার স্বামী আমাকে বিনাপরাধে বধ করিয়াছে।

তাই বলিতেছিলাম যে, শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার সঙ্গে তুলনীয়া এবং তুলনীয়াও নহে। তুলনীয়া নহে—কেন না, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তুতে তুলনা হয় না। সেক্ষপীয়রের এই নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য। কাননে সাগরে তুলনা হয় না। যাহা সুন্দর, যাহা সুদৃশ্য, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুরব, যাহা মনোহর, যাহা সুখকর, তাহাই এই নন্দনকাননে অপর্য্যাপ্ত, স্তূপীকৃত, রাশি রাশি, অপরিমেয়। আর যাহা গভীর, দুস্তর, চঞ্চল, ভীমনাদী, তাহাই এই সাগরে। সাগরবৎ সেক্ষপীয়রের এই অনুপম নাটক, হৃদয়োত্থিত বিলোল তরঙ্গ-মালায় সংক্ষুব্ধ, দুরন্ত রাগ দ্বেষ ঈর্ষ্যাদি বাত্যায় সন্তাড়িত; ইহার প্রবল বেগ, দুরন্ত কোলাহল, বিলোল ঊর্ম্মিলীলা,—আবার ইহার মধুর নীলিমা, ইহার অনন্ত আলোকচূর্ণপ্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতিঃ, ইহার ছায়া, ইহার রত্নরাজি, ইহার মৃদু গীত—সাহিত্যসংসারে দুর্লভ।

তাই বলি, দেস্‌দিমোনা শকুন্তলায় তুলনীয় নহে। ভিন্ন জাতীয়ে ভিন্ন জাতীয়ে তুলনীয়া নহে। ভিন্ন জাতীয় কেন বলিতেছি, তাহার কারণ আছে।

ভারতবর্ষে যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকেই নাটক

বলে না। উভয় দেশীয় নাটক দৃশ্যকাব্য বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটকার্থে আর একটু অধিক বুঝেন। তাঁহারা বলেন যে, এমন অনেক কাব্য আছে – যাহা দৃশ্যকাব্যের আকারে প্রণীত, অথচ প্রকৃত নাটক নহে। নাটক নহে বলিয়া যে, এ সকলকে নিকৃষ্ট কাব্য বলা যাইবে, এমত নহে – তন্মধ্যে অনেকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, যথা গেটে-প্রণীত ফষ্ট এবং বাইরণ-প্রণীত মানফ্রেড – কিন্তু উৎকৃষ্ট হউক, নিকৃষ্ট হউক – ঐ সকল কাব্য, নাটক নহে। সেক্ষপীয়রের টেম্পেষ্ট এবং কালিদাসকৃত শকুন্তলা, সেই শ্রেণীর কাব্য, নাটকাকারে অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যান কাব্য ; কিন্তু নাটক নহে। নাটক নহে বলিলে এতদুভয়ের নিন্দা হইল না ; কেন না, এইরূপ উপাখ্যান কাব্য পৃথিবীতে অতি বিরল – অতুল্য বলিলেও হয়। আমরা ভারতবর্ষে উভয়কেই নাটক বলিতে পারি ; কেন না, ভারতীয় আলঙ্কারিকদের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, তাহা সকলই এই দুই কাব্যে আছে। কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, এই দুই নাটকে তাহা নাই। ওথেলো নাটকে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে। ওথেলো নাটক – শকুন্তলা এ হিসাবে উপাখ্যান কাব্য। ইহার ফল এই ঘটিয়াছে যে, দেস্‌দিমোনা-চরিত্র যত পরিস্ফুট হইয়াছে – মিরন্দা বা শকুন্তলা তেমন হয় নাই। দেস্‌দিমোনা সজীব, শকুন্তলা ও মিরন্দা ধ্যানপ্রাপ্য। দেস্‌দিমোনার বাক্যেই তাহার কাতর, বিকৃত কণ্ঠস্বর আমরা শুনিতে পাই, চক্ষের জল ফোঁটা ফোঁটা গণ্ড বহিয়া বক্ষে পড়িতেছে দেখিতে পাই – ভূলগ্নজানু সুন্দরীর স্পন্দিততার লোচনের ঊর্দ্ধ দৃষ্টি আমাদিগের হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করে। শকুন্তলার আলোহিত চক্ষুরাদি আমরা দুষ্মন্তের মুখে না শুনিলে বুঝিতে পারি না – যথা

ন তির্য্যগবলোকিতং, ভবতি চক্ষুরালোহিতং
বচোঽতিপরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে।
হিমার্ত্ত ইব বেপতে সকল এব বিম্বাধরঃ
প্রকামবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদং গতে ॥

শকুন্তলার দুঃখের বিস্তার দেখিতে পাই না, গতি দেখিতে পাই না, বেগ দেখিতে পাই না ; সে সকল দেস্‌দিমোনায় অত্যন্ত পরিস্ফুট। শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র ; দেস্‌দিমেনো ভাস্করের গঠিত সজীবপ্রায় গঠন। দেস্‌দিমোনার হৃদয় আমাদিগের সম্মুখে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং সম্পূর্ণ বিস্তারিত ; শকুন্তলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত।

সুতরাং দেস্‌দিমোনার আলেখ্য অধিকতর প্রোজ্জ্বল বলিয়া দেস্‌দি-মোনার কাছে শকুন্তলা দাঁড়াইতে পারে না। নতুবা ভিতরে দুই এক। শকুন্তলা অর্দ্ধেক মিরন্দা ; অর্দ্ধেক দেস্‌দিমোনা। পরিণীতা শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার অনুরূপিণী, অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্দার অনুরূপিণী।

'বঙ্গদর্শন' ১২৮২ বৈশাখ

প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাল্মীকি সময়ে নিকৃষ্টবর্গ

নিকৃষ্টবর্গ অর্থে মূলজাতি শূদ্র এবং অন্যান্য অন্ত্যজ সঙ্কর জাতিকেও বুঝাইবে ; যেহেতু এই সকল জাতিই শূদ্রের ন্যায় অনুরূপ শাস্ত্রীয় গণনে গণিত এবং শাসনে শাসিত। এই শ্রেণী প্রায় ইহার জন্মকাল হইতেই সময় ও কাল অনুসারে অল্পই হউক আর অধিকই হউক, আর্যজাতির নিকট ঘৃণিত এবং দলিত। আর্য্যেরা প্রায় চিরকালই মনুষ্যত্বের দিকে চক্ষু প্রায় মুদিত করিয়া ইহাদের উপর অত্যাচার করিয়া আসিতেছেন। অতিপ্রাচীন পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ীরা নিরূপণ করেন যে, পাশ্চাত্য ভূমির আদি সভ্যজাতিরা এবং ভারতীয়েরা একবংশোদ্ভব। যদি তাহাই নিশ্চয় হয়, তবে দেখা কর্ত্তব্য যে ইহারা ভিন্নদেশপ্রবাসী হইয়া, মূল মনুষ্যত্বকে কোন্ ভাবে কোন্ দিকে চালনা করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যবাসীরা স্বগণ হইতে ভিন্ন লোক পাইলেই তাহাকে সম্পত্তিস্বরূপ ক্রয় বিক্রয় বা ব্যবহার দ্বারা ক্রীতদাস-ব্যবসায় করিতেন ; সেই সকল ক্রীতদাস পশুবৎ ব্যবহৃত হইত, তাহাদের জীবন মরণ আপন আপন প্রভুর করায়ত্ত ছিল, এবং সমাজ বা রাজদ্বারে তাহাদের কোন প্রকারে বা কিছুমাত্র মুখ ছিল না। অল্পজ্ঞানী অর্দ্ধসভ্যের হস্তে এরূপ অবস্থায় দাসবর্গের কিরূপ দুর্দ্দশা হইত, অনুমান করাও যাইতে পারে এবং ইতিহাসেও সাক্ষ্য দিয়া থাকে। আবার যখন কোন দাসকে কোন অর্দ্ধসভ্য দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দিতেন, তখন সে সমাজের অন্যান্য সকলের সঙ্গে কার্য্যে না হউক, কথায় প্রায় সমকক্ষ বলিয়া পরিচিত হইত, এ পরিচয়প্রদান শেষ মুক্তির কার্য্য এবং কদাচিৎ ঘটিত। মুক্তির আবার ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায় ছিল, কেহ পশুত্ব হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চে উন্নত হইত, কেহ বা তদুচ্চে পরাধীনবৃত্তিভোগীমাত্র হইত, কেহ বা তদুচ্চে কতকগুলি নিয়মের বশবর্তিতায়

স্বাধীনবৃত্তিভোগীও হইতে পারিত, ইত্যাদি। এই শেষোক্ত প্রকারের পর্য্যায় অনুসারেও মুক্তিদান সচরাচর ঘটিত না, দাসদিগের রক্তদর্শনই প্রায় নিত্যক্রিয়া ছিল। এখানে কাজেই মনুষ্যত্বের চিহ্নমাত্রও লক্ষিত হয়.না। এখন ভারতের দিকে দেখা যাউক। ভারত সম্বন্ধে যদিও এই পর্য্যন্ত বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে যে, যে ইয়ুরোপ এখন সভ্যতায় অবনীমধ্যে প্রধান বলিয়া পরিচিত, তাহারই এক বৃহৎ এবং সভ্যতম দেশের অধীশ্বর কয়েক বৎসর হইল স্বীয় রাজ্য হইতে দাস-ব্যবসায় উঠাইয়া দিয়াছেন বলিয়া, উহাই তাঁহার প্রধান সুখ্যাতি-স্বরূপ হইয়াছে, এবং সে সুখ্যাতি ইয়ুরোপের দিগ্দিগন্তে প্রতিধ্বনিত, ও সুখ্যাতির পাত্র যিনি তিনি সে সুখ্যাতিতে আনন্দে গদগদভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ভারতে এমন দিন কখন হয় নাই যে দিন কোন ভারতেশ্বর স্বপ্নেও সে সুখ্যাতির কারণের অস্তিত্ব অবলোকন করিয়াছিলেন, এবং সেরূপ সুখ্যাতির সম্ভবতা-দর্শনে সমর্থ হইয়াছিলেন; তথাপি আমরা কিঞ্চিৎ বলিব। বর্ব্বরই হউক, যবনই হউক, ভারতে কখন কাহাকে দাসবৃত্তি করিতে হয় নাই। সেই প্রাচীনতম সময়েও, যখন আর্য্যসন্তানগণ পাশব-বল-প্রকাশের দ্বারা মার মার কাট কাট শব্দে হিমাদ্রি লঙ্ঘন করিয়া ভারতভূমিতে অবতরণ, রাজ্য-সংস্থাপন এবং শত্রুশির দ্বিধা-করণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, এবং যখন পালে পালে অরণ্যবাসী দাসবর্গ নিপাত হইতেছিল, তখনও যে কোন দাস-সন্তান বাহুবলক্ষয়ে বা স্বেচ্ছায় বশ্যতা স্বীকারে আর্য্যগণের করগত হইত, তাহারাও স্বাধীনভাবে স্বচ্ছন্দমনে সর্ব্বদা বিচরণ করিতে পাইত, এমন কি সমাজের মধ্যে তাহারা নিতান্ত অগণনীয় লোক ছিল না। পাশ্চাত্যভূমিতে দাসদিগের শেষমুক্তি প্রভুর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত, ভারতে (মুক্তি কথা ব্যবহার অনাবশ্যক) নিকৃষ্টবর্গের সামাজিক উন্নত-পদে অধিরোহণ গুণবত্তার উপর নির্ভর করিত। পাশ্চাত্যভূমির মুক্ত ব্যক্তিরা কথায় মাত্র উন্নতদিগের সমকক্ষ বলিয়া পরিচিত, ভারতের নিম্নশ্রেণীস্থ কেহ একবার গুণবত্তা দ্বারা ঊর্দ্ধে উঠিলে, সে সেই ঊর্দ্ধস্থ

জাতির সহ সকল বিষয়ে সমকক্ষ বলিয়া পরিচিত হইত। অসভ্য ও পরাজিতকে কে সহসা সমকক্ষে স্থাপন করিবে, কোন্ মহাপুরুষ এমন আছেন? বস্তুতঃ যিনি তদ্রূপ করেন, তিনি মহাপুরুষ-পদে বাচ্য নহেন। কিন্তু অসভ্যকে আগে নিম্নে রাখিয়া পরে যিনি গুণদর্শনে তাহার উন্নতি করেন, তাঁহারই প্রকৃত মনুষ্যত্বের কাজ। প্রাচীনকালে ভারতে এই মনুষ্যত্বের বহুবিস্তার দেখা যায়, কিন্তু ইহা বৈদিক সময়ে মাত্র, সাধারণ সময় সহ তুলনায় বৈদিক সময় অতি অল্প, এই নিমিত্ত উপরে অনার্য্যগণের প্রতি ঘৃণাবর্ষণ সম্বন্ধে প্রায় চিরকাল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈদিক সময়ের পরেই উচ্চজাতির প্রভুত্বের আধিক্য, এ সময়ে কথিত নীচ সম্প্রদায় উন্নত জাতির অত্যাচারে প্রপীড়িত, কিন্তু তথাপি আর্য্যেরা তাহাদিগকে আপন সীমামধ্যে যদৃচ্ছা বিচরণ করিতে দিতেন, এবং ইহারা সমাজের অঙ্গ ভিন্ন কখন সম্পত্তিস্বরূপ ব্যবহৃত হইত না। ফলতঃ পাশ্চাত্য ভূমির সহ তুলনা করিলে, ভারতে চির-কালই মনুষ্যত্ব বিরাজ করিয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু মনুষ্যত্ব যদি ঐরূপ তুলনাবিহীন করিয়া তৌল করা যায়, এবং সেই তৌলের সহ ভারতের সম্বন্ধ যোগ করা যায়, তাহা হইলে মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইবে যে আর্য্যেরা নিকৃষ্টবর্গের প্রতি প্রায় চিরকালই মনুষ্যত্বের দিকে চক্ষু প্রায় মুদিত করিয়া অত্যাচার করিয়া আসিয়াছেন। যে সমাজের আদিম অবস্থা অতি সরল, অতি পবিত্র এবং পূজনীয়, সে সমাজের কালসহকারে এরূপ আচরণ অতি নিন্দনীয়, আজন্ম মূর্খ ও হীন সমাজের দাস-ব্যবসায় অপেক্ষাও শতগুণে নিন্দনীয় তাহার সন্দেহ নাই।

বাল্মীকির সময়ের সামাজিক অবস্থা পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, নিকৃষ্টবর্গের পক্ষে মনুসংহিতায় যদ্রূপ শাসন বিধানিত হইয়াছে, বাল্মীকির সময়েও তাহারা প্রায় তদ্রূপ শাসনে শাসিত হইত। সুতরাং যে যে ভাবে নিকৃষ্টবর্গ বাল্মীকির সময়ে শাসিত হইত, তাহার বোধার্থে মনুসংহিতার উপর ভারার্পণ করিয়া, তদ্বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনায় এ স্তরে বিরত হইলাম। রামায়ণ এবং মনুসংহিতার

মধ্যে উক্ত বিষয়ের ঐক্য এবং সাদৃশ্য প্রদর্শনার্থে, উভয় গ্রন্থ হইতে বিষয় বিশেষের একটীমাত্র উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। রামায়ণের বালকাণ্ডে একস্থানে কথিত হইয়াছে যে, বশিষ্ট ঋষির পুত্রগণের কোপে পতিত হইয়া ক্ষত্রিয়রাজ ত্রিশঙ্কু চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার নিম্নমত চণ্ডালোচিত বেশ পরিবর্ত্তন হয়,

"নীলবস্ত্রধরোনীলঃ পরুষো ধ্বস্তমূর্ধজঃ।
চিত্যমাল্যাঙ্গরাগশ্চ আয়সাভরণোঽভবৎ॥" ১।৫৮

—নীল কলেবরে নীল বস্ত্র পরিহিত, রুক্ষ এবং খর্ব্বকেশ, শ্মশানমাল্য, চিতাভস্মের অঙ্গরাগ এবং লৌহনির্ম্মিত অলঙ্কার-যুক্ত হইলেন।—মনু-সংহিতার ১০ম অধ্যায়ে,

'চণ্ডালশ্বপচানান্তু বহির্গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়ঃ।
অপপাত্রাশ্চ কর্ত্তব্যা ধনমেষাং শ্বগর্দ্দভং॥ ৫১
বাসাংসি মৃতচেলানি ভিন্নভাণ্ডেষু ভোজনং।
কার্ষ্ণায়সমলঙ্কারঃ পরিব্রজ্যা চ নিত্যশঃ॥" ৫২

—চণ্ডাল এবং তদ্রূপ নিকৃষ্ট জাতি গ্রামের সঙ্গে সংস্রববিহীন হইয়া তাহার বহির্ভাগে বসতি করিবে। অপপাত্র অর্থাৎ যাহা উচ্চজাতির অব্যবহার্য্য (লৌহপাত্র—কুল্লুকভট্ট) এরূপ পাত্র ভোজন এবং জলপাত্র ইত্যাদি রূপে ব্যবহার করিবে। কুক্কুর ও গর্দ্দভ ইহাদিগের ধন। শববস্ত্র ইহাদের পরিধেয় বস্ত্র। ভগ্ন পাত্রে ভোজন এবং লৌহনির্ম্মিত অলঙ্কার ধারণ করিবে । এবং সর্ব্বদা ভ্রমণবৃত্তি অবলম্বন করিবে, অর্থাৎ এক স্থানে নিরূপিতরূপে বাস করিবে না।—

এখানে উভয় গ্রন্থের উদ্ধৃত শ্লোকের মধ্যে প্রতি শব্দার্থের ঐক্য নাই বটে, কিন্তু মূল মর্ম্মের বিশেষ অন্তরতাও নাই। বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণ কাব্য না হইয়া যদি তাৎকলিক ব্যবহারশাস্ত্র হইত, তাহা হইলে, বোধ হয় মনুর সঙ্গে একইরূপ লিখিত হইত। এখানে নিকৃষ্টবর্গের মধ্যে কেবল সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি সামাজিক শাসনের সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইল। উপরে কথিত হইয়াছে যে উচ্চশ্রেণীর শূদ্রেরাও

নিকৃষ্টবর্গ মধ্যে গণিত, এবং অনুরূপ শাসনে শাসিত। কিন্তু এখানে চণ্ডালের অবস্থা বৃত্তিসম্বন্ধে বিধানের দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে, নিকৃষ্ট-বর্গের ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়ে তৎ তৎ বিষয়ের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বিধান। অতএব "অনুরূপ শাসনে শাসিত" এ বাক্য কোন্ অর্থে ফলবৎ হইতে পারে? ইহা বিচার্য্য। শাসন যেরূপ লক্ষিত হয়, তাহাতে দেখা যায় যে উহা ত্রিবিধ, সামাজিক শাসন, রাজশাসন এবং ধর্ম্মাদিতে অধিকার সম্বন্ধে শাসন অথবা উহাকে সহজ কথায় ধর্ম্মশাসন বলিয়া ধরা গেল। সাধারণ সমাজের প্রতি, ভিন্ন ভিন্ন নিম্নতম জাতি কিরূপ ব্যবহার করিবে এবং সমাজমধ্যে কিরূপ পদে পদস্থ থাকিবে, তজ্জন্য বিশেষ বিশেষ বিধি যদ্দ্বারা প্রদত্ত হয়, এবং সেই বিধি অনুসারে কেহ অতি উচ্চ কেহ অতি নীচ ইহাও বিবেচিত হয়, তাহাই সামাজিক শাসন। এখানে "অনুরূপ শাসনে শাসিত" এ কথার সার্থকতা লক্ষিত হয় না। কিন্তু সামাজিক শাসন ক্ষণপরিবর্ত্তনের অধীন। অবশ্য ইহা অনেক সময়ে অনেক বিষয়ে চিরন্তন প্রথার ন্যায় বদ্ধমূল হইয়াও থাকে, কিন্তু ভারত পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত পৃথিবীর পৃথক্ পৃথক্ সমাজ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ক্ষণপরিবর্ত্তনই উহার ধর্ম্ম, বদ্ধমূল কদাচ হইয়া থাকে। ভারতে যদিও ক্ষণপরিবর্ত্তন সচরাচর ঘটে না বটে, কিন্তু সময়সমষ্টি হইতে যদি পরিবর্ত্তনের উদাহরণ অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে উদাহরণও অল্প মিলে না। সে উদাহরণসংগ্রহে আমাদের তত আবশ্য নাই। যে গোয়ালাজাতি অন্যত্রে জলস্পর্শ করিতে পারে না, নদীয়া প্রদেশে তাহারা সৎশূদ্র; যে বেহারাজাতি সর্ব্বত্রেই হেয়, চট্টগ্রামে তাহারা জল-আচরণীয় এবং সৎশূদ্রের ন্যায় সমস্ত কার্য্যে অধিকারযুক্ত। এক হিন্দুসমাজের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এরূপ হওয়ার কারণ যিনি অনুভব করিতে পারিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে সামাজিক শাসন কিরূপ অস্থায়ী, এবং তাহার উপর কোন চিরপ্রচলিত-বিষয়ক মীমাংসার মূল পত্তন হইতে পারে কি না। এক্ষণে রাজশাসন এবং ধর্ম্মশাসন দেখা যাউক। এখানে আপত্তি খাটে না; যত নিকৃষ্ট

জাতিই হউক, একবার হিন্দুসমাজভুক্ত হইলে, সে রাজদ্বারে শূদ্রাদির ন্যায় শাসিত হইবায়, সাম্প্রদায়িক নিকৃষ্টতা অনুসারে কিছুমাত্র ইতর-বিশেষতা প্রাপ্ত হয় না ; এবং ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে একজন অতি অধমতম সম্প্রদায়েরও যতটুকু অধিকার, এক উচ্চ শূদ্রেরও ততদূর অধিকার। আমার সাধ্যমত অনুসন্ধানে বা আমার অনবধানতাবশতই হউক, এতদ্বিপরীতে কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই ; সুতরাং এখানে উচ্চ শূদ্র হইতে নিম্নস্থ সকল সম্প্রদায়কে অনুরূপ শাসনে শাসিত বলিতে হইবে, এবং সেইহেতু তাহাদিগের সকলকেই নিকৃষ্টবর্গ মধ্যে গণনা করায় অন্যায় হয় নাই। মনু ও রামায়ণ হইতে উদ্ধতাংশের যে ঐক্য প্রদর্শিত হইল, উহা সামাজিক শাসন সম্বন্ধে। এখানে উহা এই অর্থের প্রতি-পোষক বুঝিতে হইবে যে মনুর অনুরূপ শাসন বাল্মীকির সময়ে এতদূর প্রবর্ত্তিত হইয়াছে যে, পরিবর্ত্তনশীল সামাজিক শাসনেও তাহা লক্ষিত হয়। অতঃপর বাল্মীকির সময়ের নিকৃষ্টবর্গ হিন্দুজাতিবিচারের কোন পর্য্যায়-ভুক্ত এবং তাহাদিগের প্রতি কৃত ব্যবহারমালা কি কারণে বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছিল, তাহা যথাসম্ভব এস্থলে আলোচনা করা যাইতেছে।

জাতিবিচার সম্বন্ধে আদৌ বোধ হয় যে, মানববংশে পশ্বাচার এবং মার্জ্জিত স্বভাবের সন্ধিসময়ে প্রকৃতি-বিম্বে প্রতিবিম্বিত হইয়া যখন মানবচিত্ত বিকশিত হইতে থাকে, তখন প্রত্যেক চিত্তের ক্রিয়াজনিত যে বৈষম্য উপস্থিত হয়, সেই বৈষম্যই জাতিবিভেদের মূল কারণ। এবং তাহা বন্ধনের নিমিত্ত অভাববিমোচক যে বৃত্তি, তাহা দৃঢ় রজ্জু-স্বরূপ। আমরা যাহাকে প্রকতিস্থ মনুষ্যত্ব বলিয়া থাকি, যথায় যথায় তাহার অবস্থান, তথায় তথায়ই কোন না কোন নিয়মের অধীন হইয়া জাতি-বিভেদ বিরাজ করিতেছে। এখন বলা কর্ত্তব্য যে, জাতিভেদ কাহাকে বলে,—বৃত্তি অনুসারে সম্প্রদায়ভেদই জাতিভেদ। এই জাতিভেদ দেশ-কাল-ভেদে রূপান্তর-পরিগ্রাহী হইতে পারে, কিন্তু মূলানুসন্ধান করিলে উহা সর্ব্বত্র একই পদার্থ এবং একইরূপ কারণ হইতে উদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হইবে। সভ্যতার পথস্পর্শী পেরু এবং

মেক্সিকোর আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যেও এ প্রথা, শাখাপ্রশাখা-বিশিষ্ট মহাবৃক্ষাকারে না হউক, সামান্যভাবে বর্ত্তমান ছিল।

যত জাতিতে জাতিভেদ-প্রথা লক্ষিত হয়, তাহার মধ্যে ভারতীয় জাতিবন্ধন অতি চমৎকার এবং আর সকল দেশ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়। এ চমৎকারিত্ব, এ স্বাতন্ত্র্যের কারণ একমাত্র সম্প্রদায়-পরম্পরায় ছেদ-সম্বন্ধতা। যাহা হউক, এ বিষয়ে পরে কথিত হইতেছে।

বহুজনের এ অনুমান যে, ভারতীয় জাতিপ্রথা বস্তুতই অন্যান্য সকল দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপ পৃথক্ প্রকৃতির, এবং উহা আর্য্যগণের ভারতভূমিতে অবতারণার বহু পরে স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের এরূপ অনুমান কতদূর সমূলক বা কতদূর অমূলক, তাহা আমি বলিতে প্রস্তুত নাহ। প্রমাণাদি দৃষ্টে আমার যাহা বিবেচনাসিদ্ধ, তাই বলিতে প্রস্তুত আছি। প্রথমতঃ, মানব-সমাজের উন্নতি ও অবনতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানবপ্রকৃতিস্থ মানবগণের ভিন্ন ভিন্ন অভাব বিমোচনার্থে ভিন্ন ভিন্ন হস্তের যে নিয়োগ, তাহা সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন হস্তের প্রায় নিজস্ব-বৃত্তি-স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, এবং সাধারণ হইতে পৃথক্ ভাবে জ্ঞাপিত হইবার নিমিত্ত অনুরূপ নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন 'বিশ্' ধাতু হইতে বৈশ্য শব্দের উদ্ভব। এতদ্ব্যতীত, ইহাও একরূপ স্বভাবসিদ্ধ না হউক, প্রায় তদনুরূপ যে, উত্তরপুরুষে পূর্ব্বপুরুষের বৃত্তির অনুসরণ করিয়া থাকে। যেখানে সেরূপ, সেখানে বৈশ্যের ন্যায় নামবিশেষ বংশ বা শ্রেণীর পুরুষ-পরম্পরায় আখ্যাত হওয়ায়, সেই বংশ বা শ্রেণীর সেই নাম ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া আইসে।

দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক দেশ প্রদেশাদির বিবরণ পরিত্যাগ করিয়া, প্রাচীনকালীয় সমাজের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, "ভিন্ন ভিন্ন সমাজে জাতিবিচার অতি পুরাতন কাল হইতে প্রচলিত। মিসর, আসীরিয়া, প্রাচীন পারস্য এবং আসিয়া ভূভাগের প্রায় সর্ব্বত্রই ইহা

ঐতিহাসিক সময় প্রবর্ত্তনার বহুপূর্ব্ব হইতে প্রচলিত। মিসর দেশে ফারাও-বংশের সময় পর্য্যন্ত নির্ণয় করিতে পারা যায় যে, তথায় যতরূপ জাতি ছিল, তাহার মধ্যে পুরোহিত, সৈনিক, কৃষক, বারিবাহক এবং রাখাল প্রধান। পারস্যভূমিতে জাতিবিচার পারসীক ধর্ম্মের আদি প্রবর্ত্তক জরথুস্ত্রেরও বহুপূর্ব্ব হইতে প্রচলিত। তথায় সমাজ চারি জাতিতে বিভক্ত ছিল, পুরোহিত, সৈনিক, কৃষক এবং বণিক।"[১] এই সকল জাতিভেদের সাম্প্রদায়বিশেষের নামের ব্যুৎপত্তি অনুসারে জ্ঞাপিত হইতেছে যে, ব্যবসায় অনুরূপ সেই সকল নামকরণ হইয়াছে। অতঃপর আমাদের ভারতীয় জাতিপ্রভেদে উদ্ভূত সম্প্রদায়বিশেষের নামের ব্যুৎপত্তি ধরিয়া দেখা যাউক যে, সেই সেই নাম কোন অর্থব্যঞ্জক এবং পূর্ব্বোক্ত রূপ বৃত্তি অনুসারে স্থাপিত কি না।

ব্রাহ্মণঃ—ব্রহ্ম বেদং শুদ্ধং পরচৈতন্যং বা বেত্ত্যধীতে বা ব্রহ্মণো জাতাবিতি ব্রহ্মণোমুখজাতত্বাৎ ব্রহ্মণোঽপত্যম। ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণ ইত্যুক্তে পরব্রহ্মজ্ঞে। ব্রহ্ম-অন্ প্রত্যয়। —শব্দস্তোমমহানিধি।
Brahman (ব্রহ্মন্) the Veda &c. and (অন্) affix, and the final syllable of the original word retained.—Wilson.

১ Beeton's *Dictionary of Universal information*, p. 429. তথায় আরও লিখিত আছে যে ইহা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব যে জাতিবিভাগ বংশবিভেদে উৎপন্ন, এবং মূলে উহারা ভিন্ন কুল ছিল। এ কথার আমরা কতদূর প্রতিপোষক, তাহা মূল প্রস্তাবে জ্ঞাপিত হইবে। প্রাচীন জাতি সম্বন্ধে Grote's *History of Greece*, vol II, pp. 474 to 491 দেখিলে অনেক প্রাচীন জাতির বিষয় অবগত হওয়া যায়। ঐ সকল জাতির মধ্যে জাতিবিচার প্রথার সম্প্রদায়-বিশেষের নামের ব্যুৎপত্তি অবলম্বন করিলেই, একমাত্র বৃত্তিই যে তথাবিধ নাম প্রাপ্ত হওয়ার কারণ তাহা প্রতীত হইবে। অনেক বড় বড় ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তে ভারতের জাতিবিচার দৈহিক বর্ণানুসারে হইয়াছে, এ সিদ্ধান্তের অবলম্বন এই যে জাতিশব্দের পরিবর্তে 'বর্ণ' শব্দের কখন কখন ব্যবহার হইয়াছে ; বর্ণশব্দে রঙ বটে, কিন্তু আর কোন অর্থ কি ছাই হইতে পারে না ?

ক্ষত্রঃ — ক্ষতস্ত্রায়তে যঃ সঃ। ক্ষত্রিয়ঃ — ক্ষত্রস্যাপত্যং পুমান। — শ-স্তো-ম।

ক্ষদ্ Sautra root, to divide or eat, unādi affix ত্র। ক্ষত্রিয় — ক্ষত্র and affix ঘ। — Wilson

বৈশ্যঃ — বিশতি উপভুংক্তে, বিশ-ক্বিপ্ স্বার্থে ষ্যঞ। — শ-স্তো-ম।

বিশ্ to enter (Fields &c.) ক্বিপ্ affix and যঞ added. — Wilson.

শূদ্রঃ — শুচ-রক্ পুং চস্য দঃ দীর্ঘশ্চ। — শ-স্তো-ম।

শুচ to purify or cleanse, unādi affix রক্, the vowel made long and চ changed to দ। — Wilson

এ স্থলে উপরে উদ্ধৃত অংশের দ্বারা একরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভারতীয় জাতিবিচারও আদিম সময়ে শ্রেণীবিশেষের বৃত্তি অনুসারে স্থাপিত। সুতরাং পূর্ব্বে উক্ত ভিন্ন-ভিন্ন-দেশীয় জাতিবিচার সহ, ভারতীয় জাতিবিচারের মূলদেশ এক। বাহ্যিক ভাবে যে ভিন্নতর বোধ হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কেবল ভারতীয় জাতিবিচারে সম্প্রদায়পরম্পরায় সম্বন্ধবিচ্ছেদই তাহার কারণ। এ সম্বন্ধবিচ্ছেদ ঘটনার কারণ নানাপ্রকার হইতে পারে, তাহা পরে কথঞ্চিৎ আলোচিত হইবে। অন্যান্য দেশাদি সহ সাধারণ ভাবে তুলনে ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, সমাজের রীতি নীতি দুইরূপ, এক সমাজ-পরিবর্ত্তনে উৎপন্ন হয়, আর এক অতিপ্রাচীনকালে উদ্ভূত হইয়া পুরুষ-পরম্পরা চলিয়া আইসে। যাহা সমাজপরিবর্ত্তনকালে উদ্ভূত হয়, তাহা প্রায় ক্ষণস্থায়ী এবং প্রায় পুনর্ব্বার পরিবর্ত্তনে লোপ হইয়া যায়; কিন্তু যাহা পুরুষপরম্পরা-আগত, তাহা সমাজ ও কালের পরিবর্ত্তন সহ কিছু কিছু রূপান্তর প্রাপ্ত হয় এইমাত্র, কিন্তু একেবারে প্রায় ধ্বংস হয় না। অতি প্রাচীনকালে মানবকুল যখন এক স্থানে সকলে মিলিয়া বাস করিতেন, সম্ভবতঃ সেই সময় জাতিপ্রথার উদ্ভব হয়, তখন যে ইহা সামান্য-আকার-প্রকার-বিশিষ্ট ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। ক্রমে ক্রমে ইহাঁরা যখন ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন, এবং দেশভেদে বাসভেদে নূতন সমাজ সংস্থাপন করিলেন, তখন হইতে

পূর্ব্বোক্তরূপ-কারণানুসারিণী হইয়া, তাঁহাদের প্রাচীনতম সাধারণ প্রথা সকল নূতন রকমের বেশভূষায় ভূষিত হইতে আরম্ভ করিল। এবং প্রত্যেক সমাজ আবার সময়ানুযায়ী রীতি-নীতি-বিষয়ক পরিবর্ত্তন-বশবর্ত্তী হওয়ায়, সেই সকল প্রথা পরস্পরের মধ্যে ক্রমে দূর-সম্বন্ধ হইতে লাগিল। এখন বোধ হয় যে, সেই সকল বহু প্রথার মধ্যে জাতিপ্রথা ভারতে নীত হইয়া সেই নিয়ম-বশ্যতায়, সম্প্রদায়-পরম্পরার মধ্যে ছেদসম্বন্ধরূপ নবভূষায় ভূষিত হইয়াছিল।

জাতিবিচার যেরূপে উদ্ভূত হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বে যেমন বলা গিয়াছে, সেইরূপ, মানব-সমাজে সভ্যতা-সূর্য্যের প্রথমোদয়েই সম্ভব। মস্যুর পিকেটট দ্বারা সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আর্য্যগণ ভারতভূমিতে অবতারণার পূর্ব্বে সভ্যতাপদবীতে পদার্পণ করিতে শিখিয়াছিলেন, সুতরাং তখন এরূপ ব্যবসায় অনুসারে যে ভারতে অবতারণার পূর্ব্বেই আর্য্যেরা সম্প্রদায়-বিভক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে বিচিত্র কি ?

এখন দেখা কর্ত্তব্য যে, সর্ব্বপ্রথমে আর্য্যজাতি কয়রূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন। বন্যভাব পরিত্যাগের পরে জ্ঞানের প্রথমোদয়ে দৈবপ্রভাবের অস্তিত্ব মন অধিকার করে এবং আত্মরক্ষার্থে যে স্বাধীন সাহস তাহার হ্রাস হয়। সুতরাং দেবতার রোষ তোষ নিরীক্ষণ করা, এবং তাহার যথাযথ নিরাকরণ, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন আদি করা, একরূপ বৃত্তি নিরূপিত হওয়ার সম্ভব। তদ্ব্যতীত স্বায়ত্ত পার্থিব অন্যান্য আপদ বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করা আর এক বৃত্তির আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত আহার-সঞ্চয়, কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য বা পশুপালনের নিমিত্ত-রূপ আর এক বৃত্তি আছে। এমন সময়ে বিলাসের আধিক্য কি নাম-মাত্রই নাই, সুতরাং দাসবৃত্তির তত আবশ্যক হয় না। এখানে দেখা উচিত যে, আহার-সঞ্চয়ন, বিপদ হইতে রক্ষা করণ, ও দেবতত্ত্ব জ্ঞাপন, এই তিনের মধ্যে পর পর উচ্চ বৃত্তি কাহার ? এ স্থলে সহজেই প্রতীত হইবে, দেবতত্ত্বজ্ঞের পদ প্রথম, রক্ষক দ্বিতীয়, আহার-সঞ্চায়ক

তৃতীয় পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারে। দেবতত্ত্বজ্ঞ দেবপ্রসন্নতা-বলে রক্ষককে রক্ষা না করিলে, এবং তদ্দ্বারা রক্ষকেরা সুরক্ষিত হইয়া আহার-সঞ্চায়ককে বাহ্যিক বিপদ হইতে রক্ষা না করিলে, আহার-সঞ্চায়ক আহার-সঞ্চয়নে অক্ষম। অতএব যাহাকে যে পরিমাণে বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়, সে নিঃসন্দেহ সেই পরিমাণে হীনতাযুক্ত। দেবতত্ত্বজ্ঞ, রক্ষক ও আহার-সঞ্চায়কের যেরূপ পর্য্যায় এখানে যুক্তি অনুসারে প্রদর্শিত হইল, সর্ব্বদেশীয় প্রাচীন ইতিহাস বিলোড়ন করিলে কার্য্যতঃ তাহাই লক্ষিত হইবে। সে যাহা হউক, আর্য্যেরা পূর্ব্বে যে স্থলে বাস করিতেন, তথাকার বসুমতী তত অনুকূলা ছিলেন না, যে আবশ্যক-অনুযায়ি ধন ব্যতীত, আর কিছু উদ্বৃত্তভাবে দিয়া বিলাসপ্রিয়তার উৎসাহবর্দ্ধক হয়েন। আর্য্যদিগের বিলাসপ্রিয়তা নিঃসন্দেহই রত্নপ্রসবিনী ভারত-ভূমিতে আগমনের পূর্ব্বে উদ্ভূত হয় নাই। এতদ্বিষয়ে আর্য্যজাতির প্রাচীন বাসস্থল বা তৎসান্নিধ্যবাসী শকজাতির ব্যবহারপ্রণালী বিশেষ সাক্ষ্য। এই সকল কারণে অনুমান হয় যে, আদিতে আর্য্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন মাত্র ক্রমনিম্ন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। কারণ, ঐ সময়ে ঐ তিন বৃত্তিই বহুবিস্তারসম্পন্ন হইয়াছিল।

অতঃপর জাতিবিচার-বিষয়ক শাস্ত্রীয় প্রমাণমালা আলোচনা করা যাউক। সমস্ত ঋগ্বেদ অনুসন্ধান করিলে, এক দশমমণ্ডলস্থ পুরুষ-সূক্ত ব্যতীত আর কোথাও জাতিবিচারের উল্লেখ লক্ষিত হয় না। ঐ সূক্তে কথিত আছে যে, পুরুষ দেবগণ কর্ত্তৃক বলি প্রদত্ত হইলে তিনি বিশ্বব্যাপ্ত হইলেন। তৎপরে তাঁহার মুখ কি, বাহু কি, উরু কি এবং পদ কি ?

যৎ পুরুষং ব্যাদধুঃ কথিতাব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরূ পাদা উচ্যেতে ॥

তদুত্তরে কথিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ পুরুষের মুখ, ক্ষত্রিয় বাহু, যাহা তাঁহার উরু তাহা বৈশ্যভাগ এবং পদ হইতে শূদ্র উৎপত্তি হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদভ্যাং শূদ্র অজায়ত ॥

এই স্থলের অর্থ ম্যুর সাহেব এইরূপ করিয়াছেন

The Brahmin was his mouth ; the Rajanya was made his arms ; that which was the Vaisya was his thighs ; the Sudra sprang from his feet.

আশ্চর্য বটে যে, মাধবাচার্য্য বা সায়নাচার্য্য কৃত ভাষ্য পরিত্যাগ করিয়া ম্যুরসাহেবের কৃত অর্থ গ্রহণ করিলাম, ঐ ঐ মহোপাধ্যায়-দিগের স্থানে ম্যুরসাহেবের নৃত্য দর্শন করাইলাম। কিন্তু কি করিব, আমাদের দশাই এই। উক্ত আচার্য্যদ্বয়ের ব্যাখ্যার স্থানদান আমার এ প্রবন্ধের সাধ্যাতীত। কল্লুকভট্ট মনুসংহিতার টীকায় লিখিয়াছেন যে, পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, এবং যথাক্রমে উপরে উক্ত অন্যান্য জাতিত্রয় যথাস্থান হইতে দৈবপ্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং ইহা সর্ব্বসন্দেহের বহির্ভূত, যেহেতু উহা শ্রুতিসিদ্ধ, এই শ্রুতি-সিদ্ধতা প্রদর্শনার্থে বেদোক্ত উক্ত সূক্তের উল্লেখ করিয়াছেন। তা যাহাই হউক, উক্ত বেদোক্ত পদ অনুসারে আমাদের যতদূর বিবেচনা হয়, তাহাতে বোধ হয় যে, শূদ্রের জন্ম সর্ব্বাপেক্ষা পরে এবং অন্যান্য তিন জাতি তাহার পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান ছিল। ভাগবত পুরাণে দ্বিতীয় স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে

পুরুষস্য মুখং ব্রহ্ম ক্ষত্রমেতস্য বাহবঃ।
উর্বোর্বৈশ্যো ভগবতঃ পদভ্যাং শূদ্র অজায়ত॥

ইহা বেদানুরূপ কথিত, এবং যেরূপে বেদোক্ত পদের অর্থ নিষ্পন্ন হয়, ইহা তাহার সম্পূর্ণ প্রতিপোষক। যদি এই সকলের দ্বারা এরূপ অভিপ্রায়ই গ্রহণ করি যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পূর্ব্বে ছিল, এবং শূদ্র পরে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, তবে সেই শূদ্র আগে কাহারা ছিল, কিরূপে সমাজস্থ হইল, এবং কি মূল কারণ অনুসারে তাহারা সমাজে হেয় বলিয়া পরিগণিত হইল, এ প্রশ্ন স্বতই উপস্থিত হয়। সে প্রশ্ন বিবেচিত হওয়ার পূর্ব্বে জাত্যুৎপত্তি সম্বন্ধে অন্যান্য শাস্ত্রীয় তত্ত্ব আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

বায়ুপুরাণে লিখিত আছে যে, আদিতে কোন জাতিভেদ ছিল না, কিংবা কোনরূপ বর্ণসঙ্করও ছিল না। ত্রেতাযুগারম্ভে মনুষ্যগণ ক্লেশযুক্ত হইয়া স্বয়ম্ভূর নিকট উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা তাহাদিগের দুর্দ্দশা-দর্শনে, আহারদানান্তে ক্লেশ দূর করিয়া, ভবিষ্যতে তদ্রূপ যাহাতে না হইতে পারে, তজ্জন্য জাতিবিভাগ করিয়া দিলেন। যাহারা বেদপারগ তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিলেন ; যাহারা বীরকার্য্যে দক্ষ তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় করিলেন ; যাহারা কৃষি ও বাণিজ্যে দক্ষ তাহাদিগকে বৈশ্য ; এবং যাহারা ক্ষীণজীবী ও কেবল দাসকার্য্যে পারগ তাহাদিগকে শূদ্র করিলেন। বিষ্ণুপুরাণ, মনুসংহিতা, মহাভারত এবং রামায়ণে লিখিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে কিছু প্রভেদ আছে, তথায় ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি-স্থান বক্ষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, তাহাতে আমাদের লাভ লোকসান কিছুই নাই। এতদ্ব্যতীত উক্ত গ্রন্থসমূহে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব উক্তবিষয়সম্বন্ধে যাহা আছে, তাহা পরে বিবেচিত হইবে।

বেদের পরবর্ত্তী গ্রন্থে জাতি-উৎপত্তি-সম্বন্ধে, বায়ুপুরাণ ব্যতীত আর প্রায় সমস্ত গ্রন্থেই ব্রহ্মার মুখ, বাহু, ঊরু ও পদ মূলস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং আনুষঙ্গিক নানা ইতিহাসও কল্পিত হইয়াছে। ইতিহাস-মিশ্রিত পৌরাণিক তত্ত্ব ভেদ করা সহজ ব্যাপার নহে। তবে এই বোধ হয় যে, ঋগ্বেদোক্ত সৌদাস রাজার পৌরোহিত্য হেতু বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের মনোবিবাদকে অবলম্বন ভূমি করিয়া, যে সূত্রে পরবর্ত্তী পৌরাণিক গ্রন্থে শাখাপ্রশাখাযুক্ত এক মহদ্ব্যাপারবিশিষ্ট বশিষ্ঠ ও বিশ্বা-মিত্রের কন্দোল বর্ণিত হইয়াছে, সেই সূত্রে এবং সেই নিয়মানুসারেই পুরুষ-সূক্তের উল্লিখিত পদ লইয়া জাত্যুৎপত্তি-বিষয়ক পৌরাণিক তত্ত্বমালা ও ইতিহাসাদি উদ্ভাবিত হইয়াছে।

পূর্ব্ববাক্যের অনুসরণক্রমে শূদ্রগণের জন্মতত্ত্ব বিবেচিত হইতেছে। শূদ্র কাহারা ? আদিতে তাহারা কি ছিল, এই সিদ্ধান্তে কেহ কেহ

ঢেঁকি, কুলা, ধুচনি শব্দ লইয়া প্রমাণ করেন যে উহা আর্য্যভাষা নহে, উহা পাহাড়ী জঙ্গলাজাতির ভাষা; ঐ ভাষা যাহাদের ছিল, তাহারাই কালক্রমে শূদ্র নাম লইয়া হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়াছে, এবং তজ্জন্যই তাহাদের আদি ভাষার ঐ সকল শব্দ হিন্দুভাষায় মিশ্রিত এবং লক্ষিত হয়। কি ভ্রান্তি! এই সামান্য উপকরণে এই মহদ্বিষয় সিদ্ধান্ত করিতে আমি প্রস্তুত নহি। ভাষার আকৃতি এবং প্রকৃতিগত সাদৃশ্য ভিন্ন শব্দগত সাদৃশ্য অগ্রাহ্য। ভাষা নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল, বিশেষতঃ যাহা অলিখিত এবং অসভ্য জাতির ভাষা, তাহা দুই তিন পুরুষে পরিবর্ত্তনবশে নূতনশব্দময়ী হয়, এবং তাহার অনেক প্রাচীন শব্দের লোপ হয়। সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন দেবভাষা সংস্কৃতের যে সকল কথা বৈদিক সময়ে ব্যবহৃত হইয়াছে, পরবর্ত্তী সংস্কৃতে তাহার অনেকের চিহ্নই পাওয়া যায় না। যখন সংস্কৃতেরই এই দশা, তখন অশিক্ষিত অসভ্য ভাষার সহ গুটিকত শব্দের সম্বন্ধমাত্র যোগ করিয়া ওরূপ সিদ্ধান্ত করা অন্যায়। দ্বিতীয়তঃ, জাতিদ্বয়ের সম্মিলন ব্যতীতও, অন্যপ্রকারে উভয়ের ভাষার কোন শব্দ এক হইতে অপরে নীত হওয়ার পক্ষে বিন্দুমাত্র অসম্ভবতা নাই, বস্তুতঃ তাহা আমরা চক্ষের উপরেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। এতদ্ব্যতীত কেহ কেহ সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহেন যে, ইহারাই এক সময়ে শূদ্রদের আদিপুরুষ ছিল। ইহার সারবত্তা স্থাপিত হইতে পারে, যদি এমন কোন প্রমাণ দিতে পারা যায় যে, ইহারা ভারতীয় আদিম অধিবাসীর বংশাবলী। কিন্তু সে প্রমাণ প্রদান সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। অতঃপর আমাদের দ্রষ্টব্য যে শূদ্র কাহারা। যদি ইহারা আর্য্যবংশের এক শাখা হইত, তবে গোত্রস্থ নহে কেন?[২] প্রবর উচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নি-আহ্বান এবং

২ এখানে সঙ্কর বর্ণ জ্ঞাতব্য নহে, তাহাদিগের মিশ্রিত ভিন্ন ভিন্ন আর্য্যগোত্র এবং প্রবর আছে। এখানে মূল শূদ্রজাতিকে জানিতে হইবে, তাহারা আর্য্যগোত্রস্থ নহে।…

পৈতা-ধারণ তিন জাতির পক্ষে বিধানিত হইয়াছে, ইহাদের হয় নাই কেন? আর্য্যগোত্র এবং তাহার প্রবরমালা আর্য্যবংশোদ্ভব বা তৎ-সংস্রবে উৎপন্ন ব্যতীত অন্যের থাকিতে পারে না। ঋগ্বেদের দশম-মণ্ডলস্থ পুরুষ-সূক্ত ব্যতীত, আর সর্ব্বত্রে আর্য্য এবং অনার্য্য, দস্যু বা দাস এই দ্বিবিধ জাতীয় লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্য্যগণ পূর্ব্বা-পর শূদ্রগণকে অনার্য্য বলিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, এই যে দ্বিবিধমাত্র জাতির উল্লেখ পাওয়া গেল, ইহার এক ভাগ অর্থাৎ আর্য্য-নামধারীদিগকে আমরা জানি, কিন্তু দাস বা দস্যু কাহারা? এই দাসবর্গ ঋগ্বেদ অনুসারে (১।১৩০।৮, ৯।৪১।৭৩, ২।২০।৭, ৪।১৬।১০, ৭।৫।৩ ইত্যাদি) কৃষ্ণবর্ণ ছিল। আর্য্যগণ পূর্ব্বাবধি হিমপ্রধান দেশে বাসহেতু পরিচ্ছন্ন বর্ণবিশিষ্ট, ভারতে আগমন মাত্রেই যে তাঁহাদের বর্ণ কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা নহে। আজি পর্য্যন্ত তৈলঙ্গভূমে সাধারণজাতি কৃষ্ণকায়, কদাকার, কিন্তু আর্য্যবংশোদ্ভব ব্রাহ্মণেরা প্রায় সর্ব্বদাই সুশ্রী ও সুপুরুষ। বিশেষতঃ আর্য্যদিগের দ্বারাই বর্ণ-পার্থক্যের উল্লেখ হওয়ায়, তাঁহাদের নিজের বর্ণ যে কৃষ্ণতা হইতে পৃথক্ তাহা জ্ঞাপিত হইতেছে। কৃষ্ণবর্ণ-দাসবর্গ সম্বন্ধে ঋগ্বেদভাষ্যকার মহামহোপাধ্যায় সায়নাচার্য্য বলিয়াছেন

দাসং বর্ণং শূদ্রাদিকং যদ্বা দাসমুপক্ষপয়িতারম অধরং নিকৃষ্টমসুরম্।

কৃষ্ণবর্ণগণের শূদ্র নামের পরিচয় বহু স্থানে পাওয়া যায়, যথা মহা-ভারতে শান্তিপর্ব্বে ১৮৮ অধ্যায়ে অসিতবর্ণগণ শূদ্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। পুনশ্চ ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, ভগবানের মুখ ব্রাহ্মণ, ভুজ ক্ষত্রিয়, উরু বৈশ্য এবং পদ কৃষ্ণবর্ণগণ। অপিচ কৃষ্ণবর্ণ অসুর এবং অনার্য্যসম্ভূতেরা আর্য্যসহ তুলনায় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে

দৈব্যো বৈ বর্ণো ব্রাহ্মণঃ। অসুর্য্যঃ শূদ্রঃ।

বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই সকল কারণে বিবেচনা করি যে, যে অনার্য্য কৃষ্ণবর্ণ দস্যুবর্গের জ্বালায় আর্য্যেরা অতিপ্রাচীন কালে নিরন্তর প্রপীড়িত

হইতেন, এবং যাহাদিগের সহ তাঁহাদের বিবাদ সংঘটন হওয়ায়, তৎসূত্রে পরবর্ত্তী সময়ে শুম্ভনিশুম্ভনাশে জগদ্ধাত্রী, মহিষাসুর-নাশে দশভুজা, রক্তবীজ-নাশে উগ্রচণ্ডা প্রভৃতি দেবী এবং অসুরকুল কল্পিত হইয়াছে, সেই অনার্য্য কৃষ্ণবর্ণ দাসবর্গই শূদ্রবংশের আদি পুরুষ। শূদ্রদিগের পক্ষে অহঙ্কার এবং গৌরবের বিষয় বটে যে, পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক ধর্ম্মের তাহারাই বহুলাংশে মূলীভূত কারণ, এবং আর্য্যদিগের বশ্যতা স্বীকার সত্ত্বেও আর্য্যসমাজকে মহদুত্তেজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। স্বাধীন রক্ত পরাধীন হইলেও, সহসা তাহার কার্য্যকারিতা লোপ পায় না।

'বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত' ১২৮৩

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

মৃচ্ছকটিক

সংস্কৃতে যতগুলি নাটক গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে মৃচ্ছকটিক নাটকখানি সর্বাপেক্ষায় অতি প্রাচীন। এই নাটক সম্রাট বিক্রমাদিত্যেরও পূর্ব্বতন কোন সময়ে প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে এবং ইহার প্রণেতা একজন রাজা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তাঁহার নাম বলা হইয়াছে শূদ্রক। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষের কোন্ ভাগের রাজা ছিলেন, এবং তাঁহার রাজধানী কোথায় ছিল, তাহার কোন নির্ণয় হয় নাই।

মৃচ্ছকটিক এত প্রাচীন বলিয়াই ইহার রচনা এত সরল। ইহার ভাষায় অলঙ্কার-পারিপাট্যের জন্য যত্নের আধিক্য নাই, এবং বর্ণিত বিষয়টি বুঝাইবার দিকে ইহার যত দৃষ্টি, বর্ণন-কৌশলের দিকে দৃষ্টি তত অধিক বোধ হয় না।

কিন্তু ভাষার পারিপাট্যের দিকে দৃষ্টি অধিক বোধ হয় না বলিয়াই যে মৃচ্ছকটিক নাটক রচনা-কৌশল-শূন্য তাহা নহে। একটু নিপুণ হইয়া দেখিলেই, উহাতে গূঢ় রচনাকৌশলের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অথচ সেই রচনাকৌশল এমন অতি সহজ ভাবে আসিয়াছে যে, একবারও কৌশল বলিয়া মনে হয় না।

নাটকীয় নান্দীভাগ লইয়াই দেখ। নান্দীতে দুইটি শ্লোক আছে। তাহার প্রথমটিতে দেবাদিদেব মহাদেবের পর্যঙ্কবন্ধ ভূজগবেষ্টনে দৃঢ়ীকৃত, তাঁহার ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিরোধ, আত্মমাত্র সাক্ষাৎকার, এবং স্থির শূন্যদৃষ্টি বর্ণিত; দ্বিতীয় শ্লোকটিতে সেই নীলকণ্ঠ মহাদেবের ঘোর শ্যামবর্ণ কণ্ঠে বিদ্যুল্লেখার ন্যায় মহাদেবী গৌরীর উজ্জ্বল গৌর ভুজলতার অবস্থান বর্ণিত, প্রথম শ্লোকে মহাদেব শ্মশানবাসী, ধ্যান-নিমগ্ন, সমাধিস্থ; জগৎ-শূন্য, সংসার-শূন্য। দ্বিতীয় শ্লোকে হরগৌরীরূপ একত্রে সম্মিলিত, জগৎ পূর্ণ, সংসার জাজ্জ্বল্যমান। সমুদায় নাটকটিতেই ঐ

দুই কথা। এক কথা, নায়কের দরিদ্রতা, অকিঞ্চনতা, সর্বশূন্যত্ব; দ্বিতীয় কথা, তাঁহার প্রেমিকা প্রেয়সীর লাভ, এবং তৎসহ সমুদায় সাংসারিক সুখ-প্রাপ্তি। অতএব মৃচ্ছকটিক নাটকের নান্দীতেই সমুদায় নাটকটির বীজ নিহিত হইয়া আছে। উৎকৃষ্ট রচয়িতাদিগের লক্ষণই এই যে, তাঁহারা যাহা কিছু লেখেন, তৎসমুদায় পরস্পর দৃঢ়সম্বদ্ধ এবং সকল কথাতেই মুখ্য বিষয়ের অনুকূলতা সাধিত হয়।

নান্দীর পরে প্রস্তাবনা। প্রস্তাবনাটি ও বিলক্ষণ কৌশলপূর্ণ। প্রস্তাবনার আরম্ভে নাটক-রচয়িতার পরিচয়। রচয়িতার পরিচয় প্রদান করিবার রীতি প্রায় সকল নাটকেই প্রচলিত আছে। পরিচয়স্থলে রচয়িতার ভূয়সী প্রশংসা থাকে। এই জন্য কেহ কেহ মনে করেন যে, প্রস্তাবনার ঐ ভাগ নাটক-রচয়িতা স্বয়ং লেখেন না, তাঁহার শিষ্যাদি কেহ লিখিয়া দেন। এরূপ অনুমান যে অমূলক, তাহা ঐ পরিচয়-ভাগের রচনা-প্রণালীর সহিত অপরাপর ভাগের রচনা-প্রণালীর সাদৃশ্য দেখিলেই উপলব্ধ হয়। মৃচ্ছকটিক-এর ঐ পরিচয়-ভাগে বলা হইল রচয়িতার নাম শূদ্রক, তিনি রাজা, এবং দ্বিজমুখ্যতম, ঋগ্বেদ এবং সামবেদে পণ্ডিত, বেদজ্ঞবর্গের শ্রেষ্ঠ, এবং হস্তীর সহিত বাহুযুদ্ধে উন্মুখ: তিনি শত বর্ষ এবং দশ দিন আয়ুষ্কাল ভোগ করিয়া পুত্রকে রাজ্যদানপূর্ব্বক চিতারোহণে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। গ্রন্থরচয়িতার এবম্ভুত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে বড়ই সন্দেহ জন্মে। ইনি নামে হইলেন শূদ্র, কাজে হইলেন সমরব্যসনী ক্ষিতিপাল এবং ব্যবহারে হইলেন তপোধন ব্রাহ্মণ। ইঁহাকে রাজা বলা হইল, অথচ কোথাকার রাজা এবং থাকিতেন কোথায়, তাহা বলা হইল না। এমন স্থলে যদি মনে করা যায় যে, গ্রন্থকারের এই শূদ্রক নামটাই কল্পিত, তাহা করিলে কি নিতান্ত কষ্টকল্পনা করা হয়? আর্য্য গ্রন্থকারেরা বৈদিক সংস্কার বশতঃ আপনাদিগের নামরূপ পরিহারপূর্ব্বক একমাত্র লোকোপকার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাদি রচনা করিতে পারিতেন—নাম বাহির করিতে না পারিলে তাঁহাদের বুক ফাটিত না। তাহা ছাড়া আর একটা কথা

আছে। আমাদিগের কোন গ্রন্থকার সমাজের বর্ণন করিব এরূপ স্পষ্ট প্রতিজ্ঞা করিয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন না। মৃচ্ছকটিক-রচয়িতা তাহা করিয়াছেন।[১] তিনি বলিয়াছেন তাৎকালিক "নয়-প্রচার" "ব্যবহার-দুষ্টতা" "খলস্বভাব" "ভবিতব্যতা" প্রভৃতি সমুদায় বর্ণন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি মৃচ্ছকটিক রচনা করিয়াছেন।[২] সমাজ-বর্ণনে প্রবৃত্ত গ্রন্থকর্ত্তৃগণ প্রায়ই স্ব স্ব নাম গোপন করিয়া থাকেন। অতএব কোন নাটক-রচয়িতা সমাজের বৃহত্তমভাগ যে শূদ্র জাতি তন্নামানুসারে স্বয়ং শূদ্রক নাম পরিগ্রহপূর্ব্বক আপনাকেই ক্ষত্রিয়গুণ- এবং ব্রাহ্মণগুণ-সমন্বিত এবং সমুদায় সমাজের প্রতিরূপস্বরূপ দেশ-সাধারণের রাজা বলিয়া বর্ণনপূর্ব্বক নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, এরূপ মনে করিলেও করা যাইতে পারে। গ্রন্থকার যে নিজ মৃত্যুবিবরণও স্বমুখে খ্যাপন করিতে পারিয়াছেন, তাহার তাৎপর্যও উল্লিখিত কল্পনার অবলম্বনে কিছু বিশদ হইতে পারে। শাস্ত্রে বলে, মনুষ্যের পূর্ণ আয়ুষ্কাল শতবর্ষ; অতএব মনে করা যাইতে পারে যে, এক একটি সমাজ-প্রতিরূপের বয়স একশত বৎসর। আর মৃত্যুর পর দশ দিন যে অশৌচকাল, সে পর্যন্ত মৃত-ব্যক্তির লোকান্তর-গতি নাই—একপ্রকার ইহলোকেই স্থিতি; এই জন্য এক একটি সমাজ-প্রতিরূপের অবস্থিতিকাল শত বর্ষ দশ দিন। সেই একশত দশ দিনের পর দ্বিতীয় সমাজ-প্রতিরূপ পূর্ব্বগত সমাজ-প্রতিরূপের পুত্রস্বরূপে প্রাদুর্ভূত হয়। এইজন্য মৃচ্ছকটিক-রচয়িতা—

রাজানং বীক্ষ্য পুত্রং
লব্ধ্বাচায়ুঃ শতাব্দং দশদিনসহিতং
শূদ্রকোঽগ্নিং প্রবিষ্টঃ॥

১ অবন্তীপুর্য্যাং দ্বিজসার্থবাহো
যুবা দরিদ্র কিল চারুদত্তঃ।
গুণানুরক্তা গণিকা চ যস্য
বসন্তশোভেব বসন্তসেনা।

২ তয়োরিদং সৎসুরতোৎসবাশ্রয়ং
নয়প্রচারং ব্যবহারদুষ্টতাং
খলস্বভাবং ভবিতব্যতাং তথা
চকার সর্বং কিল শূদ্রকোনৃপঃ।

মৃচ্ছকটিক-রচয়িতা নান্দীর দুইটি শ্লোকে অভিনেয় বস্তুর সমস্ত বীজ নিহিত করিয়া এবং প্রস্তাবনার প্রারম্ভে আপনি যে সমাজের প্রতিভূ-স্বরূপ হইয়াই তাহার একটি আদর্শ গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, যেন এইরূপ আভাস প্রদান করিয়া শ্রোতৃবর্গের এবং দ্রষ্টৃবর্গের কৌতূহল উদ্দীপনপূর্ব্বক একটি গীতির সহিত প্রস্তাবনার দ্বিতীয়ার্ধ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। গানটি এই—

শূন্যমপুত্রস্য গৃহং,
চিরশূন্যং নাস্তি যস্য সন্মিত্রং।
মূর্খস্য দিশঃ শূন্যাঃ,
সর্ব্বং শূন্যং দরিদ্রস্য॥

অপুত্রের গৃহ শূন্য, সন্মিত্র-বিহীনের চিরশূন্য, মূর্খের দিক্ শূন্য, দরিদ্রের সকলই শূন্য।

নান্দীতে "শূন্যেক্ষণ" শব্দের প্রয়োগে যে বীজ নিহিত হইয়াছে, উল্লিখিত গানটিতে তাহার অঙ্কুরোদ্গম আরম্ভ হইল। "সর্ব্বং শূন্যং দরিদ্রস্য" এই কথাই নাটকের সকল কথার ধুয়া হইয়া রহিল, এবং নায়কের সর্ব্বশূন্যতা কি প্রকার বিশিষ্টরূপে তাহারও পরিচায়ক হইল। নাটকের নায়ক যে চারুদত্ত, তাঁহার "নিজ রূপগুণের অনুরূপ" রোহসেন নামক পুত্র আছে, তাঁহার "সর্ব্বকাল-মিত্র" মৈত্রেয় নামক একজন সুহৃদও আছেন, এবং তাঁহার গৃহমধ্যে "পুস্তকসকল" থাকায় এবং অন্যান্য প্রকারেও তাঁহার বিদ্যাবত্তা সূচিত হইয়া আছে—তাঁহার নাই কেবল ধন, এবং ধন না থাকায় ঐ সকল থাকিলেও তাঁহার "সকল শূন্য", —"সর্ব্বং শূন্যং দরিদ্রস্য"।

সমাজ-চিত্রণে যে দারিদ্র্যাবস্থার চিত্রণ অত্যাবশ্যক, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ সকল সমাজেই দারিদ্র্যের অতি বিপুলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এবং কোন বস্তুর বৃহত্তম ভাগের অনুরূপ চিত্র না হইলে, সে চিত্র সে বস্তুরই হইতে পারে না।

এই জন্য উচ্চদ্বিজকুলসম্ভূত, অতি ভাগ্যবান ব্যক্তির পুত্র, প্রাসাদ-বাসী, পরমাতিথেয়, জন্মভূমির উন্নতিসাধক, সাধারণের হিতার্থে সু বহু সরোবর, দেবভবন, উদ্যানাদির নির্ম্মাণকর্ত্তা এবং এবম্বিধ দান শৌণ্ডা-নিবন্ধন স্বয়ং বিত্তবিহীন এবং দুর্গত যে চারুদত্ত, তিনিই দারিদ্র্যাবস্থার কাব্যোচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ বলিয়া সমাজচিত্রকরণে কৃতসঙ্কল্প মৃচ্ছকটিক-রচয়িতার নাটকের নায়করূপে উপকল্পিত। এই জন্য বোধ হয়, উক্ত চারুদত্তের মুখ দিয়াই কবি একস্থলে উল্লিখিত ভাবটি এইরূপে ব্যক্ত করাইয়াছেন ; যথা —

স্থখং হি দুঃখান্যনুভূয় শোভতে
ঘনান্ধকারেষ্বিব দীপদর্শনম্।
সুখাত্ত, যো যাতি নরো দরিদ্রতাং।
স জীবদীপান্মরণান্ধমাপ্নুতে॥

দুঃখভোগপূর্ব্বক যে সুখ তাহা গভীর অন্ধকারে দীপদর্শন-স্বরূপ। সেইরূপ সুখের অবস্থা হইতে যে ব্যক্তি দুঃখের অবস্থায় পড়ে, সে জীবনের আলোক হইতে মৃত্যুরূপ অন্ধকারে পতিত হয়।

"সর্ব্বং শূন্যং দরিদ্রস্য" এই গীতিধ্রুব দ্বারা অতি বিস্পষ্টরূপে সূচিত মৃচ্ছকটিক-এর নায়ক চারুদত্ত দারিদ্র্যদশাগ্রস্ত হইয়া কেমন মর্ম্মে মর্ম্মে এবং পদে পদে সেই দশার যন্ত্রণাসকল ভোগ করিতেছিলেন, তাহা সেই নায়কের রঙ্গভূমে প্রবেশ হইতেই প্রদর্শিত হইতে চলিল, এবং নায়ক যে সর্ব্বতোভাবেই আর্য্যভাবসমন্বিত তাহাও প্রথম হইতেই প্রদর্শিত হইল। তিনি সায়ং-সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহদেবতাদিগের উদ্দেশে বলি প্রদান করিতেছেন এইরূপে দৃষ্ট হইলেন, এবং তৎকালে তাঁহার উক্তি হইল —

যাসাং বলিঃ সপদি মদগৃহদেহলীনা
হংসৈশ্চ সারসগণৈশ্চ বিলুপ্তপূর্ব্বং।

তাস্বেব সম্প্রতি বিরূঢ়তৃণাঙ্কুরাসু,
বীজাঞ্জলিঃ পততি কীটমুখাবলীঢ়ঃ ॥

যে গৃহদ্বারের সম্মুখভাগে প্রদত্ত বলি হংস-সারসাদি কর্ত্তৃক সত্বর বিলুপ্ত হইত, এখন সেই গৃহাঙ্গনে জাত তৃণাঙ্কুর মধ্যে পতিত অঞ্জলি প্রমাণ বীজমাত্র বলি কীটগণের মুখভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইতেছে।

(নাট্যারম্ভে) উল্লিখিত কয়টি কবিতাতে আর নায়কের মনে দারিদ্র্যাবস্থায় যে সকল দুঃখ অতি প্রবল হইয়া উঠে, তাহাই বলা হইল। ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তি দরিদ্র হইয়া পড়িলে, আপনি খাবে কি, এই প্রথম চিন্তা, তাহার পর স্ত্রী পুত্র খাবে কি, এই দ্বিতীয় চিন্তা ; তাহার পর আপনাদের ভাল খাওয়া ভাল পরা ভাল থাকার কি হইবে এই চিন্তা — কিন্তু আর্য্য নায়ক চারুদত্তের ওসকল চিন্তা নাই। অতিথি আইসে না, সুহৃজ্জনেরা শিথিলপ্রণয় হয়, লজ্জা নিস্তেজস্বিতা, পরিভব, নির্ব্বেদ, শোক, বুদ্ধিভ্রষ্টতা প্রভৃতি দোষ দারিদ্র্য হইতে জন্মে, এই সকল চিন্তাই তাঁহার মনে অতি বলবতী।

কবি এইরূপ আপন নায়ককে প্রথম হইতে উদাত্ত গুণে বিভূষিত করিয়া তাহার পর তাঁহাকে অতি বিস্পষ্ট আর একটি মুদ্রাঙ্কনে মুদ্রিত করিয়া তাঁহার আর্য্য ভাব দেখাইয়াছেন। তাঁহার বয়স্য মৈত্রেয় বলিলেন, "দেবতাদিগের এরূপ পূজা করিয়াও যখন তোমার প্রতি তাঁহারা প্রসন্ন হয়েন নাই, তখন আর তাঁহাদের পূজার গুণ কি ?" চারুদত্ত এই কথার উত্তরে বলিলেন, —

"তা নয়, গৃহস্থের এই নিত্যবিধি। তপস্যা, মন, বাক্য এবং বলি দ্বারা পূজিত হইয়া দেবতারা শান্তিমান ব্যক্তিদের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। তদ্বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই।"

এই আর্য্য — এই প্রকৃত হিন্দু। পৃথিবীর অপর কোন নরকুলে আর এইরূপ বিশুদ্ধ আচরণ শিক্ষিত হয় নাই। সকলেই ধর্ম্মে রত হয় ধর্ম্মফলাভিসন্ধিতে। হিন্দু বিনা ফলাভিসন্ধিতেই ধর্ম্মাচরণে শিক্ষিত। তিনি বিধি-প্রতিপালনেরই কর্ত্তব্যতা জানেন। বিধি-প্রতিপালন-

নিবন্ধন যে সুখপ্রাপ্তি-রূপ শুভ ফল হইবে, তাহার প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে তিনি ভূয়োভূয়ঃ নিষিদ্ধ হইয়াছেন। চারুদত্তের চরিত্র এইরূপ শাস্ত্রশিক্ষার ফল।

৪

মৃচ্ছকটিক-এর নায়ক চারুদত্ত দরিদ্র-দশায় পতিত এবং আর্য্য শাস্ত্রের শিক্ষা-গুণে সর্ব্বতোভাবে উদারচেতা এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া প্রদর্শিত হইলে রঙ্গভূমিতে নায়িকা বসন্তসেনার অবতরণ আরম্ভ হইল। এই নায়িকার চরিত্রে একটু বিশেষ বৈচিত্র্য আছে। এই বৈচিত্র্যটি সু-স্পষ্টরূপে বুঝিতে হইলে সমাজ-চিত্রই পরিষ্কাররূপে বুঝিবার প্রয়োজন হয়; এবং তাহা হয় বলিয়াই সমাজ-চিত্রাঙ্কনে কৃতসঙ্কল্প মৃচ্ছকটিক-রচয়িতার তাদৃশ নায়িকা লইয়াই নাটক-রচনা।

বসন্তসেনা একটি গণিকা। সে অতুল ধনশালিনী। তাহার বাটী আট মহল। সে বাটীর তোরণ-দ্বার অতি উচ্চ। বাটীর ভিতরে কত পুষ্পোদ্যান, দীর্ঘিকা, কত রত্নবেদী, কত রত্নস্তম্ভ, কত গোরু, হাতী, ঘোড়া, কত লোকজন, কত কত দাস দাসী, কত পড়ুয়া পণ্ডিত, কত গান বাদ্য, কত রঙ্গ রস। তাহার বাটীর বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে শিল্প-নৈপুণ্যের, কলাবিদ্যানুশীলনের, এবং বিভবশালিতার বিলক্ষণ আতিশয্য অনুভূত হয়। বসন্তসেনা যে উজ্জয়িনী নগরে বাস করিতেন, সেই নগরের সর্ব্বপ্রধান শোভা বলিয়াই নাগরিকেরা তাঁহার উল্লেখ করিত। তিনি যেমন ধনবতী তেমনি মাননীয়াও ছিলেন।

ভারতবর্ষীয় সমাজে বর্ণভেদ-প্রথার যেন একটি ছাঁচ জমিয়া গিয়াছে। এখনকার সকল ব্যবসায়ই ঐ ছাঁচে ঢালা হইয়া গঠিত হয়। এখনকার গণিকার ব্যবসায়ও ঐ ছাঁচে ঢালা হইয়া গঠিত হয়। এখনকার গণিকার ব্যবসায়ও একটা জাতি-ব্যবসায়ের মধ্যে গণ্য। কোন কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, কোন গণিকার কন্যা যদি মাতৃব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিত, তবে রাজদ্বারে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইতে

পারিত। মৃচ্ছকটিক-এর নায়িকা বসন্তসেনা ঐ রূপ "কনেলী-মাতা" (অর্থাৎ অনূঢ়াগর্ভজাত) এবং মাতৃব্যবসায়াবলম্বনে একান্ত অনিচ্ছা-বতী। তাদৃশ অনিচ্ছার কারণ—নায়ক চারুদত্তের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ। বসন্তসেনা সেই অনুরাগের বশীভূতা হইয়া সখীজনের সহিত বিশ্রম্ভালাপ-সময়ে ঐ চারুদত্তের কথাই কহে। স্বয়ং একাকিনী বসিয়া চারুদত্তের চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তির প্রতি নিরীক্ষণ করে।

গণিকাজাতীয়া এরূপ অনুরাগসম্পন্না বসন্তসেনা দেখিতে কেমন ছিলেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত স্বতঃ কৌতূহল জন্মে। তিনি যে বিশিষ্ট-রূপেই সৌন্দর্য্যসম্পন্না যুবতী তাহা "বসন্তশোভেব", "দেবতোপস্থান-যোগ্যা" ইত্যাদি বিশেষণ-পদের দ্বারাই প্রকটিত হইয়াছে। তবে একটি কথা এই—ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং খাঁটি শূদ্র অপেক্ষা নানা প্রকার সংমিশ্র বর্ণের লোকই অধিক এবং সেই মিশ্র বর্ণের লোকদিগের মধ্যে শূদ্র বা অনার্য্য সম্বন্ধই অধিক। অতএব সম্ভবতঃ পূর্ব্বকালের গণিকাজাতীয়াদিগের মধ্যে অধিকাংশই অনার্য্য-শোণিত-সম্বন্ধ ছিল। কবি যেন সেই কথাই কতকটা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন বোধ হয়। একজন দাস (সুতরাং শূদ্রজাতীয় ব্যক্তি) বসন্তসেনাকে অত্তিকা (অর্থাৎ দিদি) বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। বসন্তসেনা উচ্চ-জাতীয়া হইলে তাঁহার প্রতি দাসের ঐরূপ সম্বোধন কোন রূপেই সম্ভবপর হয় না। অপর এক স্থলে একজন বসন্তসেনাকে গালি দিয়া "নীনাসা" (নিম্ননাসা) বলিতেছে। "নিম্ননাসা" বিশুদ্ধ আর্য্য স্ত্রী-পুরুষের লক্ষণ নয়—যেখানে নিম্ননাসা দেখা যায়—সেই স্থলেই অনার্য্য শোণিতের মিশ্রণ বুঝিতে হয়। অপর এক স্থলে বসন্তসেনাকে গাঢ়ান্ধ-কারে হারাইয়া বলা হইতেছে মসীরাশি মধ্যে যেন "অঞ্জিগুড়িয়া" (অঞ্জন-গুটিকা) হারাইয়া গেল। এই কথায়, বসন্তসেনার বর্ণটা গৌর না হইয়া কিছু কাল বলিয়াই বোধ হয়। কৃষ্ণবর্ণতা অনার্য্য সংস্রবের স্পষ্ট লক্ষণ! অতএব মনে করা যাইতে পারে যে, বসন্তসেনা "বিশাললোচনা", শ্যামাঙ্গী সুন্দরী।

বসন্তসেনা যে সমস্ত কলাবিদ্যায় বিদ্যাবতী, তাহা বলিবার অপেক্ষা কি ? তাঁহার স্বর-বৈচিত্রীকরণ ক্ষমতা, পদবিন্যাসাদির লঘুতা, সর্ব্ব-কার্য্যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিশিষ্টরূপেই প্রদর্শিত হইয়া, তাঁহার বাটী যে সমস্ত কলাবিদ্যার আগারস্বরূপ, তাহা স্পষ্টরূপেই কথিত হইয়াছে।

বসন্তসেনা অন্যান্য সংস্কৃত নাটকাদির অত্যুৎকৃষ্ট নায়িকাদিগের ন্যায় সংস্কৃত ভাষাও জানিতেন। তবে তাঁহার সংস্কৃতজ্ঞতা কিরূপ ছিল, তাহা কবি একটু বিশেষ কৌশল অবলম্বন-পূর্ব্বক বড় পরিষ্কাররূপেই দেখাইয়া দিয়াছেন। বসন্তসেনা কদাপি উচ্চশ্রেণীর পাত্রদিগের নিকট সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিতে যান না। তিনি কলাবিদ্যার শিক্ষাদাতা বিটের সহিত সংস্কৃতে বাক্যালাপ করেন, আর বিদূষককে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতে হয় তাহা সংস্কৃতে বলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার স্বগত উক্তিগুলিও প্রাকৃত ভাষায় হয়, সংস্কৃতে হয় না। কবি এইরূপে দেখাইলেন যে, স্ত্রীলোককে বিদ্যা ফলাইতে দেখিলে ভদ্র-লোকের যে অশ্রদ্ধা হয় বসন্তসেনা তাহা বুঝিতেন, এবং বসন্তসেনার সংস্কৃতজ্ঞতা এমন পাকা রকমেরও ছিল না যে স্বয়ং সংস্কৃতে চিন্তা করিতে পারেন।

৫

মৃচ্ছকটিক-এর নায়ক চারুদত্ত, উহার নায়িকা বসন্তসেনা। নাট-কোল্লিখিত অপরাপর পাত্রদিগের মধ্যে সমূহ দোষ গুণে জড়িত অপর একটি বিশিষ্ট ব্যক্তির বর্ণন আছে। তাঁহার নাম শর্বিলক। অন্যান্য নাটকাদিতে যে সকল কাজ দৈবশক্তি বা সম্যক্ অতি-মানুষশক্তি দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়, মৃচ্ছকটিক নাটকে এই শর্বিলকের দ্বারাই সেই সকল কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছে। ইনিই রাজার কারাগৃহ হইতে ভাবী ভূ-পতিকে মুক্ত করিয়া দেন, ইনিই রাজবিদ্রোহের অধিনেতা এবং ইনিই পরিশেষে রাষ্ট্রবিপ্লব সম্পাদন করিয়া দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন সুসিদ্ধ করেন। নাটকের নায়ক যে চারুদত্ত তিনি যথার্থ হিন্দুর আদর্শ

স্বরূপ। এরূপ লোককে আদর্শ জ্ঞান করিবার মানুষই এদেশে অধিক। ঐরূপ লোকের গঠন করাই আর্য্য শাস্ত্রের এবং আর্য্য শিক্ষার উদ্দেশ্য। চারুদত্তই আমাদিগের অলঙ্কারশাস্ত্র মতে ধীরোদাত্ত অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট নায়ক। নাটককারও পদে পদে দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার চারুদত্ত নিজ ঔদার্য্য "গুণশাস্ত্রের" বলেই শাস্ত্রধারীদিগের অপেক্ষাও বলীয়ান্, তিনি জনগণের চক্ষে 'ভূদল-মিঅংকা (ভূতল-মৃগাঙ্ক)' তিনি নির্ধন হইলেও 'ভৃত্যানুকম্পক' বলিয়া ভৃত্যদিগের প্রিয় এবং তিনি স্বভাবতঃ এমনি সুশীতল যে, অপকারী ব্যক্তিরও অপকারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না, 'ন চন্দ্রাদো আদবো হোদি' (ন চন্দ্রাদাতপো ভবতি)।

কিন্তু শর্বিলক ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। তিনিও ব্রাহ্মণ কুলপতির সন্তান, তিনিও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, তিনিও দরিদ্র এবং তিনিও একটি যুবতীর প্রণয়-পাশে একান্ত সম্বদ্ধ। ঐ যুবতী বসন্তসেনারই একটি দাসী, তাহার নাম মদনিকা। সেই মদনিকার নিষ্ক্রয় সাধনপূর্ব্বক "অভুজিষা" বা অনন্যভোগ্যা করিবার জন্য দরিদ্র শর্বিলকের অর্থ সংগ্রহ করিবার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

সিংহবিক্রমশরীর, প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধি, পরাধীন-বৃত্তি-পরাঙ্মুখ, স্বাভাবিক প্রখরা ইচ্ছাবৃত্তি কর্ত্তৃক প্রণোদিত, শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বাবলম্বিত, চৌর্য্য-ব্যবসায়ের উৎকর্ষ খ্যাপনপূর্ব্বক সকল বাধা অতিক্রম করিয়া শর্বিলক সাহস-কার্য্যে রত হইয়াছেন। মৃচ্ছকটিক-প্রণেতা চারুদত্ত এবং শর্বিলক উভয়কে গঠন করিয়া নিজ গ্রন্থে চারুদত্তেরই প্রধান স্থান কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। শর্বিলকের স্থান উচ্চ নয়। শর্বিলক যে সাহসের কর্ম্ম করেন তাহা বলিয়াই গ্রন্থকার নিবৃত্ত হয়েন নাই। শর্বিলক যে কোন প্রকার ধর্ম্মকথাই মানেন না, যাহা কিছু তাঁহার ইচ্ছার গতিরোধ করে, তাহাই উল্লঙ্ঘন করিতে প্রস্তুত, নাটককার তাহাও পদে পদে দেখাইয়া দিয়াছেন। শর্বিলক চৌর্য্য-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সন্ধিখনন করিতে করিতে পরিমাণ-সূত্র ভুলিয়া আসিয়াছেন মনে হওয়াতে বলিলেন—

"কি দুঃখ ! পরিমাণ-সূত্র ভুলিয়া আসিয়াছি।" চিন্তা করিয়া—"হাঁ এই যজ্ঞোপবীতই প্রমাণ-সূত্র হউক ; পৈতাটা ব্রাহ্মণদিগের, বিশেষতঃ আমার সদৃশ ব্রাহ্মণদিগের, বড়ই উপকরণ দ্রব্য।"

অতএব পৈতা দিয়াই শর্বিলক সিঁদ মোয়ান মাপিয়া লইলেন।

৬

মৃচ্ছকটিক-এর মুখ্যপাত্র চারুদত্ত হিন্দু আর্য্য। তাঁহার ইচ্ছাবৃত্তি শাস্ত্রশাসনের অধীনা। মৃচ্ছকটিক-এর গৌণপাত্র শর্বিলক ইউরোপীয় ছাঁচের লোক। তিনি সক্ষম, পণ্ডিত এবং তীক্ষ্ণধী। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাবৃত্তি অতীব বলবতী, ধর্ম্মশাসনের ততটা বশীভূতা নহে। এক কথায় চারুদত্ত সাত্ত্বিক, শর্বিলক রাজসিক পুরুষ। আজি কালি ইউরোপীয় শিক্ষা, ইউরোপীয় ভক্তি এবং ইউরোপীয় অনুকরণের দিন পড়িয়াছে। অতএব বোধ হয়, ইংরাজীতে কৃতবিদ্য এতদ্দেশীয় নব্যেরাও যদি মৃচ্ছকটিক পাঠ করেন, তবে তাঁহাদিগেরও মনে চারুদত্ত অপেক্ষা শর্বিলককেই ভাল লাগিবে। ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে এতদ্দেশীয় জনগণের হৃদয়ে যে চিত্তাদর্শের প্রভেদ জন্মিয়া যাইতেছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই কথার উল্লেখ করা গেল। এই কথাটা স্মরণ করিয়া রাখিলেই এখনকার নাটক-নাটিকা, আখ্যায়িকাদি গ্রন্থে যে কি জন্য সত্ত্বগুণ-প্রধান পাত্রদিগের অপেক্ষা রজোগুণপ্রধান পাত্রদিগের অধিকতর গৌরব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহারও কারণ উপলব্ধ হইবে। কিন্তু এই যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহার প্রকৃতি কি ? আমাদিগের পূর্ব্বাচার্য্যেরা যে সকল গুণ এবং চরিত্রকে অপেক্ষাকৃত দুষ্ট এবং হেয় জ্ঞান করিতেন, এক্ষণে তাহাই ভাল এবং আদরণীয় হইয়া উঠিতেছে বই ত নয়। ইউরোপীয় শাস্ত্রে শিক্ষিতেরা যদি মনে করেন যে, তাঁহারা ঐ শিক্ষার প্রভাবে শৌর্য্যগুণের পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছেন, এইজন্য বলা আবশ্যক যে, শৌর্য্যগুণের মধ্যেও বিলক্ষণ ভেদ আছে। যে শৌর্য্যের মূলে যশোলিপ্সা, উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, অথবা আত্মগৌরব

থাকে, সে শৌর্য্য এক প্রকারের, আর যাহার মূলে বিশুদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞান, সে শৌর্য্য আর এক প্রকার। এই মৃচ্ছকটিক-এই ঐ দুই প্রকার শৌর্য্যের উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। শর্বিলকের শৌর্য্য প্রথম প্রকারের—উহা আত্মগৌরবমূলক এবং রজোগুণসম্ভূত। নাটকের যে অংশে শর্বিলককে অতি প্রোজ্জ্বলরূপে দেখা যায়, সেই স্থানটি লইয়া বিচার করা যাইতেছে। শর্বিলক মদনিকার নিষ্ক্রয় হেতু উহার চৌর্য্যলব্ধ অলঙ্কার-মঞ্জুষা লইয়া বসন্তসেনার বাটীতে আসিয়াছেন, এবং মদনিকাকে নিভৃতে বলিতেছেন, "আমি দারিদ্র্যাভিভূত এবং তোমার প্রতি স্নেহপ্রযুক্ত, তোমার জন্যই অদ্য রাত্রিতে সাহসের কর্ম্ম করিয়াছি।"

মদনিকা—শর্বিলক, তুমি একটা স্ত্রীস্বরূপ সামান্য বস্তুর নিমিত্ত দুইটিকে সংশয়ে নিক্ষিপ্ত করিয়াছ।

শর্বিলক—কি কি ?

মদনিকা—শরীর এবং চরিত্র।

শর্বি—অপণ্ডিতে! সাহসে লক্ষ্মীর বাস।

মদ—শর্বিলক! তোমার চরিত্র অখণ্ডিত আছে—আমার জন্য সাহস কর্ম্ম করায় অতি বিরুদ্ধ আচরণ করা হয় নাই ?

শর্বি—পুষ্পবতী লতার ন্যায় বিভূষিতা কোন অবলার ধন চুরি করি নাই। যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত বিপ্রসঞ্চিত সুবর্ণ হরণ করি নাই—ধনার্থী হইয়া ধাত্রীক্রোড়স্থিত বালককে অপহরণ করিয়া লই নাই—চৌর্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও আমার বুদ্ধি কার্য্যাকার্য্য-বিচার-বিষয়ে সুস্থিরাই থাকে।

শর্বিলকের আরও শূর-লক্ষণ আছে। কর্ত্তব্যাবধারণে তাঁহার বিলম্ব হয় না। যেমন শুনিলেন যে, তাঁহার প্রিয়মিত্র "আর্য্যক" রাজা "পালক" কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইয়াছেন, অমনি সদ্যঃপ্রাপ্তা "মদনিকা"কে ছাড়িয়া প্রিয়বন্ধুর উদ্ধারার্থ গমন করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি বলিলেন—

"অসাধু রিপুবর্গ মনে মনে ভীত হইয়া বিনা দোষে প্রিয় সুহৃদকে বন্দী করিয়াছে। আমি সত্বরেই যাইয়া যেমন রাহুগ্রাস হইতে শশাঙ্ক মুক্ত হয়েন সেইরূপে তাহাকে মুক্ত করি।"

শর্বিলক যাহা বলিলেন তাহাই করিলেন।

শর্বিলক বলিতেছেন—"আমি সেই দুষ্ট নরপতি পালককে বধ করিয়া এবং তাহার রাজ্যে আর্য্যকে অভিষেক করিয়া তাঁহার শেষ আজ্ঞা শিরোধারণপূর্ব্বক বিপন্ন চারুদত্তকে মুক্ত করিব।"

কিন্তু বিপন্ন চারুদত্তকে মুক্ত করিবার জন্যও তাঁহার সমীপস্থ হইতে শর্বিলকের মনে ভয় হইতেছে। তিনি বলিলেন—

ইঁহার বাটীতে চুরি করিয়া আমি মহাপাতক করিয়াছি। কেমন করিয়া নিকটে যাইব। অথবা সর্ব্বত্র সরলতা শোভনীয়।

৭

মৃচ্ছকটিক-রচয়িতা তাঁহার নাটকের গৌণপাত্র শর্বিলকের বীর্য্য-শালিতা, ক্ষিপ্রকারিতা, সহৃদয়তা প্রভৃতি অত্যচ্চ গুণাবলী প্রদর্শন করতঃ তিনি রাজস প্রকৃতিক, অতএব নিজ ইচ্ছাবৃত্তির একান্ত অধীন, এবং পরিশেষে সত্ত্বগুণপ্রধান চারুদত্তের সমীপে লজ্জান্বিত—ইহা দেখাইয়া সত্ত্বগুণেরই যে সম্যক্ প্রাধান্য, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু শুদ্ধ তাহাই নহে। মৃচ্ছকটিক-এর রচয়িতা যে সাত্ত্বিক শৌর্য্য-গুণেরই বিশেষ পক্ষপাতী, তাহাও চারুদত্তের চরিত্র-সংগঠন-প্রণালীতে দেখাইয়াছেন। চারুদত্তও বীরপুরুষ। তবে তাঁহার বীরতা বলবিক্রম প্রকাশে অথবা সুহৃদের কারামোচনে কিংবা রাষ্ট্রবিপ্লব সংগঠনে পর্য্যবসিত হয় না। তাঁহার শৌর্য্য কিরূপ, আর্য্য হিন্দুর শৌর্য্য কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত নাটক হইতে কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

(১) বড় একটা বিপদের সময় কোন বন্ধু তাঁহাকে মিথ্যা কথা বলিবার অনুরোধ করিলে তিনি ঘৃণাপূর্ব্বক বলিলেন—"কি! আজি আমি মিছা কথা বলিব। বরং ভিক্ষা করিয়া ন্যস্ত ধন প্রত্যর্পণের উপায় করিব, তথাপি চরিত্রদূষণ অনৃত বাক্য বলিব না।"

(২) রাজ-দৌরাত্ম্যে প্রপীড়িত, অপরিচিতপূর্ব্ব আর্য্যক, তাঁহার

গাড়ি চড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে আপনার পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক বলিল, — "আমি গোপাল-জাতীয় আর্য্যক, আপনার শরণাগত।"

চারুদত্ত — "বিধাতা কর্ত্তৃকই তুমি উপনীত হইয়া আমার দৃষ্টি-গোচর হইলে, আমি বরং প্রাণত্যাগ করিব, তথাপি শরণাগত তোমাকে ত্যাগ করিব না।"

(৩) এই ব্যাপারের পর হইতে রাজার শ্যালক যে চিরশত্রুতার ভয় দেখাইয়াছিল, সেই শত্রুতার কার্য্যারম্ভ হইল। সে স্বয়ং বসন্তসেনা কর্ত্তৃক ঘৃণিত এবং পদাহত হইয়া তাহার গলা টিপিয়া মৃতপ্রায় করিয়া রাখিয়া গেল ; এবং সে মরিয়াছে মনে করিয়া চারুদত্তই অলঙ্কারের লোভে বসন্তসেনাকে মারিয়াছেন এই কথা ব্যক্ত করিল। আদালতে চারুদত্তের বিচার হইল। আনুষঙ্গিক প্রমাণের বলে তিনি দোষী সাব্যস্ত হইলেন। রাজা তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

চারুদত্ত বলিতেছেন — "হায়! রাজা পালকের কি অপরিণাম-দর্শিতা। অথবা দুষ্টমন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ ব্যবহারাগ্নিতে পাচিত হইয়া রাজারা বড়ই দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া থাকেন।"

(৪) তাহার পর রাজদণ্ডের বিবরণ ঘোষণা করিতে করিতে যখন বধ্যভূমিতে লইয়া যায় তখন একজন তাঁহাকে নির্দ্দোষী বলিতেছেন, ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন — "আপনারা শুনিলেন, আমি মরিতে ভীত নই, আমার যশ দূষিত হইয়াছিল এই দুঃখ। যদি যশ বিশোধিত হইল, তবে এই মৃত্যুও পুত্রজন্মের সমান আনন্দকর হইল।"

(৫) সেই প্রিয়া বসন্তসেনাকে স্মরণ করিয়া চারুদত্ত পুনর্ব্বার বলিতেছেন — "আমি প্রবল পুরুষদিগের বাক্যে এবং নিজ ভাগ্যদোষে যদিও আজি দূষিত হইলাম, তথাপি যদি আবার ধর্ম্মের প্রভাব হয়, তবে সুরপতি-ভবন হইতেই হউক, আর যে কোন স্থানে থাকুক সেই স্থান হইতেই হউক, সে নিজ স্বভাবগুণেই আমার এই কলঙ্কের অপ-নোদন করিবে।"

(৬) ইহার পর শর্বিলক এবং তাহার সহকারিবর্গ যে রাষ্ট্রবিপ্লব

ঘটাইয়াছিল, তাহার প্রভাবে চারুদত্তের নিষ্কৃতি হইল, এবং তাঁহার মাহাত্ম্য বাড়িল। মৃত রাজার শ্যালক বন্দীকৃত হইয়া চারদত্তের সমক্ষে আনীত হইল। সেই সময়ে ঐ রাজ-শ্যালকের সম্বন্ধে চারুদত্তের সহিত শর্বিলকের যে কথোপকথন হয়, তাহা শ্রবণ-যোগ্য।

শর্বি—আর্য্য চারুদত্ত! আজ্ঞা করুন, এই পাপের সম্বন্ধে কি করা যাইবে?

চারু—কি, আমি যাহা বলিব তাহাই করিবে?

শর্বি—তাহাতে সন্দেহ কি?

চারু—সত্য?

শর্বি—সত্য।

চারু—যদি তাহাই হয় তবে ইহাকে—

শর্বি—কি মারিয়া ফেলিব?

চারু—না, না, ছাড়িয়া দাও।

শর্বি—কি জন্য?

চারু—যে শত্রু অপরাধ করিয়া শরণাগত হইয়া পায়ে পড়ে, তাহাকে অস্ত্রের দ্বারা হত্যা করিতে নাই।

শর্বি—তবে তাহাকে কুকুর দিয়া খাওয়াইতে হয়?

চারু—না, তাহাকে উপকার-হত (অর্থাৎ উপকার দ্বারা তাহার শত্রুতা হত) করিতে হয়।

শর্বি—অহো আশ্চর্য্য! আর্য্য আমাকে বলুন কি করিব?

চারু—ছেড়ে দাও।

আর্য্য হিন্দুর বীরতা এইরূপ। ধৃষ্টতার উপেক্ষা, অপকর্ম্মে ঘৃণা, সত্যে নিষ্ঠা, শরণাগতের প্রতিপালন, নির্ভীকতা, যশোরক্ষায় যত্ন, ধর্ম্ম-প্রভাবে বিশ্বাস, এবং পরম অপরাধীর প্রতি ক্ষমা, এই সাত্ত্বিক বীরতা। এই বীরতার প্রকৃতি আর কোন জাতি এমত সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে সমর্থ হয় নাই।

৮

মৃচ্ছকটিক নাটকে যে সকল পাত্রের উল্লেখ আছে, তাহাদিগের মধ্যে প্রধান দুইজনের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া সাত্ত্বিক এবং রাজস, হিন্দু আর্য্য এবং ইউরোপীয় আর্য্য, এতদুভয়ের মধ্যে যে চিন্তাদর্শ সম্বন্ধীয় মৌলিক ভেদ জন্মিয়া গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। ইউ-রোপীয় পুরুষ সাহস, নির্ভীকতা, এবং স্বৈরাচারকে বীরস্বভাবের প্রধান উপকরণ মনে করেন। তাঁহার মতে যুদ্ধবীরই বীর। সংস্কৃত গ্রন্থকার সাহস এবং নির্ভীকতার গৌরব করিয়াও উহাদিগকে বীরভাবের অতি গৌণ উপাদানই মনে করেন। তাঁহার চক্ষে বীর দেখিতে হইলে দানবীর, সত্যবীর, দয়াবীর, ক্ষমাবীর, ধৈর্য্যবীর, প্রভৃতি প্রথমে উদিত হয়—যুদ্ধবীর সকলের পশ্চাদ্ভাগে আইসেন।

সমালোচ্য মৃচ্ছকটিক নাটক হইতে ভারতবর্ষীয়দিগের সাত্ত্বিক ঐতিহাসিক লক্ষণও বুঝিতে পারা যায়। ইউরোপীয় ইতিহাস পাঠ করিয়া এই বোধ জন্মে যে, জনগণের মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ে মতভেদ হইলেই তাহারা পরস্পর ঘোরতর বিদ্বেষ করে। কিন্তু সকল দেশেই ঐ বিদ্বেষ সমানরূপে প্রখর হয় না। ইউরোপীয়েরা রজোগুণ প্রধান। তাহারা কামক্রোধের একান্ত বশীভূত। আবার তাহাতে পরধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ করা তাহাদের শাস্ত্রানুমোদিত। ভারতবর্ষীয়েরা ব্রাহ্মণদিগের সাত্ত্বিক শিক্ষার গুণে চিরকাল রিপুদমনে প্রবণ এবং পরমার্থদৃষ্টি। তাঁহাদের শাস্ত্রে ভেদ-জ্ঞানের ভূয়সী নিন্দা ও অভেদ-জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা। এই সকল কারণে এদেশে মতভেদ হইলেই ইউরোপের ন্যায় পরস্পর পীড়ন, নির্য্যাতন, মারামারি, কাটাকাটি প্রভৃতি নৃশংস ব্যাপারের সূচনা হয় না।

'এডুকেশন গেজেট' ১২৯৪

রমেশচন্দ্র দত্ত

ঋগ্বেদের দেবগণ

ঋগ্বেদের দেবগণ সম্বন্ধে এবং সেই প্রাচীন কালের সরল ধর্ম্মবিশ্বাস, উপাসনা পদ্ধতি, সামাজিক রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার ও সভ্যতা সম্বন্ধে একটি সরল বিবরণ লেখা আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু সে বিষয় লিখিবার পূর্ব্বে ঋগ্বেদ গ্রন্থ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

ঋগ্বেদ হিন্দুদিগের এত আদরণীয় কেন, সে কথা হিন্দু লেখক হিন্দু পাঠককে জিজ্ঞাসা করেন না। কিন্তু ঋগ্বেদ আজি জগতের সকল জাতির এরূপ আদরের ধন কেন? খৃষ্টীয় ইউরোপবাসীগণ আজি এই পুরাতন গ্রন্থ লইয়া এত আলোচনা করিতেছেন কেন? ইউরোপের প্রধান প্রধান ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ এই পুস্তকের আলোচনায় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন কেন? জর্ম্মান, ফরাসী, ইংরাজ, আমেরিকাবাসী, সভ্যজাতি মাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন কি জন্য? যে দেশে হোমর বা দান্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে দেশের লোকেও অদ্য ঋগ্বেদের সরল কবিত্বে কি অপূর্ব্ব মধুরতা পাইয়াছেন? এরূপ প্রশ্ন একটু আলোচনা করা আবশ্যক।

...মনুষ্য জাতির প্রথম গ্রন্থ মনুষ্য সভ্যতার প্রথম নিদর্শন মনুষ্য মাত্রেরই আদরণীয়!

এইরূপ নিদর্শন ভারতবর্ষে পাওয়া গিয়াছে,—সেটি ঋগ্বেদ সংহিতা। ঋগ্বেদ সংহিতা মনুষ্য জাতির সর্ব্ব প্রাচীন গ্রন্থ;* মনুষ্য জাতি যখন সভ্যতার প্রথম শিক্ষা লাভ করিতেছিল, যখন তাহারা প্রকৃতির অনন্ত গৌরব দেখিয়া তাহাই উপাসনা করিত, যখন চাষাদি অল্প অল্প সভ্য

* "The most ancient of books in the library of mankind." Preface to Max Muller's translation of the Rigveda, Vol. I.

ব্যবসায় শিক্ষা করিয়াও চারিদিকে বর্ব্বরদিগের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য অনন্ত যুদ্ধ করিত, তখন তাহারা কিরূপ চিন্তা করিত, কিরূপ আশাভরসা করিত, কিরূপ বিশ্বাস ও উপাসনা করিত, তাহাই আমরা ঋগ্বেদে দেখিতে পাই। মন্ত্রবলে যেন চারি সহস্র বৎসরের সভ্যতা বায়ুতাড়িত মেঘের ন্যায় সরিয়া যায়, সেই মেঘের পশ্চাতে আমরা এই বিস্তীর্ণ সভ্যতা স্রোতের শান্ত নিস্তব্ধ ক্ষুদ্র উৎপত্তিস্থল একবার অবলোকন করিতে পারি। অদ্যকার রেলওয়ে, টেলিগ্রাম, অর্ণবজান, ব্যোমযান, আত্মশাসন, পার্লিয়ামেণ্ট, বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় শিক্ষা প্রভৃতি ভুলিয়া যাই, মুহূর্ত্তের জন্য সেই সিন্ধুনদী তীরের বর্ব্বর বেষ্টিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর্য্য গ্রাম, জঙ্গল বেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণভূমি ও যজ্ঞস্থান দেখিতে পাই, এবং সেই গ্রামের সরল হৃদয় সবল বাহু আকাশের দেবগণের অর্চ্চনা পরায়ণ প্রথম আর্য্যদিগের গীতধ্বনি শ্রবণ করিতে পারি। এ দৃশ্য দেখিয়া কেননা ইউরোপীয়গণ বিমোহিত হইবেন, কেনন মনুষ্য জাতির আদি গ্রন্থকে মনুষ্য মাত্রেই সমাদর করিবেন ?

কিন্তু মনুষ্য জাতির প্রথম গ্রন্থ প্রশ্ন বলিয়াই কেবল ঋগ্বেদের ইউরোপে সমাদর তাহা নহে ; আর একটি বিশেষ কারণ আছে সেটিও সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

সংস্কৃত ভাষার মাহাত্ম্য এক্ষণে সকলে অবগত আছেন। সংস্কৃত ভাষা সকল আর্য্য ভাষার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, সংস্কৃত না জানিলে কি ইংরাজী, কি ফরাসী, কি লাটিন বা গ্রীক, কি জর্ম্মন বা ইতালীয় – কোন ভাষার উৎপত্তি বুঝা যায় না। এ বিষয়টি সকলেই জানেন, বিশেষ করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক নাই, একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে।

ইংরাজীতে রাজাকে King বলে, ফরাসীরা Roi বলে কিন্তু King বা Roi শব্দের আদিম মৌলিক অর্থ কি ? ইংরাজীবিদ্ পণ্ডিত তাহা বলিতে পারেন না, ফরাসীবিদ্ পণ্ডিত তাহা বলিতে পারেন না। ইউরোপের সমস্ত ভাষা অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ আলোচনা করিলেও

এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। King শব্দের প্রতিরূপ সংস্কৃত শব্দ "জনক", Roi শব্দের প্রতিরূপ সংস্কৃত শব্দ "রাজন্", জনক অর্থে জন্মদাতা, রাজন্ অর্থ যিনি বিরাজ করেন বা প্রকৃতি রঞ্জন করেন, সমাজ সুশৃঙ্খলায় রাখিবার জন্য প্রথম আর্য্যগণ যে এক একজন প্রধান যোদ্ধার অধীনে বাস করিতেন, তাহাদের এই দুইটি গুণ দেখিয়া তাহাদের নাম দিয়াছিলেন। সেই যোদ্ধাগণ জন্মদাতার ন্যায় প্রজাকে পালন ও রঞ্জন করেন এবং সমাজের মধ্যে শিরোরত্নরূপে বিরাজ করেন—সেইজন্য আমরা তাহাদিগকে অদ্যাবধি জনক বা রাজা, King বা Roi বলিয়া সম্বোধন করি। এ শিক্ষা আমরা কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষা হইতে পাই, আর্য্য জগতের প্রাচীন বা আধুনিক অন্য সমস্ত ভাষা অধ্যয়ন করিলেও এ শিক্ষা পাই না।

এই একটি শব্দ যেরূপ, আধুনিক আর্য্য ভাষার অনেক শব্দই সেইরূপ ; আদিম মৌলিক অর্থ যদি গ্রহণ করিতে চাহ, তবে ইংলণ্ড হইতে—জর্ম্মানি হইতে—সকল সভ্য আর্য্য দেশ হইতে—শিষ্যের ন্যায় বিনীতভাবে আসিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষাকে জিজ্ঞাসা কর, সংস্কৃত ভাষা সে প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ, কেননা তিনি আর্য্য ভাষাদিগের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। ছেলেবেলায় অনেক কথা যাহা কনিষ্ঠাদিগের মনে নাই, জ্যেষ্ঠার তাহা মনে আছে, ছেলেবেলার গল্পগুলি যদি জানিতে চাহ, শব্দোৎপত্তির উপাখ্যানগুলি শিখিতে চাহ, প্রাচীনা দিদির কাছে আইস তিনি বলিয়া দিবেন।

আর উদাহরণ দিবার কি আবশ্যক আছে ? Father, Mother, Daughter প্রভৃতি শব্দের মৌলিক অর্থ কেবল সংস্কৃততেই পাওয়া যায়, তাহা স্কুলের ছাত্রেরাও জানেন। Star শব্দের মৌলিক অর্থ কি ? সংস্কৃত স্ত অর্থ ছড়ান—আকাশে যাহা ছড়াইয়া আছে। Friend শব্দের মৌলিক অর্থ কি ? পৃণাতি অর্থ প্রীত করা। Father শব্দের মৌলিক অর্থ কি ? পৎ অর্থ পতন বা উড্ডীয়মান হওয়া ; পত্র অর্থ যাহার দ্বারা উড্ডীয়মান হওয়া যায়। Fume শব্দের মৌলিক অর্থ

কি ? সংস্কৃত ধূ ধাতুর অর্থ কম্পিত হওয়া ধূম অর্থ যাহা কম্পিত হইয়া উঠে। Deity শব্দের অর্থ কি ? দিব্ ধাতু অর্থ উজ্জ্বল হওয়া বা আলোক দান করা ; যিনি আলোক স্বরূপ তিনিই ঈশ্বর।

এরূপ শত শত উদাহরণ দেওয়া যায়, কিন্তু আবশ্যক নাই। আর্য্য ভাষাসমূহের মৌলিক অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে সংস্কৃত জানা আবশ্যক, এটি অদ্য ইউরোপে স্বতঃসিদ্ধ বাক্য, এই জন্যই সংস্কৃত ভাষার অদ্য ইউরোপে এরূপ সমাদর।

সংস্কৃত ভাষা যেরূপ আর্য্য ভাষাসমূহের জ্যেষ্ঠা ভগিনী এবং সকল ভাষার মৌলিক অর্থ বুঝাইয়া দেয়, ঋগ্বেদ সেইরূপ সকল আর্য্য ধর্ম্ম প্রণালীগুলির জেষ্ঠা ভগিনী, সকল প্রকার আর্য্য বিশ্বাসের ও দেব-দেবীর উপাখ্যানের মৌলিক অর্থ বুঝাইয়া দেয়। এ বিষয়ে দুই একটি উদাহরণ দেওয়া আবশ্যক।

যিনি ঋগ্বেদের আকাশে দেব "দ্যু" তিনিই গ্রীকদিগের Zeus, ল্যাটিনদিগের Jupiter ; আংগ্লোসাক্সন দিগের Tiw এবং জর্ম্মান-দিগের Zio ; ইহা সকলেই অবগত আছেন যিনি ঋগ্বেদের বরুণ (আবরণকারী আকাশ) তিনিই গ্রীকদিগের Uranos, ঋগ্বেদের অগ্নি ল্যাটিনদিগের Ignis এবং স্লাবদিগের Ogni ; ঋগ্বেদের মিত্র ইরাণীয়-দিগের মিথ্র ; ঋগ্বেদের বায়ু ইরাণীদিগের বায়ু ; ঋগ্বেদের পর্জ্জন্য (বৃষ্টিদাতা) লিথুনীয়দিগের Parjanya ; ঋগ্বেদের উষা গ্রীকদিগের Eos ও ল্যাটিনদিগের Aurora ; ঋগ্বেদের অহনা (উষা) গ্রীক-দিগের Athena (Minerva) ; ঋগ্বেদের সূর্য্য ইরাণীয়দিগের খোর-সেদ্, গ্রীকদিগের Helios এবং ল্যাটিনদিগের Sol ; গ্রীকগণ আপনা-দিগকে Hellenes কহিত অর্থাৎ সূর্য্যবংশীয়। এ কথাগুলি সকলেই জানেন, অতএব এ বিষয় আর কিছু না লিখিয়া আমরা দুই একটি ধর্ম্মোপাখ্যানের কথা বলিব।

হেমবাবুর রসময়ী লেখনী হইতে যে বৃত্রসংহার কাব্য নিঃসৃত হইয়াছে তাহা সহৃদয় বঙ্গবাসী মাত্রেই পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু বৃত্র-

সংহারের গল্পটি আজকার নহে। অনেক দিনের। এটি আমাদের পুরাণের গল্প—সুতরাং হিন্দু মাত্রেই এ গল্প জানেন, কিন্তু পুরাণে এ গল্পের মৌলিক অর্থ পাওয়া যায় না। বৃত্র স্বর্গ অধিকার করিলেন, ইন্দ্র তাঁহাকে হত করিয়া পুনরায় স্বর্গ উদ্ধার করিলেন। এটি ত উপন্যাস, ইহার অর্থ কি ? ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য কি ? পুরাণে আমরা এ প্রশ্নের উত্তর পাই না।

হিন্দু ভিন্ন অন্যান্য আর্য্য জাতির মধ্যেও আমরা এই বৃত্রসংহারের গল্প পাই, ইরাণীয় ধর্ম্মপুস্তক "অবস্তা"য় আমরা সর্ব্বদাই বৃত্রহন্তার প্রশংসা পাই, এবং অহি বা বৃত্রের হননের কথা পাই। সে সমস্ত স্থান উদ্ধার করিয়া পাঠককে বিরক্ত করিবার কোন আবশ্যক নাই, কেবল দুই একটি অংশ উদ্ধৃত করিব।

"জারাথস্ত্র অহুরো মজ্‌দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে সদয় চিত্ত অহুরো মজ্‌দ! হে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা পবিত্রাত্মা! স্বর্গীয় উপাস্য-দিগের মধ্যে কে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী ?'

"অহুরো মজ্‌দ উত্তর করিলেন, 'হে স্পিতিমা জারাথস্ত্র! অহুরের সৃষ্ট বেরেথ্‌্রঘ্ন (সংস্কৃতে বিত্রঘ্ন) সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী।' "—জেন্দ অবস্তা। বহুরাম যাস্ত।

"তিনি (থ্‌্রেতেয়ন) তাঁহার নিকট (বায়ুর নিকট) একটি বর প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, 'হে উর্দ্ধ্ব বিচারী বায়ু! আমাকে এই বর দাও যে আমি তিনমুখ ও তিনমস্তকযুক্ত অজি দহককে (সংস্কৃতে অহি দহক) পরাস্ত করিতে পারি।'...

"উর্দ্ধ্ব বিচারী বায়ু তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা অহুরো মজ্‌দের প্রার্থনা অনু-সারে সেই বর দিলেন।"—জেন্দ অবস্তা। রাম যাস্ত।

এই ইরাণীয় শাস্ত্রের বেরেথ্‌্রঘ্ন, এই অজি দহক কে ? ইহাদের উপাখ্যানের মৌলিক অর্থ কি ? ইরাণীয় শাস্ত্র জেন্দ অবস্তা তাহার উত্তর প্রদান করেন না।

আবার এই গল্প আমরা গ্রীকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে পাই Echidna

-নাম্নী সর্প রা দেবীর উর্দ্ধাঙ্গ স্ত্রীলোকের ন্যায়, এবং নীচের অঙ্গ সর্পের ন্যায়। এই ভীষণ জীবের Orthos প্রভৃতি সন্তান হয়, যে Orthos দ্বিমস্তক বিশিষ্ট যমালয়ের একটি কুক্কুর। ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ জানেন যে এই Echidna বা Echis ঋগ্বেদের অহি, এবং এই Orthos ঋগ্বেদের বৃত্র। Hercules নামক দেব যোদ্ধা Orthos-কে হত্যা করিয়াছিলেন, সুতরাং Hercules গ্রীকদিগের বৃত্রহন্তা।

কিন্তু তথাপি আমরা উপাখ্যানের মর্ম্ম বুঝিলাম না। হিন্দু পুরাণে, ইরাণীয় শাস্ত্রে, গ্রীক শাস্ত্রে আমরা একই উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন আকারে দেখিতেছি, কিন্তু পুরাণ বা জেন্দ অবস্তা বা হিসিয়ড্ আমাদিগকে এ উপাখ্যানের অর্থ বলে না।

আর্য্যদিগের সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসন্ধান করিলে ঐ উপাখ্যানের অর্থ পাই না ; কেবলমাত্র ঋগ্বেদে পাই।

ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টকের ৩২ সূক্তে সেই উপাখ্যানের অর্থ জলের ন্যায় পরিষ্কার। বৃত্র বা অহি আকাশের মেঘ বই আর কিছু নহে ; আকাশ সেই মেঘকে বজ্র দ্বারা আঘাত করেন, তাহাতে মেঘ মানব জাতির উপকারার্থ জল বর্ষণ করে। এই বৃত্রসংহার! প্রকৃতির একটি অপূর্ব্ব আনন্দকর দৃশ্য লইয়া প্রথম আর্য্যগণ একটি উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়াছেন ; হিন্দু, ইরাণীয় ও গ্রীকগণ সেই উপাখ্যানটি নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। অথচ ঋগ্বেদ না জানিলে এই সুন্দর উপাখ্যানটির অর্থ গ্রহণ করা যায় না।

আবার বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই অহি ও বৃত্রহন্তার গল্প ইতিহাসেও স্থান পাইয়াছে! আধুনিক পারস্যদিগের প্রধান ইতিহাস গ্রন্থ ফের্দুসীর 'শাহনামা' ; তাহাতে আমরা দেখিতে পাই টাইগ্রীস নদীর তীরে ফেরুদীন পারস্যরাজ জোহক্কে হনন করিয়াছিলেন। ফেরুদীন ঋগ্বেদের বৃত্রঘ্ন, জোহক ঋগ্বেদের অহি দহক! ঋগ্বেদের অহির তিন মস্তক সেইজন্য ফের্দুসীর জোহকেরও তিন মস্তক, কেবল সেগুলি সর্পের মস্তক নহে, ইতিহাসে মনুষ্যের মস্তক হইয়া গিয়াছে।

এরূপ অনেক উদাহরণ আমরা দিতে পারিতাম কিন্তু আমাদিগের স্থান বড় অল্প, অতি সংক্ষেপে আর তুই একটি মাত্র উদাহরণ দিব।

গ্রীকদিগের Prometheus আকাশ হইতে মনুষ্যদিগের জন্য অগ্নি চুরি করিয়া আনেন, সে উপাখ্যান সকলেই জানেন। এই উপাখ্যানের মৌলিক অর্থ কি ? গ্রীক শাস্ত্রে তাহা পাওয়া যায় না, ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। কাষ্ঠ ঘর্ষণ বা "প্রমন্থন" দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেইজন্য অগ্নির নাম "প্রমন্থ", তাহারই রূপান্তর Prometheus. এখন আমরা বুঝিলাম কেন Prometheus অগ্নি আনিয়াছিলেন।

হিন্দু পুরাণে বিষ্ণু অবতার হইয়া তিনটি পদ-বিক্ষেপ-দ্বারা বলি রাজাকে দমন করিয়াছিলেন। সে সুন্দর মৌলিক উপাখ্যানের অর্থ কি ? পুরাণে তাহা বলে না, ঋগ্বেদে সে অর্থ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে বিষ্ণু সূর্য্যরূপ, সূর্য্য উদয়, মধ্যাহ্ন ও অস্ত এই তিন স্থানে পদ-বিক্ষেপ করিয়া সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করেন।*

প্রাচীন জার্ম্মানদিগের Tyr দেবের একটি হাত ব্যাঘ্রে খাইয়া ফেলিয়াছিল। এ উপাখ্যানের মৌলিক অর্থ কি ? Tyr সূর্য্য শব্দের প্রতিরূপ, একটি যজ্ঞে সূর্য্যের একটি হস্ত ছিন্ন হইয়া পড়ে ও পূজকগণ তাঁহার একটি সুবর্ণের হস্ত গড়াইয়া দেন এইরূপ পৌরাণিক গল্প-ও আছে। এ গল্পেরই বা অর্থ কি !

ঋগ্বেদে ইহার অর্থ উপলব্ধি হয়। ঋগ্বেদের কবিগণ সূর্য্যের সুবর্ণ কিরণ দেখিয়া কল্পনাচ্ছলে অনেক স্থানে সূর্য্যকে হিরণ্যপানি-"হিরণ্য-বাহু" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ;—তাহা হইতে সূর্য্যের বাহুনাশের ও সুবর্ণ বাহু নির্ম্মাণের উপাখ্যান হইল !

গ্রীকদের সূর্য্যদেব Apollo, Daphne নাম্নী দেবীর সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন ! পলায়মানা Daphne অবশেষে পরিত্রাণার্থ শরীর বিসর্জ্জন দিয়া একটি লরেল

* যাস্ক ও ঔর্ণবাভের ব্যাখ্যা দেখুন।

বৃক্ষের রূপ ধারণ করিলেন। এ উপন্যাসের অর্থ কি? ঋগ্বেদ পাঠ ভিন্ন এ উপন্যাসের অর্থ গ্রহণের উপায় নাই। Daphne ঋগ্বেদের "দহনা" শব্দের প্রতিরূপ, দহনা ঊষার নাম। সূর্য্য ঊষার পশ্চাতে ধাবমান হয়েন, সূর্য্য উদয় হইলেই ঊষা আর থাকে না, শরীর ত্যাগ করে। পুরাণে যে ঊর্ব্বশী ও পুরুরবার উপাখ্যান আছে, যাহা কবি-শ্রেষ্ঠ কালিদাস বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন তাহারও এই অর্থ; পুরুরবা (সূর্য্যের) উলঙ্গ অঙ্গ দেখিলেই (ঊষা) অন্তর্হিতা হয়েন।

গ্রীকদিগের বিশ্বকর্ম্মা Hephaistos (*Latin* Vulcan) কে? তাঁহার নামের অর্থ কি? তিনি সর্ব্বদা অগ্নি লইয়া কার্য্য করেন কেন? অগ্নি কখনও বৃদ্ধ হয়েন না; কেননা তাহাকে জ্বালা যায়, অতএব তিনি সর্ব্বদাই যুবা। এইজন্য ঋগ্বেদে তাঁহাকে যুবাতম বা "যবিষ্ঠ" বলে, এটি অগ্নির একরূপ নাম হইয়া গিয়াছে। গ্রীক "Hephaistos" "যবিষ্ঠ" শব্দের প্রতিরূপ।

গ্রীকদিগের কামদেব Eros (*Latin* Cupid) কে? সূর্য্যের প্রথম অরুণ বর্ণ রশ্মিকে ঋগ্বেদে অশ্বের সহিত তুলনা দিয়া "অরুষ" নাম দেওয়া হইয়াছে, "Eros" শব্দ তাহারই প্রতিরূপ শব্দ।

গ্রীকদিগের সুন্দরী Charites (Graces) দেবীগুলি কে? তাহারাও লোহিত সূর্য্য কিরণ। ঋগ্বেদে তাঁহাদিগকে অশ্বের সহিত তুলনা করিয়া "হরিৎ" নাম দেওয়া হইয়াছে, "Charites" শব্দ তাহারই প্রতিরূপ শব্দ।

এরূপ শত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এ প্রবন্ধে আর আমাদিগের স্থান নাই, যখন ভিন্ন ভিন্ন দেবদিগের কথা কহিব, তখন তাহাদের সম্বন্ধে অন্যান্য উপাখ্যানের উল্লেখ করিব। তবে এখানে আর একটি উপাখ্যানের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ঋগ্বেদে ইন্দ্র আকাশ-দেবতা। ঊষার রক্তিমচ্ছটা বা রক্তবর্ণ-মেঘখণ্ডগুলি দিবা প্রকাশ হইলে থাকে না। ঋগ্বেদের কবিগণ উপমা

স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন যে পণিস্ নামক এক অসুর দেবদিগের গাভী (রক্তবর্ণ আলোক বা মেঘখণ্ড) হরণ করিয়া লইয়া যায়, এবং একটি দুর্গম স্থানে ("বিলু" অর্থ দুর্গম স্থান) লুকাইয়া রাখে। ইন্দ্র তাঁহার দেবকুক্কুরী সরমাকে অনুসন্ধানের জন্য পাঠাইয়া দেন, এবং সরমার সন্ধান হইলে পণিস্ তাহাকে আপন পক্ষে লওয়াইয়া আনিতে চেষ্টা করে। সরমা ফিরিয়া গিয়া ইন্দ্রকে গাভীগণের সন্ধান দিলে, ইন্দ্র যুদ্ধ করিয়া সেই বিলু হইতে সেই গাভী উদ্ধার করেন। এটি প্রাতঃকালের সম্বন্ধে একটি উপমাগর্ভ উপাখ্যান মাত্র। কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত মনে করেন যে গ্রীকের অদ্বিতীয় কবি হোমার যে *Iliad* নামক সুন্দর মহাকাব্য লিখিয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাহাও মূলে এই উপাখ্যানটি অবলম্বন করিয়া লিখিত; ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ জানেন যে Helena সরমা শব্দের রূপান্তর; Ilium বিলু শব্দের রূপান্তর, Paris পণিস্ শব্দের রূপান্তর, ইত্যাদি। কিন্তু এ বিষয়ে এখনও সন্দেহ আছে; অনেক পণ্ডিত উপরিউক্ত মত গ্রহণ করেন না, এবং গ্রীক ও ট্রোজানদিগের যুদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা এবং পারিস ও হেলিনাকেও ঐতিহাসিক চরিত্র বলিয়া বিবেচনা করেন। এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি ইউরোপে কেন ঋগ্বেদের এরূপ আদর। ঋগ্বেদের ধর্ম্মপ্রণালী সকল আর্য্যধর্ম্মপ্রণালীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী, ঋগ্বেদ আলোচনা না করিলে সে ধর্ম্মপ্রণালীগুলি বুঝা যায় না, নানা দেশের ধর্ম্ম উপাখ্যানগুলি বুঝা যায় না। সকল আর্য্যধর্ম্ম ও বিশ্বাসগুলি আমাদিগের চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছে, আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহা দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি না। সম্মুখে যেন একটি নিবিড় কুহায় সমস্ত আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে, অতএব যাহা দেখিতেছি তাহা স্পষ্ট দেখি না, তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ বুঝি না, তাহাদিগের অর্থ গ্রহণ করি না। ঋগ্বেদের আলোক তাহাদের উপর পতিত হইলে যেন সহসা সে কুহা সরিয়া যায়, যেন সহসা সে দেবদেবীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্পষ্ট দেখিতে পাই, যেন তাহাদিগের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। প্রকৃতির

উপাসনাতেই আর্য্যধর্ম্মের উৎপত্তি, কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মপ্রণালীতে প্রকৃতির দৃশ্যগুলি বা কার্য্যগুলি একেবারে দেবদেবীর রূপ ধারণ করিয়াছে।

ঋগ্বেদে তাহারা এখনও প্রকৃতির কার্য্যই রহিয়াছে; অথচ বিস্ময়-কর, হিতকর, ভক্তিপদ, ভয়পদ এইজন্য উপাস্য।* মানব জাতির প্রকৃত ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিতে চাহেন, ঋগ্বেদ তাঁহাদিগের উৎ-কৃষ্ট উপায়। আর্য্যধর্ম্ম যাঁহারা আলোচনা করিতে চাহেন, আর্য্য-চিন্তা ও বিশ্বাসের প্রকৃত অর্থ যাঁহারা গ্রহণ করিতে চাহেন, আর্য্য ইতি-হাসের মূল, উৎপত্তি ও বৃদ্ধি যাঁহারা অবগত হইতে চাহেন, ঋগ্বেদ তাঁহাদিগের একমাত্র উপায়।

এক্ষণে ঋগ্বেদ গ্রন্থের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। দেব-দেবীদিগের কথা অধিক বলিবার আবশ্যক নাই, কেননা পরের প্রবন্ধ-গুলিতে তাহাদিগের বিস্তীর্ণ বর্ণনা দেওয়া যাইবে। এখানে দেবগুলির নাম দিলেই যথেষ্ট হইবে।

দ্যু (অর্থাৎ আকাশ) এবং পৃথিবীকে সকল দেবগণের পিতামাতা বলিয়া অর্চ্চনা করা হইয়াছে, অদিতিও (অর্থাৎ অনন্ত আকাশ বা বিশ্ব-জগৎ) সকল দেবের মাতা স্বরূপা। তাঁহারি সন্তান সূর্য্যাদি আদিত্য-গণ। ইন্দ্র আকাশ দেব, মেঘকে হনন করিয়া বৃষ্টি দিয়া মনুষ্যের হিত করেন, এবং ঋগ্বেদে ইন্দ্রের সম্বন্ধে যতগুলি সূক্ত (অর্থাৎ স্তুতি) আছে, অন্য কোন দেব সম্বন্ধে ততগুলি নাই। বরুণও আবরণকারী আকাশ

* The mythology of the *Veda* is to comparative mythology what Sanscrit has been to comparative grammar.... Nowhere is the wide distance which separate the ancient poems of India from the most ancient literature of Greece more clearly felt than when we compare the growing myths of the *Veda* with the full grown and decayed myths on which the poetry of Homer is founded. The *Veda* is the real Theogony of the Aryan races." Max Müller's *Chips from a German work-shop*. Article: Comparative Mythology.

বা নৈশ আকাশ ; মিত্র আলোক বা দিবা ; সুতরাং মিত্র ও বরুণের প্রায়ই একত্র স্তুতি করা হইয়াছে। এবং তাহাদিগের সঙ্গে অর্য্যমারও স্তুতি আছে, কেন না তিনি দিবা ও রাত্রির মধ্যস্থ প্রাতঃকাল, অথবা প্রাতঃকালের সূর্য্য। অগ্নি না হইলে যজ্ঞ হয় না, অতএব অগ্নিই সকল যজ্ঞের পুরোহিত। এবং তাহাকে যে হব্য অর্পণ করা যায় তিনি তাহা দেবগণের নিকট লইয়া যান। বায়ু বাতাস, মরুৎগণ ঝড়ের বাতাস, মহা পরাক্রান্ত, এবং ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া শত্রু বিনাশ করেন। সূর্য্য বা সবিতা আলোক বর্ষণ করেন। উষা প্রাচীন ঋষিদের বড় আদরের দেবী ; তাঁহার সম্বন্ধে সূক্তগুলি যেরূপ কবিত্বপূর্ণ, সেরূপ আর কোন দেব সম্বন্ধে দেখা যায় না। তিনি সংসারের গৃহিণীর ন্যায় প্রত্যূষে জাগ্রত হইয়া স্নেহের সহিত সকলকে জাগরিত করেন, সকলকে আপন আপন কার্য্যে প্রেরণ করেন। উষার পূর্ব্বে আকাশে যে আলোক ও অন্ধকারে মিশ্রিত থাকে, তাহাই অশ্বিদ্বয়, পুরাণে তাঁহাদিগকে অশ্বিনীকুমার বলে!

তাঁহারা দেব চিকিৎসক, রোগ বিনাশ করেন এবং বিপদে মনুষ্যগণকে সহায়তা করেন। সোমরস না হইলে যজ্ঞ হইত না, এইজন্য সোমও উপাস্য দেব। পর্জ্জন্য মেঘ অথবা বৃষ্টি দেব, পূষা সূর্য্যের একটি রূপ এবং প্রাণী জগতের পুষ্টিকর দেব ও মনুষ্যদিগের দেশ ভ্রমণের পথ প্রদর্শক, এবং ত্বষ্টা ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মাতা। বিশ্বদেবগণ ও ঋভুগণেরও অর্চ্চনা আছে, ঋভুগণ প্রথমে মনুষ্য ছিলেন, পরে দেবদিগের জন্য একখানি যজ্ঞ পাত্রকে চারিখানি করিয়া দেবগণকে তুষ্ট করিয়াছিলেন, এবং সূর্য্য তাহাদিগকে দেবত্ব দান করেন। যম ও তাঁহার ভগিনী যমীর আদিম অর্থ বোধহয় দিবা ও রাত্রি ; দিবা বা সূর্য্যরূপ যম অস্তযান, অর্থাৎ পরলোক গমন করেন, তিনিই প্রথমে পরলোকে গিয়াছেন। বিষ্ণু সূর্য্যের রূপ মাত্র, রুদ্র অগ্নির রূপ অথবা ঝড়ের রূপ এবং মরুৎগণের অর্থাৎ ঝড়ের পিতা, ব্রহ্ম অর্থ প্রার্থনা বা স্তুতি, তাহা হইতে ব্রহ্মণস্পতি নামে একজন দেব আছেন, অর্থ প্রার্থনার

দেব। সরস্বতী নদী দেবীরূপে উপাসিত হইতেন, বোধহয় সেই নদী-তীরে যজ্ঞাদি সম্পাদিত করা হইত ও মন্ত্র উচ্চারিত হইত, সেই কারণেই হউক বা অন্য কোনও কারণে হউক তিনি ক্রমে মন্ত্রদেবী বা বাগ্দেবী হইয়া উঠিলেন। ইলা ভারতী প্রভৃতি যজ্ঞের প্রথা বা অংশ সকলও দেবীরূপে উপাসিতা হইতেন। তাহা ভিন্ন অগ্নির স্ত্রী আগ্নায়ী, বরুণের স্ত্রী বরুণানী ইত্যাদির উল্লেখ মাত্র আছে ইঁহাদের স্তুতি বা উপাসনা নাই।

ইঁহারাই ঋগ্বেদের দেবতা।

'নবজীবন' ১২৯২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শকুন্তলা

শেক্‌স্‌পীয়রের টেম্পস্ট্‌ নাটকের সহিত কালিদাসের শকুন্তলার তুলনা মনে সহজেই উদয় হইতে পারে। ইহাদের বাহ্য সাদৃশ্য এবং আন্তরিক অনৈক্য আলোচনা করিয়া দেখিবার বিষয়।

নির্জনলালিতা মিরান্দার সহিত রাজকুমার ফার্দিনান্দের প্রণয় তাপসকুমারী শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের প্রণয়ের অনুরূপ। ঘটনা-স্থলটিরও সাদৃশ্য আছে; এক পক্ষে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপ, অপর পক্ষে তপোবন।

এইরূপে উভয়ের আখ্যানমূলে ঐক্য দেখিতে পাই, কিন্তু কাব্য-রসের স্বাদ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা পড়িলেই অনুভব করিতে পারি।

য়ুরোপের কবিকুলগুরু গেটে একটি মাত্র শ্লোকে শকুন্তলার সমালোচনা লিখিয়াছেন, তিনি কাব্যকে খণ্ডখণ্ড বিচ্ছিন্ন করেন নাই। তাঁহার শ্লোকটি একটি দীপবর্তিকার শিখার ন্যায় ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহা দীপশিখার মতোই সমগ্র শকুন্তলাকে এক মুহূর্তে উদ্‌ভাসিত করিয়া দেখাইবার উপায়। তিনি এক কথায় বলিয়াছেন, কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত্য ও স্বর্গ একত্রে দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।

অনেকেই এই কথাটি কবির উচ্ছ্বাসমাত্র মনে করিয়া লঘুভাবে পাঠ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মোটামুটি মনে করেন, ইহার অর্থ এই যে, গেটের মতে শকুন্তলা কাব্যখানি অতি উপাদেয়। কিন্তু তাহা নহে। গেটের এই শ্লোকটি আনন্দের অত্যুক্তি নহে, ইহা রসজ্ঞের বিচার। ইহার মধ্যে বিশেষত্ব আছে। কবি বিশেষভাবেই বলিয়াছেন, শকুন্তলার মধ্যে একটি গভীর পরিণতির ভাব আছে, সে পরিণতি ফুল হইতে ফলে পরিণতি, মর্ত্য হইতে স্বর্গে পরিণতি,

স্বভাব হইতে ধর্মে পরিণতি। মেঘদূতে যেমন পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে, পূর্বমেঘে পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্য পর্যটন করিয়া উত্তরমেঘে অলকাপুরীর নিত্যসৌন্দর্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়, তেমনি শকুন্তলায় একটি পূর্বমিলন ও একটি উত্তরমিলন আছে। প্রথম-অঙ্কবর্তী সেই মর্ত্যের চঞ্চল সৌন্দর্যময় বিচিত্র পূর্বমিলন হইতে স্বর্গতপোবনে শাশ্বত-আনন্দময় উত্তরমিলনে যাত্রাই অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক। ইহা কেবল বিশেষ কোনো ভাবের অবতারণা নহে, বিশেষ কোনো চরিত্রের বিকাশ নহে, ইহা সমস্ত কাব্যকে এক লোক হইতে অন্য লোকে লইয়া যাওয়া — প্রেমকে স্বভাবসৌন্দর্যের দেশ হইতে মঙ্গলসৌন্দর্যের অক্ষয় স্বর্গধামে উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়া। এই প্রসঙ্গটি আমরা অন্য একটি প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং এখানে তাহার পুনরুক্তি করিতে ইচ্ছা করি না।

স্বর্গ ও মর্ত্যের এই যে মিলন, কালিদাস ইহা অত্যন্ত সহজেই করিয়াছেন। ফুলকে তিনি এমনি স্বভাবত ফলে ফলাইয়াছেন, মর্ত্যের সীমাকে তিনি এমনি করিয়া স্বর্গের সহিত মিশাইয়া দিয়াছেন যে, মাঝে কোনো ব্যবধান কাহারও চোখে পড়ে না। প্রথম অঙ্কে শকুন্তলার পতনের মধ্যে কবি মর্ত্যের মাটি কিছুই গোপন রাখেন নাই ; তাহার মধ্যে বাসনার প্রভাব যে কতদূর বিদ্যমান, তাহা দুষ্মন্ত শকুন্তলা উভয়ের ব্যবহারেই কবি সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। যৌবন-মত্ততার হাবভাব-লীলাচাঞ্চল্য, পরম লজ্জার সহিত প্রবল আত্ম-প্রকাশের সংগ্রাম, সমস্তই কবি ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা শকুন্তলার সরলতার নিদর্শন। অনুকূল অবসরে এই ভাবাবেশের আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য সে পূর্ব হইতে প্রস্তুত ছিল না। সে আপনাকে দমন করিবার, গোপন করিবার উপায় করিয়া রাখে নাই। যে হরিণী ব্যাধকে চেনে না তাহার কি বিদ্ধ হইতে বিলম্ব লাগে ? শকুন্তলা পঞ্চশরকে ঠিকমত চিনিত না, এইজন্যই তাহার মর্মস্থান অরক্ষিত ছিল। সে না কন্দর্পকে, না দুষ্মন্তকে, কাহাকেও অবিশ্বাস করে নাই।

যেমন, যে অরণ্যে সর্বদাই শিকার হইয়া থাকে, সেখানে ব্যাধকে অধিক করিয়া আত্মগোপন করিতে হয়, তেমনি যে সমাজে স্ত্রীপুরুষের সর্বদাই সহজেই মিলন হইয়া থাকে সেখানে মীনকেতুকে অত্যন্ত সাবধানে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কাজ করিতে হয়। তপোবনের হরিণী যেমন অশঙ্কিত তপোবনের বালিকাও তেমনি অসতর্ক।

শকুন্তলার পরাভব যেমন অতি সহজে চিত্রিত হইয়াছে তেমনি সেই পরাভব সত্ত্বেও তাহার চরিত্রের গভীরতর পবিত্রতা, তাহার স্বাভাবিক অক্ষুণ্ণ সতীত্ব, অতি অনায়াসেই পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহাও তাহার সরলতার নিদর্শন। ঘরের ভিতরে যে কৃত্রিম ফুল সাজাইয়া রাখা যায় তাহার ধুলা প্রত্যহ না ঝাড়িলে চলে না, কিন্তু অরণ্যফুলের ধুলা ঝাড়িবার জন্য লোক রাখিতে হয় না; সে অনাবৃত থাকে, তাহার গায়ে ধুলাও লাগে, তবু সে কেমন করিয়া সহজে আপনার সুন্দর নির্মলতাটুকু রক্ষা করিয়া চলে। শকুন্তলাকেও ধুলা লাগিয়াছিল, কিন্তু তাহা সে নিজে জানিতেও পারে নাই; সে অরণ্যের সরলা মৃগীর মতো, নির্ঝরের জলধারার মতো, মলিনতার সংস্রবেও অনায়াসেই নির্মল।

কালিদাস তাঁহার এই আশ্রমপালিতা উদ্ভিন্নযৌবনা শকুন্তলাকে সংশয়বিরহিত স্বভাবের পথে ছাড়িয়া দিয়াছেন, শেষ পর্যন্ত কোথাও তাহাকে বাধা দেন নাই। আবার অন্য দিকে তাহাকে অপ্রগল্‌ভা, দুঃখশীলা নিয়মচারিণী, সতীধর্মের আদর্শরূপিণী করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এক দিকে তরুলতা ফলপুষ্পের ন্যায় সে আত্মবিস্মৃত স্বভাবধর্মের অনুগতা; আবার অন্য দিকে তাহার অন্তরতর নারীপ্রকৃতি সংযত, সহিষ্ণু, একাগ্রতপঃপরায়ণা, কল্যাণধর্মের শাসনে একান্ত নিয়ন্ত্রিতা। কালিদাস অপরূপ কৌশলে তাঁহার নায়িকাকে লীলা ও ধৈর্যের, স্বভাব ও নিয়মের, নদী ও সমুদ্রের ঠিক মোহানার উপর স্থাপিত করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহার পিতা ঋষি, তাহার মাতা অপ্সরা; ব্রতভঙ্গে তাহার জন্ম, তপোবনে তাহার পালন। তপোবন স্থানটি

এমন যেখানে স্বভাব এবং তপস্যা, সৌন্দর্য এবং সংযম একত্র মিলিত হইয়াছে। সেখানে সমাজের কৃত্রিম বিধান নাই, অথচ ধর্মের কঠোর নিয়ম বিরাজমান। গান্ধর্ববিবাহ ব্যাপারটিও তেমনি; তাহাতে স্বভাবের উদ্দামতাও আছে, অথচ বিবাহের সামাজিক বন্ধনও আছে। বন্ধন ও অবন্ধনের সংগমস্থলে স্থাপিত হইয়াই শকুন্তলা নাটকটি একটি বিশেষ অপরূপত্ব লাভ করিয়াছে। তাহার সুখদুঃখ-মিলনবিচ্ছেদ সমস্তই এই উভয়ের ঘাতপ্রতিঘাতে। গেটে যে কেন তাঁহার সমালোচনায় শকুন্তলার মধ্যে দুই বিসদৃশের একত্র সমাবেশ ঘোষণা করিয়াছেন তাহা অভিনিবেশপূর্বক দেখিলেই বুঝা যায়।

টেম্পেস্টে এ ভাবটি নাই। কেনই বা থাকিবে? শকুন্তলাও সুন্দরী, মিরান্দাও সুন্দরী, তাই বলিয়া উভয়ের নাসাচক্ষুর অবিকল সাদৃশ্য কে প্রত্যাশা করিতে পারে? উভয়ের মধ্যে অবস্থার, ঘটনার, প্রকৃতির সম্পূর্ণ প্রভেদ। মিরান্দা যে নির্জনতায় শিশুকাল হইতে পালিত শকুন্তলার সে নির্জনতা ছিল না। মিরান্দা একমাত্র পিতার সাহচর্যে বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং তাহার প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হইবার আনুকূল্য পায় নাই। শকুন্তলা সমানবয়সী সখীদের সহিত বর্ধিত; তাহারা পরস্পরের উত্তাপে, অনুকরণে, ভাবের আদানপ্রদানে, হাস্যে-পরিহাসে, কথোপকথনে স্বাভাবিক বিকাশ লাভ করিতেছিল। শকুন্তলা যদি অহরহ কণ্বমুণির সঙ্গেই থাকিত তবে তাহার উন্মেষ বাধা পাইত, তবে তাহার সরলতা অজ্ঞতার নামান্তর হইয়া তাহাকে স্ত্রী-ঋষ্যশৃঙ্গ করিয়া তুলিতে পারিত। বস্তুত শকুন্তলার সরলতা স্বভাবগত এবং মিরান্দার সরলতা বহির্ঘটনাগত। উভয়ের মধ্যে অবস্থার যে প্রভেদ আছে তাহাতে এইরূপই সংগত। মিরান্দার ন্যায় শকুন্তলার সরলতা অজ্ঞানের দ্বারা চতুর্দিকে পরিরক্ষিত নহে। শকুন্তলার যৌবন সদ্য বিকশিত হইয়াছে এবং কৌতুকশীলা সখীরা সে সম্বন্ধে তাহাকে আত্মবিস্মৃত থাকিতে দেয় নাই, তাহা আমরা প্রথম অঙ্কেই দেখিতে পাই। সে লজ্জা করিতেও শিখিয়াছে।

কিন্তু এ সকলই বাহিরের জিনিস। তাহার সরলতা গভীরতর, তাহার পবিত্রতা অন্তরতর। বাহিরের কোনো অভিজ্ঞতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, কবি তা শেষ পর্যন্ত দেখাইয়াছেন। শকুন্তলার সরলতা আভ্যন্তরিক। সে যে সংসারের কিছুই জানে না তাহা নহে; কারণ, তপোবন সমাজের একেবারে বহির্বর্তী নহে; তপোবনেও গৃহধর্ম পালিত হইত। বাহিরের সম্বন্ধে শকুন্তলা অনভিজ্ঞ বটে, তবু অজ্ঞ নহে; কিন্তু তাহার অন্তরের মধ্যে বিশ্বাসের সিংহাসন। সেই বিশ্বাসনিষ্ঠ সরলতা তাহাকে ক্ষণকালের জন্য পতিত করিয়াছে, কিন্তু চিরকালের জন্য উদ্ধার করিয়াছে; দারুণতম বিশ্বাসঘাতকতার আঘাতেও তাহাকে ধৈর্যে, ক্ষমায়, কল্যাণে স্থির রাখিয়াছে। মিরান্দার সরলতার অগ্নিপরীক্ষা হয় নাই, সংসারজ্ঞানের সহিত তাহার আঘাত ঘটে নাই; আমরা তাহাকে কেবল প্রথম অবস্থার মধ্যে দেখিয়াছি, শকুন্তলাকে কবি প্রথম হইতে শেষ অবস্থা পর্যন্ত দেখাইয়াছেন।

এমন স্থলে তুলনায় সমালোচনা বৃথা। আমরাও তাহা স্বীকার করি। এই দুই কাব্যকে পাশাপাশি রাখিলে উভয়ের ঐক্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই বেশি ফুটিয়া উঠে। সেই বৈসাদৃশ্যের আলোচনাতেও দুই নাটককে পরিষ্কার করিয়া বুঝিবার সহায়তা করিতে পারে। আমরা সেই আশায় এই প্রবন্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

মিরান্দাকে আমরা তরঙ্গঘাতমুখর শৈলবন্ধুর জনহীন দ্বীপের মধ্যে দেখিয়াছি, কিন্তু সেই দ্বীপপ্রকৃতির সঙ্গে তাহার কোনো ঘনিষ্ঠতা নাই। তাহার সেই আশৈশবধাত্রীভূমি হইতে তাহাকে তুলিয়া আনিতে গেলে তাহার কোনো জায়গায় টান পড়িবে না। সেখানে মিরান্দা মানুষের সঙ্গ পায় নাই, এই অভাবটুকুই কেবল তাহার চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে; কিন্তু সেখানকার সমুদ্র-পর্বতের সহিত তাহার অন্তঃকরণের কোনো ভাবাত্মক যোগ আমরা দেখিতে পাই না। নির্জন দ্বীপকে আমরা ঘটনাচ্ছলে কবির বর্ণনায় দেখি মাত্র, কিন্তু মিরান্দার ভিতর

দিয়া দেখি না। এই দ্বীপটি কেবল কাব্যের আখ্যানের পক্ষেই আবশ্যক, চরিত্রের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে।

শকুন্তলা সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। শকুন্তলা তপোবনের অঙ্গীভূত। তপোবনকে দূরে রাখিলে কেবল নাটকের আখ্যানভাগ ব্যাঘাত পায় তাহা নহে, স্বয়ং শকুন্তলাই অসম্পূর্ণ হয়। শকুন্তলা মিরান্দার মতো স্বতন্ত্র নহে, শকুন্তলা তাহার চতুর্দিকের সহিত একাত্মভাবে বিজড়িত। তাহার মধুর চরিত্রখানি অরণ্যের ছায়া ও মাধবীলতার পুষ্পমঞ্জরীর সহিত ব্যাপ্ত ও বিকশিত, পশুপক্ষীদের অকৃত্রিম সৌহার্দের সহিত নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট। কালিদাস তাঁহার নাটকে যে বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা করিয়াছেন তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া রাখেন নাই, তাহাকে শকুন্তলার চরিত্রের মধ্যে উন্মেষিত করিয়া তুলিয়াছেন। সেইজন্য বলিতেছিলাম, শকুন্তলাকে তাহার কাব্যগত পরিবেষ্টন হইতে বাহির করিয়া আনা কঠিন।

ফার্দিনান্দের সহিত প্রণয়ব্যাপারেই মিরান্দার প্রধান পরিচয়; আর ঝড়ের সময় ভগ্নতরী হতভাগ্যদের জন্য ব্যাকুলতায় তাহার ব্যথিত হৃদয়ের করুণা প্রকাশ পাইয়াছে। শকুন্তলার পরিচয় আরো অনেক ব্যাপক। দুষ্মন্ত না দেখা দিলেও তাহার মাধুর্য বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হইয়া উঠিত। তাহার হৃদয়লতিকা চেতন-অচেতন সকলকেই স্নেহের ললিতবেষ্টনে সুন্দর করিয়া বাঁধিয়াছে। সে তপোবনের তরুগুলিকে জলসেচনের সঙ্গে সঙ্গে সোদরস্নেহে অভিষিক্ত করিয়াছে। সে নবকুসুমযৌবনা বনজ্যোৎস্নাকে স্নিগ্ধদৃষ্টির দ্বারা আপনার কোমল হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে। শকুন্তলা যখন তপোবন ত্যাগ করিয়া পতিগৃহে যাইতেছে তখন পদে পদে তাহার আকর্ষণ, পদে পদে তাহার বেদনা। বনের সহিত মানুষের বিচ্ছেদ যে এমন মর্মান্তিক সকরুণ হইতে পারে তাহা জগতের সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে কেবল অভিজ্ঞানশকুন্তলের চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায়। এই কাব্যে স্বভাব ও ধর্মনিয়মের যেমন মিলন, মানুষ ও প্রকৃতির তেমনি মিলন। বিসদৃশের মধ্যে এমন

একান্ত মিলনের ভাব বোধ করি ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোনো দেশে সম্ভবপর হইতে পারে না।

টেম্পেস্টে বহিঃপ্রকৃতি এরিয়েলের মধ্যে মানুষ-আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু তবু সে মানুষের আত্মীয়তা হইতে দূরে রহিয়াছে। মানুষের সঙ্গে তাহার অনিচ্ছুক ভৃত্যের সম্বন্ধ। সে স্বাধীন হইতে চায়, কিন্তু মানবশক্তিদ্বারা পীড়িত আবদ্ধ হইয়া দাসের মতো কাজ করিতেছে। তাহার হৃদয়ে স্নেহ নাই, চক্ষে জল নাই। মিরান্দার নারীহৃদয়ও তাহার প্রতি স্নেহবিস্তার করে নাই। দ্বীপ হইতে যাত্রাকালে প্রস্পেরো ও মিরান্দার সহিত এরিয়েলের স্নিগ্ধ বিদায়-সম্ভাষণ হইল না। টেম্পেস্টে পীড়ন, শাসন, দমন; শকুন্তলায় প্রীতি, শান্তি, সদ্‌ভাব। টেম্পেস্টে প্রকৃতি মানুষ-আকার ধারণ করিয়াও তাহার সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধে বদ্ধ হয় নাই; শকুন্তলায় গাছপালা-পশুপক্ষী আত্মভাব রক্ষা করিয়াও মানুষের সহিত মধুর আত্মীয়ভাবে মিলিত হইয়া গেছে।

শকুন্তলার আরম্ভেই যখন ধনুর্বাণধারী রাজার প্রতি এই করুণ নিষেধ উত্থিত হইল 'ভো ভো রাজন্ আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ', তখন কাব্যের একটি মূল সুর বাজিয়া উঠিল। এই নিষেধটি আশ্রমমৃগের সঙ্গে সঙ্গে তাপসকুমারী শকুন্তলাকেও করুণাচ্ছাদনে আবৃত করিতেছে। ঋষি বলিতেছেন—

মৃদু এ মৃগদেহে
মেরো না শর।
আগুন দেবে কে হে
ফুলের 'পর।
কোথা হে মহারাজ,
মৃগের প্রাণ,
কোথায় যেন বাজ
তোমার বাণ।

এ কথা শকুন্তলা সম্বন্ধেও খাটে। শকুন্তলার প্রতিও রাজার প্রণয়শরনিক্ষেপ নিদারুণ। প্রণয়ব্যবসায়ে রাজা পরিপক্ক ও কঠিন – কত কঠিন, অন্যত্র তাহার পরিচয় আছে – আর, এই আশ্রমপালিতা বালিকার অনভিজ্ঞতা ও সরলতা বড়োই সুকুমার ও সকরুণ। হায়, মৃগটি যেমন কাতরবাক্যে রক্ষণীয়, শকুন্তলাও তেমনি। দ্বৌ অপি অত্র আরণ্যকৌ।

মৃগের প্রতি এই করুণাবাক্যের প্রতিধ্বনি মিলাইতে না মিলাইতে দেখি, বল্কলবসনা তাপসকন্যা সখীদের সহিত আলবালে জলপূরণে নিযুক্ত, তরু-সোদর ও লতা-ভগিনীদের মধ্যে তাহার প্রাত্যহিক স্নেহসেবার কর্মে প্রবৃত্ত। কেবল বল্কলবসনে নহে, ভাবে ভঙ্গিতেও শকুন্তলা যেন তরুলতার মধ্যেই একটি। তাই দুষ্মন্ত বলিয়াছেন –

অধর কিসলয়-রাঙিমা-আঁকা,
যুগল বাহু যেন কোমল শাখা,
হৃদয়লোভনীয় কুসুম-হেন
তনুতে যৌবন ফুটেছে যেন।

নাটকের আরম্ভেই শান্তিসৌন্দর্যসংবলিত এমন একটি সম্পূর্ণ জীবন, নিভৃত পুষ্পপল্লবের মাঝখানে প্রাত্যহিক আশ্রমধর্ম, অতিথিসেবা, সখীস্নেহ ও বিশ্ববাৎসল্য লইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দিল। তাহা এমনি অখণ্ড, এমনি আনন্দকর যে, আমাদের কেবলই আশঙ্কা হয়, পাছে আঘাত লাগিলেই ইহা ভাঙিয়া যায়। দুষ্মন্তকে দুই উদ্যত বাহু-দ্বারা প্রতিরোধ করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, বাণ মারিয়ো না, মারিয়ো না – এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্যটি ভাঙিয়ো না।

যখন দেখিতে দেখিতে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রণয় প্রগাঢ় হইয়া উঠিতেছে তখন প্রথম অঙ্কের শেষে নেপথ্যে অকস্মাৎ আর্তরব উঠিল, 'ভো ভো তপস্বিগণ, তোমরা তপোবনপ্রাণীদের রক্ষার জন্য সতর্ক হও। মৃগয়াবিহারী রাজা দুষ্মন্ত প্রত্যাসন্ন হইয়াছেন।'

ইহা সমস্ত তপোবনভূমির ক্রন্দন, এবং সেই তপোবনপ্রাণীদের মধ্যে শকুন্তলাও একটি। কিন্তু তাহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারিল না।

সেই তপোবন হইতে শকুন্তলা যখন যাইতেছে, তখন কণ্ব ডাক দিয়া বলিলেন, 'ওগো সন্নিহিত তপোবন-তরুগণ, —

তোমাদের জল না করি দান
যে আগে জল না করিত পান,
সাধ ছিল যার সাজিতে, তবু
স্নেহে পাতাটি না ছিঁড়িত কভু,
তোমাদের ফুল ফুটিত যবে
যে জন মাতিত মহোৎসবে,
পতিগৃহে সেই বালিকা যায়,
তোমরা সকলে দেহ বিদায়।'

চেতন-অচেতন সকলের সঙ্গে এমনি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা, এমনি প্রীতি ও কল্যাণের বন্ধন!

শকুন্তলা কহিল, 'হলা প্রিয়ংবদে, আর্যপুত্রকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ আকুল, তবু আশ্রম ছাড়িয়া যাইতে আমার পা যেন উঠিতেছে না।'

প্রিয়ংবদা কহিল, 'তুমিই যে কেবল তপোবনের বিরহে কাতর, তাহা নহে, তোমার আসন্ন বিয়োগে তপোবনেরও সেই একই দশা —

মৃগের গলি' পড়ে মুখের তৃণ,
ময়ূর নাচে না যে আর,
খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হতে
যেন সে আঁখিজলধার।'

শকুন্তলা কণ্বকে কহিল, 'তাত, এই যে কুটিরপ্রান্তচারিণী গর্ভমন্থরা মৃগবধূ, এ যখন নির্বিঘ্নে প্রসব করিবে তখন সেই প্রিয় সংবাদ নিবেদন করিবার জন্য একটি লোককে আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়ো।'

কণ্ব কহিলেন, 'আমি কখনো ভুলিব না।'

শকুন্তলা পশ্চাৎ হইতে বাধা পাইয়া কহিল, 'আরে, কে আমার কাপড় ধরিয়া টানে!'

কণ্ব কহিলেন, 'বৎসে, —

ইঙ্গুদির তৈল দিতে স্নেহসহকারে
কুশক্ষত হলে মুখ যার,
শ্যামাধান্যমুষ্টি দিয়ে পালিয়াছ যারে
এই মৃগ পুত্র সে তোমার।'

শকুন্তলা তাহাকে কহিল, 'ওরে বাছা, সহবাসপরিত্যাগিনী আমাকে আর কেন অনুসরণ করিস? প্রসব করিয়াই তোর জননী যখন মরিয়াছিল তখন হইতে আমিই তোকে বড়ো করিয়া তুলিয়াছি। এখন আমি চলিলাম, তাত তোকে দেখিবেন, তুই ফিরিয়া যা।'

এইরূপে সমুদয় তরুলতা-মৃগপক্ষীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শকুন্তলা তপোবন ত্যাগ করিয়াছে।

লতার সহিত ফুলের যেরূপ সম্বন্ধ, তপোবনের সহিত শকুন্তলার সেইরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্মন্ত যেমন, তপোবনপ্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। এই মূক প্রকৃতিকে কোনো নাটকের ভিতরে যে এমন প্রধান, এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বোধ করি সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নাই। প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে কথাবার্তা বসাইয়া রূপকনাট্য রচিত হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃত রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্য সাধন করাইয়া লওয়া, এ তো অন্যত্র দেখি নাই। বহিঃপ্রকৃতিকে যেখানে দূর করিয়া, পর করিয়া ভাবে, যেখানে মানুষ আপনার চারি দিকে প্রাচীর তুলিয়া জগতের সর্বত্র কেবল ব্যবধান রচনা করিতে থাকে, সেখানকার সাহিত্যে এরূপ সৃষ্টি সম্ভবপর হইতে পারে না।

উত্তরচরিতেও প্রকৃতির সহিত মানুষের আত্মীয়বৎ সৌহার্দ এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে। রাজপ্রাসাদে থাকিয়াও সীতার প্রাণ সেই অরণ্যের

জন্য কাঁদিতেছে। সেখানে নদী তমসা ও বসন্তবনলক্ষ্মী তাঁহার প্রিয় সখী, সেখানে ময়ূর ও করীশিশু তাঁহার কৃতকপুত্র, তরুলতা তাঁহার পরিজনবর্গ।

টেম্পেস্ট্ নাটকে মানুষ আপনাকে বিশ্বের মধ্যে মঙ্গলভাবে প্রীতি-যোগে প্রসারিত করিয়া বড়ো হইয়া উঠে নাই—বিশ্বকে খর্ব করিয়া, দমন করিয়া, আপনি অধিপতি হইতে চাহিয়াছে। বস্তুত আধিপত্য লইয়া দ্বন্দ্ববিরোধ ও প্রয়াসই টেম্পেস্টের মূল ভাব। সেখানে প্রস্পেরো স্বরাজ্যের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া মন্ত্রবলে প্রকৃতিরাজ্যের উপর কঠোর আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন। সেখানে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে কোনো মতে রক্ষা পাইয়া যে কয়জন প্রাণী তীরে উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মধ্যেও এই শূন্যপ্রায় দ্বীপের ভিতরে আধিপত্য লইয়া ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও গোপনহত্যার চেষ্টা। পরিণামে তাহার নিবৃত্তি হইল, কিন্তু শেষ হইল এ কথা কেহই বলিতে পারে না। দানবপ্রকৃতি ভয়ে শাসনে ও অবসরের অভাবে পীড়িত ক্যালিবানের মতো স্তব্ধ হইয়া রহিল মাত্র, কিন্তু তাহার দন্তমূলে ও নখাগ্রে বিষ রহিয়া গেল। যাহার যাহা প্রাপ্য সম্পত্তি সে তাহা পাইল। কিন্তু সম্পত্তিলাভ তো বাহ্যলাভ, তাহা বিষয়ীসম্প্রদায়ের লক্ষ্য হইতে পারে, কাব্যের তাহা চরম পরিণাম নহে।

টেম্পেস্ট্ নাটকের নামও যেমন তাহার ভিতরকার ব্যাপারও সেইরূপ। মানুষে-প্রকৃতিতে বিরোধ, মানুষে-মানুষে বিরোধ, এবং সে বিরোধের মূলে ক্ষমতালাভের প্রয়াস। ইহার আগাগোড়াই বিক্ষোভ।

মানুষের দুর্বাধ্য প্রবৃত্তি এইরূপ ঝড় তুলিয়া থাকে। শাসন-দমন-পীড়নের দ্বারা এই সকল প্রবৃত্তিকে হিংস্র পশুর মতো সংযত করিয়াও রাখিতে হয়। কিন্তু, এইরূপ বলের দ্বারা বলকে ঠেকাইয়া রাখা, ইহা কেবল একটা উপস্থিতমত কাজ চালাইবার প্রণালীমাত্র। আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ইহাকেই পরিণাম বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না।

সৌন্দর্যের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, মঙ্গলের দ্বারা, পাপ একেবারে ভিতর হইতে বিলুপ্ত বিলীন হইয়া যাইবে, ইহাই আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষা। সংসারে তাহার সহস্র বাধা ব্যতিক্রম থাকিলেও ইহার প্রতি মানবের অন্তরতর লক্ষ্য একটি আছে। সাহিত্য সেই লক্ষ্যসাধনের নিগূঢ় প্রয়াসকে ব্যক্ত করিয়া থাকে। সে ভালোকে সুন্দর, সে শ্রেয়কে প্রিয়, সে পুণ্যকে হৃদয়ের ধন করিয়া তোলে। ফলাফল নির্ণয় ও বিভীষিকা -দ্বারা আমাদিগকে কল্যাণের পথে প্রবৃত্ত রাখা বাহিরের কাজ, তাহা দণ্ডনীতি ও ধর্মনীতির আলোচ্য হইতে পারে কিন্তু উচ্চসাহিত্য অন্তরাত্মার ভিতরের পথটি অবলম্বন করিতে চায়; তাহা স্বভাবনিঃসৃত অশ্রুজলের দ্বারা কলঙ্কক্ষালন করে, আন্তরিক ঘৃণার দ্বারা পাপকে দগ্ধ করে এবং সহজ আনন্দের দ্বারা পুণ্যকে অভ্যর্থনা করে।

কালিদাসও তাঁহার নাটকে দুরন্ত প্রবৃত্তির দাবদাহকে অনুতপ্ত চিত্তের অশ্রুবর্ষণে নির্বাপিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ব্যাধিকে লইয়া অতিমাত্রায় আলোচনা করেন নাই; তিনি তাহার আভাস দিয়াছেন এবং দিয়া তাহার উপরে একটি আচ্ছাদন টানিয়াছেন। সংসারে এরূপ স্থলে যাহা স্বভাবত হইতে পারিত তাহাকে তিনি দুর্বাসার শাপের দ্বারা ঘটাইয়াছেন। নতুবা তাহা এমন একান্তনিষ্ঠুর ও ক্ষোভজনক হইত যে, তাহাতে সমস্ত নাটকের শান্তি ও সামঞ্জস্য ভঙ্গ হইয়া যাইত। শকুন্তলায় কালিদাস যে রসের প্রতি লক্ষ করিয়াছেন এরূপ অত্যুৎকট আন্দোলনে তাহা রক্ষা পাইত না। দুঃখ-বেদনাকে তিনি সমানই রাখিয়াছেন, কেবল বীভৎস কদর্যতাকে কবি আবৃত করিয়াছেন।

কিন্তু কালিদাস সেই আবরণের মধ্যে এতটুকু ছিদ্র রাখিয়াছেন যাহাতে পাপের আভাস পাওয়া যায়। সেই কথার উত্থাপন করি।

পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান। সেই অঙ্কের আরম্ভেই কবি রাজার প্রণয়রঙ্গভূমির যবনিকা ক্ষণকালের জন্য একটুখানি সরাইয়া

দেখাইয়াছেন। রাজপ্রেয়সী হংসপদিকা নেপথ্যে সংগীতশালায় আপন-মনে বসিয়া গান গাহিতেছেন—

নবমধুলোভী ওগো মধুকর,
চূতমঞ্জরী চুমি'
কমলনিবাসে যে প্রীতি পেয়েছ
কেমনে ভুলিলে তুমি ?

রাজান্তঃপুর হইতে ব্যথিত হৃদয়ের এই অশ্রুসিক্ত গান আমাদিগকে বড়ো আঘাত করে। বিশেষ আঘাত করে এইজন্য যে, তাহার পূর্বেই শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের প্রেমলীলা আমাদের চিত্ত অধিকার করিয়া আছে। ইহার পূর্ব অঙ্কেই শকুন্তলা ঋষিবৃদ্ধ কণ্বের আশীর্বাদ ও সমস্ত অরণ্যানীর মঙ্গলাচরণ গ্রহণ করিয়া বড়ো স্নিগ্ধকরুণ, বড়ো পবিত্র-মধুরভাবে পতিগৃহে যাত্রা করিয়াছে। তাহার জন্য যে প্রেমের, যে গৃহের চিত্র আমাদের আশাপটে অঙ্কিত হইয়া উঠে, পরবর্তী অঙ্কের আরম্ভেই সে চিত্রে দাগ পড়িয়া যায়।

বিদূষক যখন জিজ্ঞাসা করিল 'এই গানটির অক্ষরার্থ বুঝিলে কি', রাজা ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জনঃ। আমরা একবার মাত্র প্রণয় করিয়া তাহার পরে ছাড়িয়া দিই, সেইজন্য দেবী বসুমতীকে লইয়া আমি ইহার মহৎ ভর্ৎসনের যোগ্য হইয়াছি। সখে মাধব্য, তুমি আমার নাম করিয়া হংসপদিকাকে বলো, বড়ো নিপুণ-ভাবে তুমি আমাকে ভর্ৎসনা করিয়াছ।··· যাও, বেশ নাগরিকবৃত্তি দ্বারা এই কথাটি তাহাকে বলিবে।'

পঞ্চম অঙ্কের প্রারম্ভে রাজার চপল প্রণয়ের এই পরিচয় নিরর্থক নহে। ইহাতে কবি নিপুণ কৌশলে জানাইয়াছেন ; দুর্বাসার শাপে যাহা ঘটাইয়াছে স্বভাবের মধ্যে তাহার বীজ ছিল। কাব্যের খাতিরে যাহাকে আকস্মিক করিয়া দেখানো হইয়াছে তাহা প্রাকৃতিক।

চতুর্থ অঙ্ক হইতে পঞ্চম অঙ্কে আমরা হঠাৎ আর-এক বাতাসে আসিয়া পড়িলাম। এতক্ষণ আমরা যেন একটি মানসলোকে ছিলাম ;

সেখানকার যে নিয়ম এখানকার সে নিয়ম নহে। সেই তপোবনের সুর এখানকার সুরের সঙ্গে মিলিবে কী করিয়া ? সেখানে যে ব্যাপারটি সহজ সুন্দরভাবে অতি অনায়াসে ঘটিয়াছিল এখানে তাহার কী দশা হইবে, তাহা চিন্তা করিলে আশঙ্কা জন্মে। তাই পঞ্চম অঙ্কের প্রথমেই নাগরিকবৃত্তির মধ্যে যখন দেখিলাম যে, এখানে হৃদয় বড়ো কঠিন, প্রণয় বড়ো কুটিল, এবং মিলনের পথ সহজ নহে, তখন আমাদের সেই বনের সৌন্দর্যস্বপ্ন ভাঙিবার মতো হইল। ঋষিশিষ্য শারঙ্গরব রাজভবনে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, 'যেন অগ্নিবেষ্টিত গৃহের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম।' শারদ্বত কহিলেন, 'তৈলাক্তকে দেখিয়া স্নাত ব্যক্তির, অশুচিকে দেখিয়া শুচি ব্যক্তির, সুপ্তকে দেখিয়া জাগ্রত জনের, এবং বদ্ধকে দেখিয়া স্বাধীন পুরুষের যে ভাব মনে হয়, এই সকল বিষয়ী লোককে দেখিয়া আমার সেইরূপ মনে হইতেছে।' একটা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র লোকের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন ঋষিকুমারগণ তাহা সহজেই অনুভব করিতে পারিলেন। পঞ্চম অঙ্কের আরম্ভে কবি নানাপ্রকার আভাসের দ্বারা আমাদিগকে এইভাবে প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন, যাহাতে শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যান-ব্যাপার অকস্মাৎ অতিমাত্র আঘাত না করে। হংসপদিকার সরল করুণ গীত এই ক্রূরকাণ্ডের ভূমিকা হইয়া রহিল।

তাহার পরে প্রত্যাখ্যান যখন অকস্মাৎ বজ্রের মতো শকুন্তলার মাথার উপরে ভাঙিয়া পড়িল তখন এই তপোবনের দুহিতা বিশ্বস্ত হস্ত হইতে বাণাহত মৃগীর মতো বিস্ময়ে ত্রাসে বেদনায় বিহ্বল হইয়া ব্যাকুলনেত্রে চাহিয়া রহিল। তপোবনের পুষ্পরাশির উপর অগ্নি আসিয়া পড়িল। শকুন্তলাকে অন্তরে-বাহিরে ছায়ায়-সৌন্দর্যে আচ্ছন্ন করিয়া যে একটি তপোবন লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে বিরাজ করিতেছিল এই বজ্রাঘাতে তাহা শকুন্তলার চতুর্দিক হইতে চিরদিনের জন্য বিশ্লিষ্ট হইয়া গেল ; শকুন্তলা একেবারে অনাবৃত হইয়া পড়িল। কোথায় তাত কণ্ব, কোথায় মাতা গোতমী, কোথায় অনসূয়া-প্রিয়ংবদা,

কোথায় সেই সকল তরুলতা-পশুপক্ষীর সহিত স্নেহের সম্বন্ধ, মাধুর্যের যোগ – সেই সুন্দর শান্তি, সেই নির্মল জীবন! এই এক মুহূর্তের প্রলয়াভিঘাতে শকুন্তলার যে কতখানি বিলুপ্ত হইয়া গেল তাহা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাই। নাটকের প্রথম চারি অঙ্কে যে সংগীতধ্বনি উঠিয়াছিল তাহা এক মুহূর্তেই নিঃশব্দ হইয়া গেল।

তাহার পরে শকুন্তলার চতুর্দিকে কী গভীর স্তব্ধতা, কী বিরলতা। যে শকুন্তলা কোমল হৃদয়ের প্রভাবে তাহার চারি দিকের বিশ্ব জুড়িয়া সকলকে আপনার করিয়া থাকিত সে আজ কী একাকিনী। তাহার সেই বৃহৎ শূন্যতাকে শকুন্তলা আপনার একমাত্র মহৎ দুঃখের দ্বারা পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। কালিদাস যে তাহাকে কণ্বের তপোবনে ফিরাইয়া লইয়া যান নাই, ইহা তাঁহার অসামান্য কবিত্বের পরিচয়। পূর্বপরিচিত বনভূমির সহিত তাহার পূর্বের মিলন আর সম্ভবপর নহে। কণ্বাশ্রম হইতে যাত্রাকালে তপোবনের সহিত শকুন্তলার কেবল বাহ্য-বিচ্ছেদমাত্র ঘটিয়াছিল, দুষ্মন্তভবন হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া সে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইল; সে শকুন্তলা আর রহিল না, এখন বিশ্বের সহিত তাহার সম্বন্ধ-পরিবর্তন হইয়া গেছে, এখন তাহাকে তাহার পুরাতন সম্বন্ধের মধ্যে স্থাপন করিলে অসামঞ্জস্য উৎকট নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশিত হইত। এখন এই দুঃখিনীর জন্য তাহার মহৎ দুঃখের উপযোগী বিরলতা আবশ্যক। সখীবিহীন নূতন তপোবনে কালিদাস শকুন্তলার বিরহ-দুঃখের প্রত্যক্ষ অবতারণা করেন নাই। কবি নীরব থাকিয়া শকুন্তলার চারি দিকের নীরবতা ও শূন্যতা আমাদের চিত্তের মধ্যে ঘনীভূত করিয়া দিয়াছেন। কবি যদি শকুন্তলাকে কণ্বাশ্রমের মধ্যে ফিরাইয়া লইয়া এইরূপ চুপ করিয়াও থাকিতেন, তবু সেই আশ্রম কথা কহিত। সেখানকার তরুলতার ক্রন্দন, সখীজনের বিলাপ, আপনি আমাদের অন্তরের মধ্যে ধ্বনিত হইতে থাকিত। কিন্তু অপরিচিত মারীচের তপোবনে সমস্তই আমাদের নিকট স্তব্ধ, নীরব; কেবল বিশ্বনিরহিত শকুন্তলার নিয়মসংযত ধৈর্যগম্ভীর অপরিমেয় দুঃখ আমাদের মানস-

নেত্রের সম্মুখে ধ্যানাসনে বিরাজমান। এই ধ্যানমগ্ন দুঃখের সম্মুখে কবি একাকী দাঁড়াইয়া আপন ওষ্ঠাধরের উপরে তর্জনী স্থাপন করিয়াছেন, এবং সেই নিষেধের সংকেতে সমস্ত প্রশ্নকে নীরব ও সমস্ত বিশ্বকে দূরে অপসারিত করিয়া রাখিয়াছেন।

দুষ্মন্ত এখন অনুতাপে দগ্ধ হইতেছেন। এই অনুতাপ তপস্যা। এই অনুতাপের ভিতর দিয়া শকুন্তলাকে লাভ না করিলে শকুন্তলা-লাভের কোনো গৌরব ছিল না। হাতে পাইলেই যে পাওয়া তাহা পাওয়া নহে; লাভ করা অত সহজ ব্যাপার নয়। যৌবনমত্ততার আকস্মিক ঝড়ে শকুন্তলাকে এক মুহূর্তে উড়াইয়া লইলে তাহাকে সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যাইত না। লাভ করিবার প্রকৃষ্ট প্রণালী সাধনা, তপস্যা। যাহা অনায়াসেই হস্তগত হইয়াছিল তাহা অনায়াসেই হারাইয়া গেল। যাহা আবেশের মুষ্টিতে আহৃত হয় তাহা শিথিল-ভাবেই স্খলিত হইয়া পড়ে। সেইজন্য কবি পরস্পরকে যথার্থভাবে চিরন্তনভাবে লাভের জন্য দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে দীর্ঘ দুঃসহ তপস্যায় প্রবৃত্ত করিলেন। রাজসভায় প্রবেশ করিবামাত্র দুষ্মন্ত যদি তৎক্ষণাৎ শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতেন তবে শকুন্তলা হংসপদিকার দলবৃদ্ধি করিয়া তাঁহার অবরোধের একপ্রান্তে স্থান পাইত। বহুবল্লভ রাজার এমন কত সুখলব্ধ প্রেয়সী ক্ষণকালীন সৌভাগ্যের স্মৃতিটুকু লইয়া অনাদরে অন্ধকারে অনাবশ্যক জীবন যাপন করিতেছে। সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জনঃ।

শকুন্তলার সৌভাগ্যবশতই দুষ্মন্ত নিষ্ঠুর কঠোরতার সহিত তাহাকে পরিহার করিয়াছিলেন। নিজের উপর নিজের সেই নিষ্ঠুরতার প্রত্যভিঘাতেই দুষ্মন্তকে শকুন্তলা সম্বন্ধে আর অচেতন থাকিতে দিল না। অহরহ পরমবেদনার উত্তাপে শকুন্তলা তাঁহার বিগলিত হৃদয়ের সহিত মিশ্রিত হইতে লাগিল, তাঁহার অন্তর-বাহিরকে ওতপ্রোত করিয়া দিল। এমন অভিজ্ঞতা রাজার জীবনে কখনো হয় নাই, তিনি যথার্থ প্রেমের উপায় ও অবসর পান নাই। রাজা বলিয়া এ সম্বন্ধে

তিনি হতভাগ্য। ইচ্ছা তাঁহার অনায়াসেই মিটে বলিয়াই সাধনার ধন তাঁহার অনায়ত্ত ছিল। এবারে বিধাতা কঠিন দুঃখের মধ্যে ফেলিয়া রাজাকে প্রকৃত প্রেমের অধিকারী করিয়াছেন; এখন হইতে তাঁহার নাগরিকবৃত্তি একেবারে বন্ধ।

এইরূপে কালিদাস পাপকে হৃদয়ের ভিতর দিক হইতে আপনার অনলে আপনি দগ্ধ করিয়াছেন; বাহির হইতে তাহাকে ছাইচাপা দিয়া রাখেন নাই। সমস্ত অমঙ্গলের নিঃশেষে অগ্নিসৎকার করিয়া তবে নাটকখানি সমাপ্ত হইয়াছে; পাঠকের চিত্ত একটি সংশয়হীন পরিপূর্ণ পরিণতির মধ্যে শান্তি লাভ করিয়াছে। বাহির হইতে অকস্মাৎ বীজ পড়িয়া যে বিষবৃক্ষ জন্মে ভিতর হইতে গভীরভাবে তাহাকে নির্মূল না করিলে তাহার উচ্ছেদ হয় না। কালিদাস দুষ্মন্ত-শকুন্তলার বাহিরের মিলনকে দুঃখখনিত পথ দিয়া লইয়া গিয়া অভ্যন্তরের মিলনে সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। এইজন্য কবি গেটে বলিয়াছেন, তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, মর্ত্য এবং স্বর্গ যদি কেহ একাধারে পাইতে চায় তবে শকুন্তলায় তাহা পাওয়া যাইবে।

টেম্পেস্টে ফার্দিনান্দের প্রেমকে প্রস্পেরো কৃচ্ছ্রসাধনদ্বারা পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সে বাহিরের ক্লেশ। কেবল কাঠের বোঝা বহন করিয়া পরীক্ষার শেষ হয় না। আভ্যন্তরিক কী উত্তাপে ও পেষণে অঙ্গার হীরক হইয়া উঠে কালিদাস তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি কালিমাকে নিজের ভিতর হইতেই উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন, তিনি ভঙ্গুরতাকে চাপ-প্রয়োগে দৃঢ়তা দান করিয়াছেন। শকুন্তলায় আমরা অপরাধের সার্থকতা দেখিতে পাই; সংসারে বিধাতার বিধানে পাপও যে কী মঙ্গলকর্মে নিযুক্ত আছে কালিদাসের নাটকে আমরা তাহার সুপরিণত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। অপরাধের অভিঘাত ব্যতীত মঙ্গল তাহার শাশ্বত দীপ্তি ও শক্তি লাভ করে না।

শকুন্তলাকে আমরা কাব্যের আরম্ভে একটি নিষ্কলুষ সৌন্দর্য-

লোকের মধ্যে দেখিলাম ; সেখানে সরল আনন্দে সে আপন সখীজন ও তরুলতামৃগের সহিত মিশিয়া আছে। সেই স্বর্গের মধ্যে অলক্ষ্যে অপরাধ আসিয়া প্রবেশ করিল, এবং স্বর্গসৌন্দর্য কীটদষ্ট পুষ্পের ন্যায় বিদীর্ণ স্রস্ত হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার পরে লজ্জা, সংশয়, দুঃখ, বিচ্ছেদ, অনুতাপ। এবং সর্বশেষে বিশুদ্ধতর উন্নততর স্বর্গলোকে ক্ষমা, প্রীতি ও শান্তি। শকুন্তলাকে একত্রে Paradise Lost এবং Paradise Regained বলা যাইতে পারে।

প্রথম স্বর্গটি বড়ো মৃদু এবং অরক্ষিত ; যদিও তাহা সুন্দর এবং সম্পূর্ণ বটে, কিন্তু পদ্মপত্রে শিশিরের মতো তাহা সদ্যঃপাতী। এই সংকীর্ণ সম্পূর্ণতার সৌকুমার্য হইতে মুক্তি পাওয়াই ভালো, ইহা চির-দিনের নহে এবং ইহাতে আমাদের সর্বাঙ্গীণ তৃপ্তি নাই। অপরাধ মত্ত গজের ন্যায় আসিয়া এখানকার পদ্মপত্রের বেড়া ভাঙিয়া দিল, আলো-ড়নের বিক্ষোভে সমস্ত চিত্তকে উন্মথিত করিয়া তুলিল। সহজ স্বর্গ এইরূপে সহজেই নষ্ট হইল, বাকি রহিল সাধনার স্বর্গ। অনুতাপের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, সেই স্বর্গ যখন জিত হইল তখন আর কোনো শঙ্কা রহিল না। এ স্বর্গ শাশ্বত।

মানুষের জীবন এইরূপ— শিশু যে সরল স্বর্গে থাকে তাহা সুন্দর, তাহা সম্পূর্ণ, কিন্তু ক্ষুদ্র। মধ্যবয়সের সমস্ত বিক্ষেপ ও বিক্ষোভ, সমস্ত অপরাধের আঘাত ও অনুতাপের দাহ জীবনের পূর্ণবিকাশের পক্ষে আবশ্যক। শিশুকালের শান্তির মধ্য হইতে বাহির হইয়া সংসারের বিরোধবিপ্লবের মধ্যে না পড়িলে পরিণত বয়সের পরিপূর্ণ শান্তির আশা বৃথা। প্রভাতের স্নিগ্ধতাকে মধ্যাহ্নতাপে দগ্ধ করিয়া তবেই সায়াহ্নের লোকলোকান্তরব্যাপী বিরাম। পাপে-অপরাধে ক্ষণ-ভঙ্গুরকে ভাঙিয়া দেয় এবং অনুতাপে-বেদনায় চিরস্থায়ীকে গড়িয়া তোলে। শকুন্তলা কাব্যে কবি সেই স্বর্গচ্যুতি হইতে স্বর্গপ্রাপ্তি পর্যন্ত সমস্ত বিবৃত করিয়াছেন।

বিশ্বপ্রকৃতি যেমন বাহিরে প্রশান্ত সুন্দর, কিন্তু তাহার প্রচণ্ড

শক্তি অহরহ অভ্যন্তরে কাজ করে, অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকখানির মধ্যে আমরা তাহার প্রতিরূপ দেখিতে পাই। এমন আশ্চর্য সংযম আমরা আর কোনো নাটকেই দেখি নাই। প্রবৃত্তির প্রবলতা প্রকাশের অবসরমাত্র পাইলেই য়ুরোপীয় কবিগণ যেন উদ্দাম হইয়া উঠেন। প্রবৃত্তি যে কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে তাহা অতিশয়োক্তিদ্বারা প্রকাশ করিতে তাঁহারা ভালোবাসেন। শেক্‌স্‌পীয়রের রোমিয়ো-জুলিয়েট প্রভৃতি নাটকে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শকুন্তলার মতো এমন প্রশান্ত-গভীর, এমন সংযত-সম্পূর্ণ নাটক শেক্‌স্‌পীয়রের নাট্যাবলীর মধ্যে একখানিও নাই। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মধ্যে যেটুকু প্রেমালাপ আছে, তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, তাহার অধিকাংশই আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে, কালিদাস কোথাও রাশ আলগা করিয়া দেন নাই। অন্য কবি যেখানে লেখনীকে দৌড় দিবার অবসর অন্বেষণ করিত তিনি সেখানেই তাহাকে হঠাৎ নিরস্ত করিয়াছেন। দুষ্মন্ত তপোবন হইতে রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়া শকুন্তলার কোনো খোঁজ লইতেছেন না। এই উপলক্ষে বিলাপ-পরিতাপের কথা অনেক হইতে পারিত, তবু শকুন্তলার মুখে কবি একটি কথাও দেন নাই। কেবল দুর্বাসার প্রতি আতিথ্যে অনবধান লক্ষ্য করিয়া হতভাগিনীর অবস্থা আমরা যথাসম্ভব কল্পনা করিতে পারি। শকুন্তলার প্রতি কণ্বের একান্ত স্নেহ বিদায়কালে কী সকরুণ গাম্ভীর্য ও সংযমের সহিত কত অল্প কথাতেই ব্যক্ত হইয়াছে। অনসূয়া-প্রিয়ংবদার সখীবিচ্ছেদবেদনা ক্ষণে ক্ষণে দুটি-একটি কথায় যেন বাঁধ লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিয়া তখনি আবার অন্তরের মধ্যে নিরস্ত হইয়া যাইতেছে। প্রত্যাখ্যানদৃশ্যে ভয়, লজ্জা, অভিমান, অনুনয়, ভর্ৎসনা, বিলাপ, সমস্তই আছে, অথচ কত অল্পের মধ্যে। যে শকুন্তলা সুখের সময় সরল অসংশয়ে আপনাকে বিসর্জন দিয়াছিল. দুঃখের সময় দারুণ অপমানকালে সে যে আপন হৃদয়বৃত্তির অপ্রগল্‌ভ মর্যাদা এমন আশ্চর্য সংযমের সহিত রক্ষা করিবে, এ কে মনে করিয়াছিল? এই প্রত্যাখ্যানের পরবর্তী নীরবতা কী ব্যাপক,

কী গভীর ! কণ্ব নীরব, অনসূয়া-প্রিয়ংবদা নীরব, মালিনীতীরতপোবন নীরব, সর্বাপেক্ষা নীরব শকুন্তলা। হৃদয়বৃত্তিকে আলোড়ন করিয়া তুলিবার এমন অবসর কি আর-কোনো নাটকে এমন নিঃশব্দে উপেক্ষিত হইয়াছে ? দুষ্মন্তের অপরাধকে দুর্বাসার শাপের আচ্ছাদনে আবৃত করিয়া রাখা, সেও কবির সংযম। দুষ্টপ্রবৃত্তির দুরন্তপনাকে অবারিতভাবে উচ্ছৃঙ্খলভাবে দেখাইবার যে প্রলোভন তাহাও কবি সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন —

ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্
মৃদুনি মৃগশরীরে পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ।

দুষ্মন্ত যখন কাব্যের মধ্যে বিপুল বিক্ষোভের কারণ লইয়া মত্ত হইয়া প্রবেশ করিলেন তখন কবির অন্তরের মধ্যে এই ধ্বনি উঠিল —

মূর্তো বিঘ্নস্তপস ইব নো ভিন্নসারঙ্গযূথো
ধর্মারণ্যং প্রবিশতি গজঃ স্যন্দনালোকভীতঃ।

তপস্যার মূর্তিমান বিঘ্নের ন্যায় গজরাজ ধর্মারণ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এইবার বুঝি কাব্যের শান্তিভঙ্গ হয়। কালিদাস তখনই ধর্মারণ্যের, কাব্যকাননের, এই মূর্তিমান বিঘ্নকে শাপের বন্ধনে সংযত করিলেন ; ইহাকে দিয়া তাঁহার পদ্মবনের পঙ্ক আলোড়িত করিয়া তুলিতে দিলেন না।

য়ুরোপীয় কবি হইলে এইখানে সাংসারিক সত্যের নকল করিতেন ; সংসারে ঠিক যেমন, নাটকে তাহাই ঘটাইতেন। শাপ বা অলৌকিক ব্যাপারের দ্বারা কিছুই আবৃত করিতেন না। যেন তাঁহাদের ’পরে সমস্ত দাবি কেবল সংসারের, কাব্যের কোনো দাবি নাই। কালিদাস সংসারকে কাব্যের চেয়ে বেশি খাতির করেন নাই ; পথে-ঘাটে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাকে নকল করিতেই হইবে, এমন দাসখত তিনি কাহাকেও লিখিয়া দেন নাই — কিন্তু কাব্যের শাসন কবিকে মানতেই হইবে। কাব্যের প্রত্যেক ঘটনাটিকে সমস্ত কাব্যের সহিত তাঁহাকে খাপ খাওয়াইয়া লইতেই হইবে। তিনি সত্যের আভ্যন্তরিক মূর্তিকে

অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সত্যের বাহ্যমূর্তিকে তাঁহার কাব্যসৌন্দর্যের সহিত সংগত করিয়া লইয়াছেন। তিনি অনুতাপ ও তপস্যাকে সমুজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন, কিন্তু পাপকে তিরস্করণীর দ্বারা কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন করিয়াছেন। শকুন্তলা নাটক প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে একটি শান্তি সৌন্দর্য ও সংযমের দ্বারা পরিবেষ্টিত, এরূপ না করিলে তাহা বিপর্যস্ত হইয়া যাইত। সংসারের নকল ঠিক হইত, কিন্তু কাব্যলক্ষ্মী সুকঠোর আঘাত পাইতেন। কবি কালিদাসের করুণনিপুণ লেখনীর দ্বারা তাহা কখনোই সম্ভবপর হইত না।

কবি এইরূপে বাহিরের শান্তি ও সৌন্দর্যকে কোথাও অতিমাত্র ক্ষুব্ধ না করিয়া তাঁহার কাব্যের আভ্যন্তরিক শক্তিকে নিস্তব্ধতার মধ্যে সর্বদা সক্রিয় ও সবল করিয়া রাখিয়াছেন। এমন-কি তাঁহার তপোবনের বহিঃপ্রকৃতিও সর্বত্র অন্তরের কাজেই যোগ দিয়াছে। কখনো বা তাহা শকুন্তলার যৌবনলীলায় আপনার লীলামাধুর্য অর্পণ করিয়াছে, কখনো বা মঙ্গল আশীর্বাদের সহিত আপনার কল্যাণমর্মর মিশ্রিত করিয়াছে, কখনো বা বিচ্ছেদকালীন ব্যাকুলতার সহিত আপনার মূক বিদায়বাক্যে করুণা জড়িত করিয়া দিয়াছে এবং অপরূপ মন্ত্রবলে শকুন্তলার চরিত্রের মধ্যে একটি পবিত্র নির্মলতা—একটি স্নিগ্ধ মাধুর্যের রশ্মি নিয়ত বিকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। এই শকুন্তলা কাব্যে নিস্তব্ধতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু সকলের চেয়ে নিস্তব্ধভাবে অথচ ব্যাপকভাবে কবির তপোবন এই কাব্যের মধ্যে কাজ করিয়াছে। সে কাজ টেম্পেস্টের এরিয়েলের ন্যায় শাসনবদ্ধ দাসত্বের বাহ্য কাজ নহে; তাহা সৌন্দর্যের কাজ, প্রীতির কাজ, আত্মীয়তার কাজ, অভ্যন্তরের নিগূঢ় কাজ।

টেম্পেস্টে শক্তি, শকুন্তলায় শান্তি; টেম্পেস্টে বলের দ্বারা জয়, শকুন্তলায় মঙ্গলের দ্বারা সিদ্ধি; টেম্পেস্টে অর্ধপথে ছেদ, শকুন্তলায় সম্পূর্ণতায় অবসান। টেম্পেস্টের মিরান্দা সরল মাধুর্যে গঠিত, কিন্তু সে সরলতার প্রতিষ্ঠা অজ্ঞতা-অনভিজ্ঞতার উপরে। শকুন্তলার সরলতা

অপরাধে, দুঃখে, অভিজ্ঞতায়, ধৈর্যে ও ক্ষমায় পরিপক্ক গম্ভীর ও স্থায়ী। গেটের সমালোচনা অনুসরণ করিয়া পুনর্বার বলি, শকুন্তলায় আরম্ভের তরুণ সৌন্দর্য মঙ্গলময় পরম পরিণতিতে সরলতা লাভ করিয়া মর্ত্যকে স্বর্গের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিয়াছে।

'বঙ্গদর্শন' ১৩০৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তপোবন

আধুনিক সভ্যতালক্ষ্মী যে-পদ্মের উপর বাস করেন সেটি ইঁট কাঠে তৈরি, সেটি শহর। উন্নতির সূর্য যতই মধ্যগগনে উঠছে ততই তার দলগুলি একটি একটি করে খুলে গিয়ে ক্রমশই চারি দিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। চুন সুরকির জয়যাত্রাকে বসুন্ধরা কোথাও ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না।

এই শহরেই মানুষ বিদ্যা শিখছে, বিদ্যা প্রয়োগ করছে, ধন জমাচ্ছে, ধন খরচ করছে, নিজেকে নানাদিক থেকে শক্তি ও সম্পদে পূর্ণ করে তুলছে। এই সভ্যতায় সকলের চেয়ে যা কিছু শ্রেষ্ঠ পদার্থ তা নগরের সামগ্রী।…

কিন্তু ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ শহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠে নি। সেখানে গাছপালা নদী সরোবর মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল। সেখানে মানুষও ছিল, ফাঁকাও ছিল, ঠেলাঠেলি ছিল না। অথচ এই ফাঁকায় ভারতবর্ষের চিত্তকে জড়প্রায় করে দেয় নি, বরঞ্চ তার চেতনাকে আরও উজ্জ্বল করে দিয়েছিল। এরকম ঘটনা জগতে আর কোথাও ঘটেছে বলে দেখা যায় না।…

সমতল আর্যাবর্তের অরণ্যভূমিও ভারতবর্ষকে একটি বিশেষ সুযোগ দিয়েছিল। ভারতবর্ষের বুদ্ধিকে সে জগতের অন্তরতম রহস্যলোক-আবিষ্কারে প্রেরণ করেছিল। সেই মহাসমুদ্রতীরের নানা সুদূর দ্বীপ-দ্বীপান্তর থেকে সে যে-সমস্ত সম্পদ আহরণ করে এনেছিল, সমস্ত মানুষকেই দিনে দিনে তার প্রয়োজন স্বীকার করতেই হবে। যে

ওষধি-বনস্পতির মধ্যে প্রকৃতির প্রাণের ক্রিয়া দিনে রাত্রে ও ঋতুতে ঋতুতে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে এবং প্রাণের লীলা নানা অপরূপ ভঙ্গিতে, ধ্বনিতে ও রূপবৈচিত্র্যে নিরন্তর নূতন নূতন ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, তারই মাঝখানে ধ্যানপরায়ণ চিত্ত নিয়ে যাঁরা ছিলেন তাঁরা নিজের চারি দিকেই একটি আনন্দময় রহস্যকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। সেইজন্যে তাঁরা এত সহজে বলতে পেরেছিলেন — যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিসৃতং, এই যা-কিছু সমস্তই পরমপ্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে। তাঁরা স্বরচিত ইঁট কাঠ লোহার কঠিন খাঁচার মধ্যে ছিলেন না, তাঁরা যেখানে বাস করতেন সেখানে বিশ্বব্যাপী বিরাট জীবনের সঙ্গে তাঁদের জীবনের অবারিত যোগ ছিল। এই বন তাঁদের ছায়া দিয়েছে, ফলফুল দিয়েছে, কুশ-সমিৎ জুগিয়েছে, তাঁদের প্রতিদিনের সমস্ত কর্ম অবকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে এই বনের আদান-প্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল। এই উপায়েই নিজের জীবনকে তাঁরা চারি দিকের একটি বড়ো জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে জানতে পেরেছিলেন। চতুর্দিককে তাঁরা শূন্য বলে, নির্জীব বলে, পৃথক বলে জানতেন না। বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়ে আলোক বাতাস অন্নজল প্রভৃতি যে-সমস্ত দান তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন সেই দানগুলি যে মাটির নয়, গাছের নয়, শূন্য আকাশের নয়, একটি চেতনাময় অনন্ত আনন্দের মধ্যেই তার মূল প্রস্রবণ, এইটি তাঁরা একটি সহজ অনুভবের দ্বারা জানতে পেরেছিলেন। সেইজন্যেই নিশ্বাস আলো অন্নজল সমস্তই তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে, ভক্তির সঙ্গে, গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্যেই নিখিলচরাচরকে নিজের প্রাণের দ্বারা, চেতনার দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা, বোধের দ্বারা, নিজের আত্মার সঙ্গে আত্মীয়রূপে এক করে পাওয়াই ভারতবর্ষের পাওয়া।

এর থেকেই বোঝা যাবে, বন ভারতবর্ষের চিত্তকে নিজের নিভৃত ছায়ার মধ্যে, নিগূঢ় প্রাণের মধ্যে, কেমন করে পালন করেছে। ভারতবর্ষে যে দুই বড়ো বড়ো প্রাচীনযুগ চলে গেছে, বৈদিকযুগ ও বৌদ্ধযুগ, সেই দুই যুগকে বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করেছে। কেবল বৈদিক

ঋষিরা নন, ভগবান বুদ্ধও কত আম্রবন, কত বেণুবনে তাঁর উপদেশ বর্ষণ করেছেন। রাজপ্রাসাদে তাঁর স্থান কুলোয় নি, বনই তাঁকে বুকে করে নিয়েছিল।

ক্রমশ ভারতবর্ষে রাজ্য-সাম্রাজ্য নগর-নগরী স্থাপিত হয়েছে, দেশ-বিদেশের সঙ্গে তার পণ্য-আদানপ্রদান চলেছে, অন্নলোলুপ কৃষিক্ষেত্র অল্পে অল্পে ছায়ানিভৃত অরণ্যগুলিকে দূর হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেই প্রতাপশালী ঐশ্বর্যপূর্ণ যৌবনদৃপ্ত ভারতবর্ষ বনের কাছে নিজের ঋণ স্বীকার করতে কোনো দিন লজ্জাবোধ করে নি। তপস্যাকেই সে সকল প্রয়াসের চেয়ে বেশি সম্মান দিয়েছে, এবং বনবাসী পুরাতন তপস্বীদেরই আপনাদের আদি পুরুষ বলে জেনে ভারতবর্ষের রাজা মহারাজাও গৌরব বোধ করেছেন। ভারতবর্ষের পুরাণকথায় যা-কিছু মহৎ আশ্চর্য পবিত্র, যা-কিছু শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য, সমস্তই সেই প্রাচীন তপোবন-স্মৃতির সঙ্গেই জড়িত। বড়ো বড়ো রাজার রাজত্বের কথা সে মনে করে রাখবার জন্যে চেষ্টা করে নি, কিন্তু নানা বিপ্লবের ভিতর দিয়েও বনের সামগ্রীকেই তার প্রাণের সামগ্রী করে আজ পর্যন্ত সে বহন করে এসেছে। মানব-ইতিহাসে এইটেই হচ্ছে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব।

ভারতবর্ষে বিক্রমাদিত্য যখন রাজা, উজ্জয়িনী যখন মহানগরী, কালিদাস যখন কবি, তখন এ দেশে তপোবনের যুগ চলে গেছে। তখন মানবের মহামেলার মাঝখানে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। তখন চীন হূন শক পারসিক গ্রীক রোমক সকলে আমাদের চারি দিকে ভিড় করে এসেছে। তখন জনকের মতো রাজা এক দিকে স্বহস্তে লাঙল নিয়ে চাষ করছেন, অন্য দিকে দেশ-দেশান্তর হতে আগত জ্ঞান-পিপাসুদের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন, এ দৃশ্য দেখবার আর কাল ছিল না। কিন্তু সেদিনকার ঐশ্বর্যমদগর্বিত যুগেও তখনকার শ্রেষ্ঠ কবি তপোবনের কথা কেমন করে বলেছেন তা দেখলেই বোঝা যায় যে,

তপোবন যখন আমাদের দৃষ্টির বাহিরে গেছে তখনো কতখানি আমাদের হৃদয় জুড়ে বসেছে।

কালিদাস যে বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কবি, তা তাঁর তপোবনচিত্র থেকেই সপ্রমাণ হয়। এমন পরিপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে তপোবনের ধ্যানকে আর কে মূর্তিমান করতে পেরেছে!

রঘুবংশ কাব্যের যবনিকা যখনই উদ্‌ঘাটিত হল তখন প্রথমেই তপোবনের শান্ত সুন্দর পবিত্র দৃশ্যটি আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

সেই তপোবনের বনান্তর হতে কুশ সমিৎ ফল আহরণ করে তপস্বীরা আসছেন এবং যেন একটি অদৃশ্য অগ্নি তাঁদের প্রত্যুদ্‌গমন করছে। সেখানে হরিণগুলি ঋষিপত্নীদের সন্তানের মতো; তারা নীবারধান্যের অংশ পায় এবং নিঃসংকোচে কুটিরের দ্বার রোধ করে পড়ে থাকে। মুনি-কন্যারা গাছে জল দিচ্ছেন এবং আলবাল যেমনি জলে ভরে উঠছে অমনি তাঁরা সরে যাচ্ছেন। পাখিরা নিঃশঙ্কমনে আলবালের জল খেতে আসে, এই তাঁদের অভিপ্রায়। রৌদ্র পড়ে এসেছে, নীবারধান্য কুটিরের প্রাঙ্গণে রাশীকৃত, এবং সেখানে হরিণরা শুয়ে রোমন্থন করছে। আহুতির সুগন্ধ ধূম বাতাসে প্রবাহিত হয়ে এসে আশ্রমোন্মুখ অতিথি-দের সর্বশরীর পবিত্র করে দিচ্ছে।

তরুলতা পশুপক্ষী সকলের সঙ্গে মানুষের মিলনের পূর্ণতা, এই হচ্ছে এর ভিতরকার ভাব।

সমস্ত অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের মধ্যে, ভোগলালসানিষ্ঠুর রাজ-প্রাসাদকে ধিক্‌কার দিয়ে যে একটি তপোবন বিরাজ করছে তারও মূল সুরটি হচ্ছে ঐ, চেতন অচেতন সকলেরই সঙ্গে মানুষের আত্মীয়-সম্বন্ধের পবিত্র মাধুর্য।

কাদম্বরীতে তপোবনের বর্ণনায় কবি লিখছেন—সেখানে বাতাসে লতাগুলি মাথা নত করে প্রণাম করছে, গাছগুলি ফুল ছড়িয়ে পূজা করছে, কুটিরের অঙ্গনে শ্যামাক ধান শুকোবার জন্যে মেলে দেওয়া

আছে, সেখানে আমলক লবলী লবঙ্গ কদলী বদরী প্রভৃতি ফল সংগ্রহ করা হয়েছে ; বটুদের অধ্যয়নে বনভূমি মুখরিত, বাচাল শুকেরা অবিরত-শ্রবণের দ্বারা অভ্যস্ত আহুতিমন্ত্র উচ্চারণ করছে, অরণ্যকুক্কুটেরা বৈশ্বদেব-বলিপিণ্ড আহার করছে, নিকটে জলাশয় থেকে কলহংসশাবকেরা এসে নীবারবলি খেয়ে যাচ্ছে ; হরিণীরা জিহ্বাপল্লব দিয়ে মুনিবালকদের লেহন করছে।

এর ভিতরকার কথাটা হচ্ছে ঐ। তরুলতা জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ দূর করে তপোবন প্রকাশ পাচ্ছে, এই পুরানো কথাই আমাদের দেশে বরাবর চলে এসেছে।

কেবল তপোবনের চিত্রেই যে এই ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তা নয়। মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সম্মিলনই আমাদের দেশের সমস্ত প্রসিদ্ধ কাব্যের মধ্যে পরিস্ফুট। যে-সকল ঘটনা মানবচরিত্রকে আশ্রয় করে ব্যক্ত হতে থাকে তাই নাকি প্রধানত নাটকের উপাদান, এইজন্যেই অন্য দেশের সাহিত্যে দেখতে পাই বিশ্বপ্রকৃতিকে নাটকে কেবল আভাসে রক্ষা করা হয় মাত্র, তার মধ্যে তাকে বেশি জায়গা দেবার অবকাশ থাকে না। আমাদের দেশের প্রাচীন যে নাটকগুলি আজ পর্যন্ত খ্যাতি রক্ষা করে আসছে তাতে দেখতে পাই, প্রকৃতিও নাটকের মধ্যে নিজের অংশ থেকে বঞ্চিত হয় না।

মানুষকে বেষ্টন করে এই যে জগৎপ্রকৃতি আছে, এ যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে মানুষের সকল চিন্তা সকল কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। মানুষের লোকালয় যদি কেবলই একান্ত মানবময় হয়ে ওঠে, এর ফাঁকে ফাঁকে যদি প্রকৃতি কোনো মতে প্রবেশাধিকার না পায়, তাহলে আমাদের চিন্তা ও কর্ম ক্রমশ কলুষিত ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে নিজের অতলস্পর্শ আবর্জনার মধ্যে আত্মহত্যা করে মরে। এই যে প্রকৃতি আমাদের মধ্যে নিত্যনিয়ত কাজ করছে অথচ দেখাচ্ছে যেন সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন আমরাই সব মস্ত কাজের লোক আর সে বেচারা নিতান্তই একটা বাহার মাত্র, এই প্রকৃতিকে আমাদের দেশের

কবিরা বেশ করে চিনে নিয়েছেন। এই প্রকৃতি মানুষের সমস্ত সুখ-দুঃখের মধ্যে যে অনন্তের সুরটি মিলিয়ে রাখছে, সেই সুরটিকে আমাদের দেশের প্রাচীন কবিরা সর্বদাই তাঁদের কাব্যের মধ্যে বাজিয়ে রেখেছেন।

ঋতুসংহার কালিদাসের কাঁচা বয়সের লেখা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর মধ্যে তরুণ-তরুণীর যে মিলনসংগীত আছে তাতে স্বর-গ্রাম লালসার নীচের সপ্তক থেকেই শুরু হয়েছে, শকুন্তলা-কুমার-সম্ভবের মতো তপস্যার উচ্চতম সপ্তকে গিয়ে পৌঁছোয় নি।

কিন্তু কবি নবযৌবনের এই লালসাকে প্রকৃতির বিচিত্র ও বিরাট সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে মুক্ত আকাশের মাঝখানে তাকে ঝংকৃত করে তুলেছেন। ধারাযন্ত্র-মুখরিত নিদাঘদিনান্তের চন্দ্রকিরণ এর মধ্যে আপনার সুরটুকু যোজনা করেছে, বর্ষায় নবজলসেকে ছিন্ন-তাপ বনান্তে পবনচলিত কদম্বশাখা এর ছন্দে আন্দোলিত ; আপক্ক-শালি-রুচিরা শারদলক্ষ্মী তাঁর হংসরবনূপুরধ্বনিকে এর তালে তালে মন্দ্রিত করেছেন, এবং বসন্তের দক্ষিণবায়ুচঞ্চল কুসুমিত আম্রশাখার কলমর্মর এরই তানে তানে বিস্তীর্ণ।

বিরাট প্রকৃতির মাঝখানে যেখানে যার স্বাভাবিক স্থান সেখানে তাকে স্থাপন করে দেখলে তার অত্যুগ্রতা থাকে না, সেইখান থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে কেবলমাত্র মানুষের গণ্ডির মধ্যে সংকীর্ণ করে দেখলে তাকে ব্যাধির মতো অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং রক্তবর্ণ দেখতে হয়। শেক্‌স্‌পীয়রের দুই-একটি খণ্ডকাব্য আছে, নরনারীর আসক্তি তার বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু সেই সকল কাব্যে আসক্তিই একেবারে একান্ত, তার চার দিকে আর-কিছুরই স্থান নেই — আকাশ নেই, বাতাস নেই, প্রকৃতির যে গীতগন্ধবর্ণবিচিত্র বিশাল আবরণে বিশ্বের সমস্ত লজ্জা রক্ষা করে আছে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এইজন্যে সে সকল কাব্যে প্রবৃত্তির উন্মত্ততা অত্যন্ত দুঃসহরূপে প্রকাশ পাচ্ছে।

কুমারসম্ভবে তৃতীয় সর্গে যেখানে মদনের আকস্মিক আবির্ভাবে যৌবনচাঞ্চল্যের উদ্দীপনা বর্ণিত হয়েছে, সেখানে কালিদাস উন্মত্ততাকে

একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যেই সর্বময় করে দেখাবার প্রয়াসমাত্র পান নি। আতশ-কাচের ভিতর দিয়ে একটি বিন্দুমাত্রে সূর্যকিরণ সংহত হয়ে পড়লে সেখানে আগুন জ্বলে ওঠে, কিন্তু সেই সূর্যকিরণ যখন আকাশের সর্বত্র স্বভাবত ছড়িয়ে থাকে তখন সে তাপ দেয় বটে, কিন্তু দগ্ধ করে না। কালিদাস বসন্ত-প্রকৃতির সর্বব্যাপী যৌবনলীলার মাঝখানে হরপার্বতীর মিলনচাঞ্চল্যকে নিবিষ্ট করে তার সম্ভ্রম রক্ষা করেছেন।

কালিদাস পুষ্পধনুর জ্যা-নির্ঘোষকে বিশ্বসংগীতের সুরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ও বেসুরো করে বাজান নি। যে পটভূমিকার উপরে তিনি তাঁর ছবিটি এঁকেছেন সেটি তরুলতা পশুপক্ষীকে নিয়ে সমস্ত আকাশে অতি বিচিত্রবর্ণে বিস্তারিত।

কেবল তৃতীয় সর্গ নয়, সমস্ত কুমারসম্ভব কাব্যটিই একটি বিশ্ব-ব্যাপী পটভূমিকার উপরে অঙ্কিত। এই কাব্যের ভিতরকার কথাটি একটি গভীর এবং চিরন্তন কথা। যে পাপদৈত্য কোথা থেকে প্রবল হয়ে উঠে হঠাৎ স্বর্গলোককে ছারখার করে দেয় তাকে পরাভূত করবার মতো বীরত্ব কোন্ উপায়ে জন্মগ্রহণ করে।

এই সমস্যাটি মানুষের চিরকালের সমস্যা। প্রত্যেক লোকের জীবনের সমস্যাও এই বটে, আবার এই সমস্যা সমস্ত জাতির মধ্যে নূতন নূতন মূর্তিতে নিজেকে প্রকাশ করে।

কালিদাসের সময়েও একটি সমস্যা ভারতবর্ষে অত্যন্ত উৎকট হয়ে দেখা দিয়েছিল, তা কবির কাব্য পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রাচীন-কালে হিন্দুসমাজে জীবনযাত্রায় যে একটি সরলতা ও সংযম ছিল তখন সেটি ভেঙে এসেছিল। রাজারা তখন রাজধর্ম বিস্মৃত হয়ে আত্ম-সুখপরায়ণ ভোগী হয়ে উঠেছিলেন। এ দিকে শকদের আক্রমণে ভারতবর্ষ তখন বারম্বার দুর্গতি প্রাপ্ত হচ্ছিল।

তখন বাহিরের দিক থেকে দেখলে ভোগবিলাসের আয়োজনে, কাব্য সংগীত শিল্পকলার আলোচনায়, ভারতবর্ষ সভ্যতার প্রকৃষ্টতা লাভ

করেছিল। কালিদাসের কাব্যকলার মধ্যেও তখনকার সেই উপকরণ-বহুল সম্ভোগের সুর যে বাজে নি তা নয়। বস্তুত তাঁর কাব্যের বহিরংশ তখনকার কালেরই কারুকার্যে খচিত হয়েছিল। এইরকম একদিকে তখনকার কালের সঙ্গে তখনকার কবির যোগ আমরা দেখতে পাই।

কিন্তু এই প্রমোদভবনের স্বর্ণখচিত অন্তঃপুরের মাঝখানে বসে কাব্যলক্ষ্মী বৈরাগ্যবিকল চিত্তে কিসের ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন ? হৃদয় তো তাঁর এখানে ছিল না। তিনি এই আশ্চর্য কারুবিচিত্র মাণিক্য-কঠিন কারাগার হতে কেবলই মুক্তি কামনা করছিলেন।

কালিদাসের কাব্যে বাহিরের সঙ্গে ভিতরের, অবস্থার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার একটা দ্বন্দ্ব আছে। ভারতবর্ষের যে তপস্যার যুগ তখন অতীত হয়ে গিয়েছিল, ঐশ্বর্যশালী রাজসিংহাসনের পাশে বসে কবি সেই নির্মল সুদূর কালের দিকে একটি বেদনা বহন করে তাকিয়ে ছিলেন।

রঘুবংশ কাব্যে তিনি ভারতবর্ষের পূরাকালীন সূর্যবংশীয় রাজাদের চরিতগানে যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার মধ্যে কবির সেই বেদনাটি নিগূঢ় হয়ে রয়েছে। তার প্রমাণ দেখুন।

আমাদের দেশের কাব্যে পরিণামকে অশুভকর ভাবে দেখানো ঠিক প্রথা নয়। বস্তুত যে রামচন্দ্রের জীবনে রঘুর বংশ উচ্চতম চূড়ায় অধিরোহণ করেছে, সেইখানেই কাব্য শেষ করলে তবেই কবির ভূমিকার বাক্যগুলি সার্থক হত।

তিনি ভূমিকায় বলেছেন – সেই যাঁরা জন্মকাল অবধি শুদ্ধ, যাঁরা ফলপ্রাপ্তি অবধি কর্ম করতেন, সমুদ্র অবধি যাঁদের রাজ্য, এবং স্বর্গ অবধি যাঁদের রথবর্ত্ম ; যথাবিধি যাঁরা অগ্নিতে আহুতি দিতেন, যথাকাম যাঁরা প্রার্থীদের অভাব পূর্ণ করতেন, যথাপরাধ যাঁরা দণ্ড দিতেন এবং যথাকালে যাঁরা জাগ্রত হতেন ; যাঁরা ত্যাগের জন্যে অর্থ সঞ্চয় করতেন, যাঁরা সত্যের জন্য মিতভাষী, যাঁরা যশের জন্য জয় ইচ্ছা করতেন এবং সন্তানলাভের জন্য যাঁদের দারগ্রহণ ; শৈশবে যাঁরা বিদ্যা-

ভ্যাস করতেন, যৌবনে যাঁদের বিষয়-সেবা ছিল, বার্ধক্যে যাঁরা মুনি-বৃত্তি গ্রহণ করতেন এবং যোগান্তে যাঁদের দেহত্যাগ হত—আমি বাক্‌সম্পদে দরিদ্র হলেও সেই রঘুরাজদের বংশকীর্তন করব, কারণ তাঁদের গুণ আমার কর্ণে প্রবেশ করে আমাকে চঞ্চল করে তুলেছে।

কিন্তু গুণকীর্তনেই এই কাব্যের শেষ নয়। কবিকে যে কিসে চঞ্চল করে তুলেছে, তা রঘুবংশের পরিণাম দেখলেই বুঝা যায়।

রঘুবংশ যাঁর নামে গৌরবলাভ করেছে তাঁর জন্মকাহিনী কী? তাঁর আরম্ভ কোথায়?

তপোবনে দিলীপদম্পতির তপস্যাতেই এমন রাজা জন্মেছেন। কালিদাস তাঁর রাজপ্রভুদের কাছে এই কথাটি নানা কাব্যে নানা কৌশলে বলেছেন যে, কঠিন তপস্যার ভিতর দিয়ে ছাড়া কোনো মহৎ ফললাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। যে রঘু উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের সমস্ত রাজাকে বীরতেজে পরাভূত করে পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজত্ব বিস্তার করেছিলেন, তিনি তাঁর পিতামাতার তপঃসাধনার ধন। আবার যে ভরত বীর্যবলে চক্রবর্তী সম্রাট হয়ে ভারতবর্ষকে নিজ নামে ধন্য করেছেন তাঁর জন্মঘটনায় অবারিত প্রবৃত্তির যে কলঙ্ক পড়েছিল, কবি তাকে তপস্যার অগ্নিতে দগ্ধ এবং দুঃখের অশ্রুজলে সম্পূর্ণ ধৌত না করে ছাড়েন নি।

রঘুবংশ আরম্ভ হল রাজোচিত ঐশ্বর্যগৌরবের বর্ণনায় নয়। সুদক্ষিণাকে বামে নিয়ে রাজা দিলীপ তপোবনে প্রবেশ করলেন। চতুঃসমুদ্র যাঁর অনন্যশাসনা পৃথিবীর পরিখা সেই রাজা অবিচলিত নিষ্ঠায় কঠোর সংযমে তপোবনধেনুর সেবায় নিযুক্ত হলেন।

সংযমে তপস্যায় তপোবনে রঘুবংশের আরম্ভ, আর মদিরায় ইন্দ্রিয়-মত্ততায় প্রমোদ-ভবনে তার উপসংহার। এই শেষ সর্গের চিত্রে বর্ণনার উজ্জ্বলতা যথেষ্ট আছে। কিন্তু যে অগ্নি লোকালয়কে দগ্ধ করে সর্বনাশ করে সেও তো কম উজ্জ্বল নয়। এক পত্নীকে নিয়ে দিলীপের তপো-বনে বাস শান্ত এবং অনতিপ্রকট বর্ণে অঙ্কিত, আর বহু নায়িকা নিয়ে

অগ্নিবর্ণের আত্মঘাতসাধন অসংবৃত বাহুল্যের সঙ্গে যেন জ্বলন্ত রেখায় বর্ণিত।

প্রভাত যেমন শান্ত, যেমন পিঙ্গল জটাধারী ঋষিবালকের মতো পবিত্র, প্রভাত যেমন মুক্তাপাণ্ডুর সৌম্য আলোকে শিশিরস্নিগ্ধ পৃথিবীর উপরে ধীরপদে অবতরণ করে এবং অভ্যুদয়বার্তায় জগৎকে উদ্বোধিত করে তোলে, কবির কাব্যেও তপস্যার দ্বারা সুসমাহিত রাজমাহাত্ম্য তেমনি স্নিগ্ধ তেজে এবং সংযত বাণীতেই মহোদয়শালী রঘুবংশের সূচনা করেছিল। আর নানাবর্ণবিচিত্র মেঘজালের মধ্যে আবিষ্ট অপরাহ্ণ আপনার অদ্ভুত রশ্মিচ্ছটায় পশ্চিম আকাশকে যেমন ক্ষণকালের জন্যে প্রগল্‌ভ করে তোলে এবং দেখতে দেখতে ভীষণ ক্ষয় এসে তার সমস্ত মহিমা অপহরণ করতে থাকে, অবশেষে অনতিকালেই বাক্যহীন কর্মহীন অচেতন অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়, কবি তেমনি করেই কাব্যের শেষ সর্গে বিচিত্র ভোগায়োজনের ভীষণ সমারোহের মধ্যেই রঘুবংশ-জ্যোতিষ্কের নির্বাপণ বর্ণনা করেছেন।

কাব্যের এই আরম্ভ এবং শেষের মধ্যে কবির একটি অন্তরের কথা প্রচ্ছন্ন আছে। তিনি নীরব দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলছেন—ছিল কী, আর হয়েছে কী। সেকালে যখন সম্মুখে ছিল অভ্যুদয় তখন তপস্যাই ছিল সকলের চেয়ে প্রধান ঐশ্বর্য, আর একালে যখন সম্মুখে দেখা যাচ্ছে বিনাশ তখন বিলাসের উপকরণরাশির সীমা নেই আর ভোগের অতৃপ্ত বহ্নি সহস্র শিখায় জ্বলে উঠে চারিদিকের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

কালিদাসের অধিকাংশ কাব্যের মধ্যেই এই দ্বন্দ্বটি সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই দ্বন্দ্বের সমাধান কোথায় কুমারসম্ভবে তাই দেখানো হয়েছে। কবি এই কাব্যে বলেছেন ত্যাগের সঙ্গে ঐশ্বর্যের, তপস্যার সঙ্গে প্রেমের সম্মিলনেই শৌর্যের উদ্ভব, সেই শৌর্যেই মানুষ সকল-প্রকার পরাভব হতে উদ্ধার পায়।

অর্থাৎ ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্যেই পূর্ণ শক্তি। ত্যাগী শিব যখন একাকী সমাধিমগ্ন তখনো স্বর্গরাজ্য অসহায়, আবার সতী যখন

তাঁর পিতৃভবনের ঐশ্বর্যে একাকিনী আবদ্ধ তখনো দৈত্যের উপদ্রব প্রবল।

প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলেই ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্য ভেঙে যায়।

কোনো একটি সংকীর্ণ জায়গায় যখন আমরা অহংকারকে বা বাসনাকে ঘনীভূত করি তখন আমরা সমগ্রের ক্ষতি করে অংশকে বড়ো করে তুলতে চেষ্টা করি। এর থেকে ঘটে অমঙ্গল। অংশের প্রতি আসক্তিবশত সমগ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এই হচ্ছে পাপ।

এইজন্যই ত্যাগের প্রয়োজন। এই ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করার জন্যে নয়, নিজেকে পূর্ণ করবার জন্যেই। ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্য, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্য, অহংকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্য, সুখকে ত্যাগ আনন্দের জন্য। এইজন্যেই উপনিষদে বলা হয়েছে—ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, আসক্তির দ্বারা নয়।

প্রথমে পার্বতী মদনের সাহায্যে শিবকে চেয়েছিলেন, সে চেষ্টা ব্যর্থ হল, অবশেষে ত্যাগের সাহায্যে তপস্যার দ্বারাতেই তাঁকে লাভ করলেন।

কাম হচ্ছে কেবল অংশের প্রতিই আসক্ত, সমগ্রের প্রতি অন্ধ। কিন্তু শিব হচ্ছেন সকল দেশের সকল কালের, কামনা ত্যাগ না হলে তাঁর সঙ্গে মিলন ঘটতেই পারে না।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করবে এইটি উপনিষদের অনুশাসন, এইটেই কুমারসম্ভব কাব্যের মর্মকথা, এবং এইটেই আমাদের তপোবনের সাধনা। লাভ করবার জন্যে ত্যাগ করবে।

Sacrifice এবং resignation, আত্মত্যাগ এবং দুঃখস্বীকার—এই দুটি পদার্থের মাহাত্ম্য আমরা কোনো কোনো ধর্মশাস্ত্রে বিশেষভাবে বর্ণিত দেখেছি। জগতের সৃষ্টিকার্যে উত্তাপ যেমন একটি প্রধান জিনিস, মানুষের জীবনগঠনে দুঃখও তেমনি একটি খুব বড়ো রাসায়নিক

শক্তি ; এর দ্বারা চিত্তের দুর্ভেদ্য কাঠিন্য গলে যায় এবং অসাধ্য হৃদয়-গ্রন্থির ছেদন হয়। অতএব সংসারে যিনি দুঃখকে দুঃখরূপেই নম্রভাবে স্বীকার করে নিতে পারেন তিনি যথার্থ তপস্বী বটেন।

কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন এই দুঃখস্বীকারকেই উপনিষৎ লক্ষ্য করছেন। ত্যাগকে দুঃখরূপে অঙ্গীকার করে নেওয়া নয়, ত্যাগকে ভোগরূপেই বরণ করে নেওয়া উপনিষদের অনুশাসন। উপনিষৎ যে ত্যাগের কথা বলছেন সেই ত্যাগই পূর্ণতর গ্রহণ, সেই ত্যাগই গভীরতর আনন্দ। সেই ত্যাগই নিখিলের সঙ্গে যোগ, ভূমার সঙ্গে মিলন। অতএব ভারতবর্ষের যে আদর্শ তপোবন, সে তপোবন শরীরের বিরুদ্ধে আত্মার, সংসারের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসের একটা নিরন্তর হাতাহাতি যুদ্ধ করবার মল্লক্ষেত্র নয়। যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, অর্থাৎ যা-কিছু-সমস্তের সঙ্গে ত্যাগের দ্বারা বাধাহীন মিলন, এইটেই হচ্ছে তপোবনের সাধনা। এইজন্যেই তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে ভারতবর্ষের আত্মীয়-সম্বন্ধের যোগ এমন ঘনিষ্ঠ যে, অন্য দেশের লোকের কাছে সেটা অদ্ভুত মনে হয়।

এইজন্যেই আমাদের দেশের কবিত্বে যে প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় অন্য দেশের কাব্যের সঙ্গে তার যেন একটা বিশিষ্টতা আছে। আমাদের এ প্রকৃতির প্রতি প্রভুত্ব করা নয়, প্রকৃতিকে ভোগ করা নয়, এ প্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলন।

অথচ এই সম্মিলন অরণ্যবাসীর বর্বরতা নয়। তপোবন আফ্রিকার বন যদি হত তাহলে বলতে পারতুম প্রকৃতির সঙ্গে মিলে থাকা একটা তামসিকতা মাত্র। কিন্তু মানুষের চিত্ত যেখানে সাধনার দ্বারা জাগ্রত আছে সেখানকার মিলন কেবলমাত্র অভ্যাসের জড়ত্বজনিত হতে পারে না। সংস্কারের বাধা ক্ষয় হয়ে গেলে যে মিলন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে তপোবনের মিলন হচ্ছে তাই।

আমাদের কবিরা সকলেই বলেছেন, তপোবন শান্তরসাস্পদ। তপোবনের যে একটি বিশেষ রস আছে সেটি শান্তরস। শান্তরস হচ্ছে পরিপূর্ণতার রস। যেমন সাতটা বর্ণরশ্মি মিলে গেলে তবে সাদা রঙ

হয়, তেমনি চিত্তের প্রবাহ নানা ভাগে বিভক্ত না হয়ে যখন অবিচ্ছিন্ন-ভাবে নিখিলের সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্যকে একেবারে কানায় কানায় ভরে তোলে তখনই শান্তরসের উদ্ভব হয়।

তপোবনে সেই শান্তরস। এখানে সূর্য-অগ্নি বায়ুজল স্থল-আকাশ তরুলতা মৃগ-পক্ষী সকলের সঙ্গেই চেতনার একটি পরিপূর্ণ যোগ। এখানে চতুর্দিকের কিছুর সঙ্গেই মানুষের বিচ্ছেদ নেই এবং বিরোধ নেই।

ভারতবর্ষের তপোবনে এই যে একটি শান্তরসের সংগীত বাঁধা হয়েছিল এই সংগীতের আদর্শেই আমাদের দেশে অনেক মিশ্র রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি হয়েছে। সেইজন্যেই আমাদের কাব্যে মানবব্যাপারের মাঝখানে প্রকৃতিকে এত বড়ো স্থান দেওয়া হয়েছে। এ কেবল সম্পূর্ণতার জন্যে আমাদের যে একটি স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আছে সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করবার উদ্দেশে।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে যে দুটি তপোবন আছে সে দুটিই শকুন্তলার সুখদুঃখকে একটি বিশালতার মধ্যে সম্পূর্ণ করে দিয়েছে। তার একটি তপোবন পৃথিবীতে, আর-একটি স্বর্গলোকের সীমায়। একটি তপোবনে সহকারের সঙ্গে নবমল্লিকার মিলনোৎসবে নবযৌবনা ঋষিকন্যারা পুলকিত হয়ে উঠছেন, মাতৃহীন মৃগশিশুকে তাঁরা নীবার-মুষ্টি দিয়ে পালন করছেন, কুশসূচিতে তার মুখ বিদ্ধ হলে ইঙ্গুদী তৈল মাখিয়ে শুশ্রূষা করছেন ; এই তপোবনটি দুষ্মন্তশকুন্তলার প্রেমকে সারল্য সৌন্দর্য এবং স্বাভাবিকতা দান করে তাকে বিশ্বসুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে।

আর সান্ধ্যমেঘের মতো কিম্পুরুষ-পর্বত যে হেমকূট, যেখানে সুরাসুরগুরু মরীচি তাঁর পত্নীর সঙ্গে মিলে তপস্যা করেছেন, লতা-জালজড়িত যে হেমকূট পক্ষিনীড়খচিত অরণ্যজটামণ্ডল বহন করে যোগাসনে অচল শিবের মতো সূর্যের দিকে তাকিয়ে ধ্যানমগ্ন, যেখানে কেশর ধরে সিংহশিশুকে মাতার স্তন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যখন দুরন্ত

তপস্বিবালক তার সঙ্গে খেলা করে তখন পশুর সেই দুঃখ ঋষিপত্নীর পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে, — সেই তপোবন শকুন্তলার অপমানিত বিচ্ছেদ-দুঃখকে অতি বৃহৎ শান্তি ও পবিত্রতা দান করেছে।

এ কথা স্বীকার করতে হবে প্রথম তপোবনটি মর্ত্যলোকের, আর দ্বিতীয়টি অমৃতলোকের। অর্থাৎ প্রথমটি হচ্ছে যেমন-হয়ে-থাকে, দ্বিতীয়টি যেমন-হওয়া-ভালো। এই 'যেমন-হওয়া-ভালো'র দিকে 'যেমন-হয়ে-থাকে' চলেছে। এরই দিকে চেয়ে সে আপনাকে শোধন করছে, পূর্ণ করছে। 'যেমন-হয়ে-থাকে' হচ্ছেন সতী অর্থাৎ সত্য, আর 'যেমন-হওয়া-ভালো' হচ্ছেন শিব অর্থাৎ মঙ্গল। কামনা ক্ষয় করে তপস্যার মধ্য দিয়ে এই সতী ও শিবের মিলন হয়। শকুন্তলার জীবনেও 'যেমন-হয়ে-থাকে' তপস্যার দ্বারা অবশেষে 'যেমন-হওয়া-ভালো'র মধ্যে এসে আপনাকে সফল করে তুলেছে। দুঃখের ভিতর দিয়ে মর্ত্য শেষকালে স্বর্গের প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে।

মানসলোকের এই যে দ্বিতীয় তপোবন, এখানেও প্রকৃতিকে ত্যাগ করে মানুষ স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে নি। স্বর্গে যাবার সময় যুধিষ্ঠির তাঁর কুকুরকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের কাব্যে মানুষ যখন স্বর্গে পৌঁছোয় প্রকৃতিকে সঙ্গে নেয়, বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজে বড়ো হয়ে ওঠে না। মরীচির তপোবনে মানুষ যেমন তপস্বী হেমকূটও তেমনি তপস্বী, সিংহও সেখানে হিংসা ত্যাগ করে, গাছপালাও সেখানে ইচ্ছা-পূর্বক প্রার্থীর অভাব পূরণ করে। মানুষ একা নয়, নিখিলকে নিয়ে সে সম্পূর্ণ, অতএব কল্যাণ যখন আবির্ভূত হয় তখন সকলের যোগেই তার আবির্ভাব।

রামায়ণে রামের বনবাস হল। কেবল রাক্ষসের উপদ্রব ছাড়া সে বনবাসে তাঁদের আর কোনো দুঃখই ছিল না। তাঁরা বনের পর বন, নদীর পর নদী, পর্বতের পর পর্বত পার হয়ে গেছেন, তাঁরা পর্ণকুটিরে বাস করেছেন, মাটিতে শুয়ে রাত্রি কাটিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা

ক্লেশবোধ করেন নি। এই সমস্ত নদীগিরি অরণ্যের সঙ্গে তাঁদের হৃদয়ের মিলন ছিল। এখানে তাঁরা প্রবাসী নন।

অন্য দেশের কবি রাম লক্ষ্মণ সীতার মাহাত্ম্যকে উজ্জ্বল করে দেখাবার জন্যেই বনবাসের দুঃখকে খুব কঠোর করেই চিত্রিত করতেন। কিন্তু বাল্মীকি একেবারেই তা করেন নি—তিনি বনের আনন্দকেই বারম্বার পুনরুক্তিদ্বারা কীর্তন করে চলেছেন।

রাজৈশ্বর্য যাঁদের অন্তঃকরণকে অভিভূত করে আছে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলন কখনোই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে না। সমাজগত সংস্কার ও চিরজন্মের কৃত্রিম অভ্যাস পদে পদেই তাঁদের বাধা না দিয়ে থাকতে পারে না। সেই সকল বাধার ভিতর থেকে প্রকৃতিকে তাঁরা কেবল প্রতিকূলই দেখতে থাকেন।

আমাদের রাজপুত্র ঐশ্বর্যে পালিত, কিন্তু ঐশ্বর্যের আসক্তি তাঁর অন্তঃকরণকে অভিভূত করেন নি। ধর্মের অনুরোধে বনবাস স্বীকার করাই তার প্রথম প্রমাণ। তাঁর চিত্ত স্বাধীন ছিল, শান্ত ছিল, এইজন্যেই তিনি অরণ্যে প্রবাসদুঃখ ভোগ করেন নি; এইজন্যেই তরুলতা পশুপক্ষী তাঁর হৃদয়কে কেবলই আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দ প্রভুত্বের আনন্দ নয়, ভোগের আনন্দ নয়, সম্মিলনের আনন্দ। এই আনন্দের ভিত্তিতে তপস্যা, আত্মসংযম। এর মধ্যেই উপনিষদের সেই বাণী : তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।

কৌশল্যার রাজগৃহবধূ সীতা বনে চলেছেন—

একৈকং পাদপং গুল্মং লতাং বা পুষ্পশালিনীম্
অদৃষ্টরূপাং পশ্যন্তী রামং পপ্রচ্ছ সাবলা।
রমণীয়ান্ বহুবিধান্ পাদপান্ কুসুমোৎকরান্
সীতাবচনসংরুদ্ধ আনয়ামাস লক্ষ্মণঃ।
বিচিত্রবালুকাজলাং হংসসারসনাদিতাম্।
রেমে জনকরাজস্য সুতা প্রেক্ষ্য তদা নদীম্।

যে সকল তরুগুল্ম কিংবা পুষ্পশালিনী লতা সীতা পূর্বে কখনো দেখেন নি তাদের

কথা তিনি রামকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। লক্ষ্মণ তাঁর অনুরোধে তাঁকে পুষ্পমঞ্জরীতে ভরা বহুবিধ গাছ তুলে এনে দিতে লাগলেন। সেখানে বিচিত্র-বালুকাজলা হংসসারসমুখরিতা নদী দেখে জানকী মনে আনন্দ বোধ করলেন।

প্রথম বনে গিয়ে রাম চিত্রকূট পর্বতে যখন আশ্রয় গ্রহণ করলেন, তিনি

স্বরম্যমাসাদ্য তু চিত্রকূটং
নদীঞ্চ তাং মাল্যবতীং সুতীর্থাং
ননন্দ হৃষ্টো মৃগপক্ষিজুষ্টাং
জহৌ চ দুঃখং পুরবিপ্রবাসাৎ।

সেই সুরম্য চিত্রকূট, সেই সুতীর্থা মাল্যবতী নদী, সেই মৃগপক্ষিসেবিতা বনভূমিকে প্রাপ্ত হয়ে পুরবিপ্রবাসের দুঃখকে ত্যাগ করে হৃষ্টমনে রাম আনন্দ করতে লাগলেন।

দীর্ঘকালোষিতস্তস্মিন্ গিরৌ গিরিবনপ্রিয়ঃ—গিরিবনপ্রিয় রাম দীর্ঘকাল সেই গিরিতে বাস করে একদিন সীতাকে চিত্রকূটশিখর দেখিয়ে বলছেন—

ন রাজ্যভ্রংশনং ভদ্রে ন সুহৃদ্ভির্বিনাভবঃ
মনো মে বাধতে দৃষ্ট্বা রমণীয়মিমং গিরিম্।

রমণীয় এই গিরিকে দেখে রাজ্যভ্রংশনও আমাকে দুঃখ দিচ্ছে না, সুহৃদ্গণের কাছ থেকে দূরে বাসও আমার পীড়ার কারণ হচ্ছে না।

সেখান থেকে রাম যখন দণ্ডকারণ্যে গেলেন যেখানে গগনে সূর্যমণ্ডলের মতো দুর্দর্শ প্রদীপ্ত তাপসাশ্রমমণ্ডল দেখতে পেলেন। এই আশ্রম শরণ্যং সর্বভূতানাম্। ইহা ব্রাহ্মীলক্ষ্মী দ্বারা সমাবৃত। কুটিরগুলি সুমার্জিত, চারি দিকে কত মৃগ কত পক্ষী।

রামের বনবাস এমনি করেই কেটেছিল—কোথাও বা রমণীয় বনে, কোথাও বা পবিত্র তপোবনে।

রামের প্রতি সীতার ও সীতার প্রতি রামের প্রেম তাঁদের পরস্পর থেকে প্রতিফলিত হয়ে চারি দিকের মৃগ-পক্ষীকে আচ্ছন্ন করেছিল।

তাঁদের প্রেমের যোগে তাঁরা কেবল নিজেদের সঙ্গে নয়, বিশ্বলোকের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়েছিলেন। এইজন্য সীতাহরণের পর রাম সমস্ত অরণ্যকেই আপনার বিচ্ছেদবেদনার সহচর পেয়েছিলেন। সীতার অভাব কেবল রামের পক্ষে নয়—সমস্ত অরণ্যই যে সীতাকে হারিয়েছে। কারণ, রামসীতার বনবাসকালে অরণ্য একটি নূতন সম্পদ পেয়েছিল—সেটি হচ্ছে মানুষের প্রেম। সেই প্রেমে তার পল্লবঘনশ্যামলতাকে, তার ছায়াগম্ভীর গহনতার রহস্যকে, একটি চেতনার সঞ্চারে রোমাঞ্চিত করে তুলেছিল।

শেক্‌স্‌পীয়রের *As you like it* নাটক একটি বনবাসকাহিনী—টেম্পেস্টও তাই, *Midsummernight's dream*ও অরণ্যের কাব্য। কিন্তু সে সকল কাব্যে মানুষের প্রভুত্ব ও প্রবৃত্তির লীলাই একেবারে একান্ত—অরণ্যের সঙ্গে সৌহার্দ্য দেখতে পাই নে। অরণ্যবাসের সঙ্গে মানুষের চিত্তের সামঞ্জস্যসাধন ঘটে নি। হয় তাকে জয় করবার, নয় তাকে ত্যাগ করবার চেষ্টা সর্বদাই রয়েছে; হয় বিরোধ, নয় বিরাগ, নয় ঔদাসীন্য। মানুষের প্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতিকে ঠেলেঠুলে স্বতন্ত্র হয়ে উঠে আপনার গৌরব প্রকাশ করেছে।

মিল্‌টনের প্যারাডাইস লস্ট্ কাব্যে আদি মানবদম্পতির স্বর্গারণ্যে বাস বিষয়টিই এমন যে অতি সহজেই সেই কাব্যে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলনটি সরল প্রেমের সম্বন্ধে বিরাট ও মধুর হয়ে প্রকাশ পাবার কথা। কবি প্রকৃতিসৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন, জীবজন্তুরা সেখানে হিংসা পরিত্যাগ করে একত্রে বাস করছে তাও বলেছেন, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাদের কোনো সাত্ত্বিক সম্বন্ধ নেই। তারা মানুষের ভোগের জন্যেই বিশেষ করে সৃষ্ট, মানুষ তাদের প্রভু। এমন আভাসটি কোথাও পাই নে যে আদি দম্পতি প্রেমের আনন্দ-প্রাচুর্যে তরুলতা পশুপক্ষীর সেবা করছেন, ভাবনাকে কল্পনাকে নদীগিরি অরণ্যের সঙ্গে নানা লীলায় সম্মিলিত করে তুলছেন। এই স্বর্গারণ্যের যে নিভৃত নিকুঞ্জটিতে মানবের প্রথম পিতামাতা বিশ্রাম করতেন সেখানে—

"Beast, bird, insect or worm dust enter none ;
Such was their awe of man."

অর্থাৎ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ কেউ প্রবেশ করতে সাহস করত না, মানুষের প্রতি এমনি তাদের একটি সভয় সম্ভ্রম ছিল।

এই যে নিখিলের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ, এর মূলে একটি গভীরতর বিচ্ছেদের কথা আছে। এর মধ্যে—ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—জগতে যা কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা সমাবৃত করে জানবে, এই বাণীটির অভাব আছে। এই পাশ্চাত্য কাব্যে ঈশ্বরের সৃষ্টি ঈশ্বরের যশোকীর্তন করবার জন্যেই; ঈশ্বর স্বয়ং দূরে থেকে তাঁর এই বিশ্বরচনা থেকে বন্দনা গ্রহণ করছেন।

মানুষের সঙ্গেও আংশিক পরিমাণে প্রকৃতির সেই সম্বন্ধ প্রকাশ পেয়েছে, অর্থাৎ প্রকৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠতা প্রচারের জন্যে।

ভারতবর্ষও যে মানুষের শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করে তা নয়। কিন্তু প্রভুত্ব করাকেই, ভোগ করাকেই, সে শ্রেষ্ঠতার প্রধান লক্ষণ বলে মানে না। মানুষের শ্রেষ্ঠতার সর্বপ্রধান পরিচয়ই হচ্ছে এই যে, মানুষ সকলের সঙ্গে মিলিত হতে পারে! সে-মিলন মূঢ়তার মিলন নয়, সে-মিলন চিত্তের মিলন, সুতরাং আনন্দের মিলন। এই আনন্দের কথাই আমাদের কাব্যে কীর্তিত।

উত্তরচরিতে রাম ও সীতার যে প্রেম, আনন্দের প্রাচুর্যবেগে চারি দিকের জল স্থল আকাশের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাই রাম দ্বিতীয়-বার গোদাবরীর গিরিতট দেখে বলে উঠেছিলেন—যত্র দ্রুমা অপি মৃগা অপি বন্ধবো মে। তাই সীতাবিচ্ছেদকালে তিনি তাঁদের পূর্বনিবাস-ভূমি দেখে আক্ষেপ করেছিলেন যে, মৈথিলী তাঁর করকমলবিকীর্ণ জল নীবার ও তৃণ দিয়ে যে সকল গাছ পাখি ও হরিণদের পালন করে-ছিলেন তাদের দেখে আমার হৃদয় পাষাণ গলার মতো গলে যাচ্ছে।

মেঘদূতে যক্ষের বিরহ নিজের দুঃখের টানে স্বতন্ত্র হয়ে একলা কোণে বসে বিলাপ করছে না। বিরহ দুঃখই তার চিত্তকে নববর্ষায়

প্রফুল্ল পৃথিবীর সমস্ত নগ নদী—অরণ্য নগরীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে। মানুষের হৃদয়বেদনাকে কবি সংকীর্ণ করে দেখান নি, তাকে বিরাটের মধ্যে বিস্তীর্ণ করেছেন; এইজন্যই প্রভুশাপগ্রস্ত একজন যক্ষের দুঃখবার্তা চিরকালের মতো বর্ষাঋতুর মর্মস্থান অধিকার করে প্রণয়ী-হৃদয়ের খেয়ালকে বিশ্বসংগীতের ধ্রুপদে এমন করে বেঁধে দিয়েছে।

ভারতবর্ষের এইটেই হচ্ছে বিশেষত্ব।...

'শান্তিনিকেতন' ১৩১৬

মেঘদূত-ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কয়েকটি কথার মীমাংসা চাই। তাহার মধ্যে মেঘদূতের যে প্রচলিত সমালোচনা আছে, যে কালিদাস গ্রন্থ লিখিয়া একজন মালিনী কি কুমারণীকে শুনাইতেন, তাহার সম্মতি পাইলে প্রচার করিতেন। সে পূর্ব্বমেঘ শুনিয়া বলিয়াছিল উহা স্বর্গের সিঁড়ি অর্থাৎ উত্তরমেঘই সারবস্তু, পূর্ব্বমেঘ কিছু নয়। এ কথাটা সত্য কি না ? একেবারে কিছু নয় অর্থাৎ কেবল সিঁড়ির কাজ করে, এটা বড় অশ্রদ্ধেয় কথা। কিন্তু এই অশ্রদ্ধেয় কথায় শ্রদ্ধাবান হইয়া আবহমান কাল লোকে পূর্ব্বমেঘের প্রতি অনাদর করিয়া আসিতেছে। মনে করে এটা একটা ভূগোলের ইণ্ডেক্স্, পড়িলে উত্তরমেঘ বোঝায় একটু সুবিধে হয়, তাহাই পড়িতে হয়। বাস্তবিকও লোকের অপরাধ নাই, দেশগুলা কোথায়,—জানা ছিল না। একটার পর আর একটা ঠিক কি না জানা ছিল না। লোকে এক রকম ভাসা ভাসা পড়িত, বড় বিরক্ত লাগিত। মল্লিনাথের টীকাও এই রকম ভাসা ভাসা ; আমিও বিশ বছর পূর্ব্বে এইরূপ ভাসা ভাসা ভাবেই উহা রজনীবাবুর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম। কিন্তু পূর্ব্বমেঘ কালিদাসের কবিত্বের একটী ভাবময় লহর। উহাতে জড়-প্রকৃতিকে চৈতন্যময় করিয়া তুলিয়াছে। মেঘ নিজে জড় হইয়াও চৈতন্যময় ; মেঘ উপর হইতে যখন জড়প্রকৃতির যতদূর দেখিতেছে, তখন ততদূরই চৈতন্যময় হইয়া যাইতেছে। জড়কে এত সুন্দরভাবে চৈতন্যময় করিতে আর কোথাও দেখা যায় না। কালিদাস আর কোথাও পারেন নাই। কুমারে রঘুতে বড় বড় বর্ণনায় জড়—জড়ই। কুমারের ষষ্ঠে হিমালয়কে জড় ও চৈতন্য দুইই বলা হইয়াছে, কিন্তু সে দুটী দুরূপ। পূর্ব্বমেঘে যে জড়, সেই চৈতন্য-ময়, ভাবময়, প্রেমময়।

দ্বিতীয় কথা। মেঘদূতকে অলঙ্কারশাস্ত্রে খণ্ডকাব্য বলে; ইংরেজেরা লিরিক বলেন। কোনটী সত্য? খণ্ডকাব্য,—অর্থ যতদূর বুঝা যায়,—টুকরা কাব্য বলিয়াই বোধ হয়, টুকরা কাব্য বলিয়া মেঘদূতের উল্লেখ করিলে জিনিসটার অবমান করা হয়। মেঘদূত টুকরা নহে—পুরা, সর্ব্বাঙ্গে সুশোভিত, সম্পূর্ণ, এবং অপ্রমেয়। সুতরাং মেঘদূত টুকরা কাব্য নহে। ছোট কাব্য বলিতে চাও বল। দৈর্ঘ্যে ছোট কিন্তু ফলে ছোট নয়। কিন্তু খণ্ড বলিতে ত ছোট বুঝায় না। লিরিক বলিলে যাহা বুঝায় উত্তরমেঘে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে: কিন্তু তথাপি উত্তরমেঘকে লিরিক বলা যায় না। কারণ উহা গানে লিখিত নহে। লিরিক গান না হলে হয় না, কাব্যের বাহ্য আকার লইয়াই লিরিক। তবে উৎকৃষ্ট লিরিকের যে ভাবতন্ময়তা আছে, উত্তরমেঘে সেইরূপ ভাবতন্ময়তা আছে বলিয়া উহাকে লিরিক বলিতে ইচ্ছা কর, বলিতে পার। কিন্তু পূর্ব্বমেঘের অবাধ কল্পনার রমণীয় সৃষ্টিকে লিরিক বলিবে কিরূপে, তাহা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য। তবে যদি কেহ বলে খণ্ড শব্দের অর্থ খাঁড় গুড়,—তখনকার প্রধান মিষ্টসামগ্রী। আমাদের রাতাবী মনোহরা। তন্ময়কাব্য খণ্ডকাব্য। তাহা হইলে কতক রাজী আছি। সেকালে খণ্ড শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নৈষধকার খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য রচনা করেন। ষষ্ঠে ব্রহ্মগুপ্ত জ্যোতিষে খণ্ড-খাদ্য রচনা করেন। আমরা এখন যেমন বলি অমিয় নিমাইচরিত, তেমনি সেকালে খণ্ডকাব্য অর্থে মধুময় অমৃতময় কাব্য। টুকরা ফুকরা বলিলে জমে না।

তৃতীয়। মেঘদূত যে লিরিক নয়, উহা যে টুকরা বা ছোট কাব্য নয় এ ত ঠিক। আমি বলি, উহার মত একখানা মহা-মহা-কাব্য আর রচনা হয় নাই। মহাকাব্যে নূতন সৃষ্টি অনেক থাকে, কিন্তু সে কি সৃষ্টি? এই পৃথিবী, এই আকাশ, এই মানুষ, এই মনুষ্যচরিত্র, এই গাছ এই পালা—এই সব—তবে সাজান গোছান নূতন করিয়া। না হয় একটা দুটা মানুষ নূতন করিয়া গড়া। কিন্তু মেঘদূতে সব নূতন

সৃষ্টি, পৃথিবী, গাছ, পালা, বন, জঙ্গল, স্ত্রী, পুরুষ, সমাজ, সামাজিক, সব ছাড়িয়া নূতন সৃষ্টি। মেঘদূত এক অদ্ভুত নূতন সৃষ্টি, সৃষ্টি-ছাড়া বলিতে চাও বল। কিন্তু বিধাতার সৃষ্টি-ছাড়া বলিও। কবির সৃষ্টির কথা বলিও না। অলকা এক নূতন সৃষ্টি। এত বড় ভারতবর্ষটা ইহাতে কালিদাসের কুলাইল না। তিনি ভারতবর্ষ ছাড়া অনেক দেশ জানিতেন। পারস্য জানিতেন, যবনদেশ জানিতেন, যে সকল দ্বীপ হইতে লবঙ্গ পুষ্প কলিঙ্গে আনীত হইত, তাহাও জানিতেন; এ সকল দেশে তাঁহার পছন্দ মত জায়গা পাইলেন না। তাই তিনি হিমালয়ের তুঙ্গতমশৃঙ্গে—মনুষ্যের অগম্য—কেবল তাহার কল্পনামাত্রের গম্য—স্থানে অলকানগর বসাইলেন। তাঁহার নগরে পার্থিব নগরের নিয়মাবলী খাটিবে না। তাঁহার নগর তিনি যত ইচ্ছা সুখময়, আনন্দময় করিয়া তুলিতে পারিবেন। আর সেই নগরে যাহারা বাস করিবে, তাহারাও কল্পনারাজ্যের লোক, মানুষ তাহাদিগকে দেখে নাই, দেখিবেও না। তাহাদের সমাজনীতি, শাসনপ্রণালী, নব নূতন। সব কালিদাসের অবাধ কল্পনার অমৃতময় ফল। ইয়ুরোপ বহুকাল ধরিয়া সংসার কিসে সুখময় হয়, ভাবিয়াই অস্থির। প্লেটোর রিপাব্লিক, মিল্টনের এরিও-প্যাগাইটিকা, সার টমাস মুরের ইউটোপিয়া প্রভৃতি গ্রন্থে মানুষ কিসে সংসারটা সুখময় করিতে পারে, তাহার অনেক চেষ্টা চরিত্র আছে। কালিদাস মেঘদূতে চেষ্টা চরিত্র ছাড়াইয়া উঠিয়া সেই আনন্দময়, সুখ-ময়, প্রেমময় সংসার সৃষ্টি করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এ ত নূতন সৃষ্টি—কবির সৃষ্টির এত প্রকাণ্ড খেলা—ইহাকে কি লিরিক বলিলে, না খণ্ড কাব্য বলিলে তৃপ্তি হয়। আমি একবার এডিসনের নকলে ইহাকে (merum sal) "মধুর কবল" বলিয়াছিলাম। ছি! কি ভুলই করিয়া-ছিলাম। মেঘদূত লইয়া যতই আন্দোলন করিতেছি, উহার অসীম সৃষ্টিনৈপুণ্য, উহার ভাবময়, চৈতন্যময়, উচ্ছ্বাসময়, আবেগময় কবিত্ব-লহরী যতই মনোমধ্যে গ্রথিত হইতেছে, ততই উহাতে কালিদাসের অদ্ভুত কবিত্বশক্তির বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি।

যক্ষপত্নী। মেঘদূতের প্রধান আকর্ষণমন্ত্র যক্ষপত্নী। মেয়েটী দেখিতে মন্দ নয়। তন্বী—ক্ষীণাঙ্গী—যাঁহারা দোহারা দোহারা চান, তাঁহাদের পছন্দ হইবে না। শ্যামা—কাল নয়—তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা—কাঁচা সোণার মত রঙ। শিখরিদশনা—মল্লিনাথ অর্থ করিয়াছেন কোটিযুক্ত-দশনা অর্থাৎ ইঁদুরদাঁতী—টোলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা অর্থ করিতেন, দাড়িম্ববীজের ন্যায় দশনযুক্ত—যাহার দাঁতগুলি দাড়িম দানার মত। পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী—পাকা তেলাকুচার মত দুটি ঠোঁট। মধ্যে ক্ষামা—কোমরটী সরু। সরু কোমর বড় সুন্দর বলিয়া আমাদের কবিদের ধারণা। তাই কেহ কেহ এত সরু করেন যে দেখাই যায় না, কখন বলেন "পরমাণুমধ্যা", কখন বলেন "সদসৎসংশয়গোচরোদী"। কালিদাস এত উৎকট বর্ণনার বড় পক্ষপাতী নহেন। "চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা"—হরিণের চোখ, মুখের তুলনায় খুব বড়, পটলচেরা, আর তার উপর ঢলঢল করিতেছে; মানুষের চোখের যে অংশ সাদা, হরিণের সেটুকু জলের মত, কেমন ঢলঢল করে, তাহার উপর যখন আবার সেই হরিণ ভয় পায়, তখন সেই ঢলঢলে চোখ আরও ঢলঢলে হয়; যক্ষ-পত্নীর চোখদুটী তেমনি। "নিম্ননাভি"; তাহার নাভি গভীর। "শ্রোণি-ভারাৎ অলসগমনা"। উহার নিতম্ব বড় ভারি বলিয়া উহার গতি অতি মন্থর। চলিলেই বোধ হয়, হেলে দুলে, ঠমকে চমকে, পা ওঠে কি না ওঠে, এমনি ভাবে ধীরে ধীরে যাইতেছে। তাহার উপর আবার "স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাম্"। স্তনভারে শরীরটা একটু সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তাই বলে কুঁজো নয়। আর তিনি বড় একটা কথা কন না—যখন কথা কন দুচারিটী। এ রমণীকে আপনারা আহামরিই বলুন; পাঁচপাঁচিই বলুন; বা চলনসই বলুন; কালিদাস ইহার এই পর্য্যন্তই বর্ণনা করিয়াছেন। কুবেরের রাজধানীতে, অত ধনের জায়গায়, এই যে নম্বর ওয়ান, তাহা বলিতে পারি না। কালি-দাসও সে বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু যক্ষ বেচারা উহাকে রমণীসৃষ্টির আদ্য বলিয়া মনে করিত। সে মনে করিত,

বিধাতা রমণীসৃষ্টির সমস্ত উপকরণ একত্র করিয়া প্রথম যে মেয়েটা গড়িয়াছিলেন সেইটীই যেন এই—আমার বৌটী। সৌন্দর্য্যের কোথাও কিছু ত্রুটী ছিল না, কোথাও বিধাতাকে হাত টান করিতে হয় নাই। বরং সব জিনিস পূরাপূরা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা দেওয়া হইয়াছে। যক্ষ পত্নীকে আপনার দ্বিতীয় প্রাণ বলিয়া মনে করিত। সে ক্রমে উহাকে এতই ভালবাসিতে লাগিল যে সে আর সব কাজকর্ম্ম ভুলিয়া গেল।

যক্ষ। যক্ষ বেচারা বেশ বড় মানুষ। তাহার টাকা কত জানেন, এক কোটী, দুকোটী নয়। কোটীর পর অর্ব্বুদ, অর্ব্বুদের পর বৃন্দ, বৃন্দের পর খর্ব্ব, খর্ব্বের পর নিখর্ব্ব, নিখর্ব্বের পর শঙ্খ, শঙ্খের পর পদ্ম। তার ধন এক পদ্ম আর এক শঙ্খ ১১০০০০০০০০০০০০০। অলকায় চোর ডাকাতের ভয় নাকি একেবারেই নাই, তাই যক্ষের দ্বারে একটী পদ্ম ও একটী শঙ্খ আঁকা থাকে। তাহাতেই লোকে জানিতে পারে, ইহার কত টাকা। এখন যেমন লিমিটেড কোম্পানিরা তাহাদের মূলধন বিজ্ঞাপনে দিয়া থাকেন, সেকালেও যক্ষেরা এই-রূপে তাহাদের রিজার্ভফণ্ডের বিজ্ঞাপন দিত। এদেশের মত বিজ্ঞাপন-প্রথা চলিত হয় নাই; হইলে অনেক "অনুসন্ধানের" পর তথ্য বাহির করিতে হইত। শঙ্খ ও পদ্মের পাশে বড় বড় থলে আঁকিয়া সেকালে কেমন করিয়া টাকার পরিমাণ বলিয়া দিত, নূতন যাদুঘরে কল্পবৃক্ষের চেহারা দেখিলেই লোকে তাহা বুঝিতে পারিবে। যক্ষ এত ধনের মানুষ। মানুষের পক্ষে এ ধন খুব ধন, কিন্তু কুবেরের রাজধানীতে—তা মন্দ নয়—খুব যে প্রথম শ্রেণীর তা বোধ হয় না। কারণ কুবেরের সরকারে সে একটী চাকরী করিত, খুব বড় গোছের চাকরী বলিয়া বোধ হয় না; কেন না কাজে অবহেলা করে বলিয়া কুবের তাহাকে শাস্তি দিয়াছেন। সলস্‌বরি, চেম্বারলেন, হইলে পারিতেন কি? তবে নিতান্ত ছোট চাকরীও নহে, কারণ কুবেরের দৃষ্টি তাহার উপর ছিল; এবং কুবের কিছু রেগেই শাস্তি দিয়াছিলেন। তাহাতেই বোধ হয়,

তিনি জুনিয়ারদের মধ্যে একজন। বেশ রাইজিং ও প্রমিসিং অফিসর ছিলেন। কিন্তু কু'ের এত রাগ করেন কেন? যেহেতু সেই যক্ষটী বড় কাজে অবহেলা করিত। কেন করিত কালিদাস লেখেন নাই। কিন্তু আমরা তাহা বলিতে পারি। পয়সা কড়ি যেমন হোক কিছু ছিল; বয়স ত যক্ষদের যৌবন ছাড়া ছিলই না। তাহার উপর এ বেচারার বয়স কম; বৌটীও সুন্দরী; বেচারা তাহাকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। মনে করিত বুঝি পদ্ম শঙ্খেরও উপর কোন অমূল্য নিধি পাইয়াছে। একটু আসিতে দেরী হইত; কাজে ভুল হইত; প্রথম প্রথম হয় ত কুবের টুকিয়াছিলেন; তারপর ধমকও দিয়াছিলেন; তাহার পর যখন দেখিলেন রোগ অসাধ্য, তখন তাহার প্রতীকার আবশ্যক হইল। অপরাধ ত সাব্যস্তই আছে। কি শাস্তি দেওয়া যায়? যক্ষ-পিনাল-কোডে হুইপিং নাই, কারাবাস নাই, ফাইন নাই, আছে কেবল বিরহ। কুবের সেই সাজাই দিয়া দিলেন। বিরহ, এক বৎসর। উত্থান একাদশীর পরদিন যক্ষ বেচারা কাঁদিতে কাঁদিতে অলকার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া এক বৎসরের জন্য বাহির হইল। কুবের দেখিলেন, এ ছোঁড়া যে রকম পাগলা, লুকিয়ে চুরিয়ে আসিতে পারে। তাই বাহির হইবার সময় তাহার যত মহিমা ছিল, সব কাড়িয়া লইলেন। সে যে আর দেবযোনির ন্যায় অণু হইয়া, লঘু হইয়া, চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া আবার তাহার স্ত্রীর কাছে আসিবে, বা তাহার সঙ্গে দেখাশুনা করিবে, সে পথ মারিয়া দিলেন। এখন সে বেচারা যায় কোথায়? ভারতবর্ষের যাবতীয় স্থান বিবেচনা করিয়া দেখা হইল। বড় লোকালয়ে পাঠাইলে যক্ষ পাছে বেণেদের সঙ্গে জুটিয়া ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসে। কাশী, কেদারনাথ প্রভৃতি স্থানে পাঠাইলে যক্ষ পাছে ধর্ম্মকর্ম্মে মন দেয়। তাই দুষ্ট বুড়া কুবের মিচকি মিচকি হাসিয়া বলিয়া দিলেন যে, সে রামগিরিতে থাকিবে। শ্রীরামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে কয়েক বৎসর রামগিরিতে বাস করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তথায় তাঁহার একটী আশ্রমের কুটীর ভাঙ্গিলে তিনি আর এক

আশ্রমে কুটীর নির্ম্মাণ করিতেন। যেখানে জল পাইতেন সেইখানেই জলক্রীড়া করিতেন ; সীতা সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। কুবের বলিয়া দিলেন, তুমি রামায়ণ পড়িয়াছ, তুমি রামগিরিতে থাক গিয়া। মনে মনে ভাবিলেন, যেমন দুষ্ট ; সমস্ত দিন স্ত্রীর সঙ্গে থাকেন – খুব হয়েছে, এক বৎসরে একটু বিলক্ষণ জ্ঞানযোগ হইবে। বিরহের সময়ে রামসীতার মিলনের স্মৃতি উহার বিরহবেদনাটা খুব তীব্র করিয়া দিবে।

কাজেও তাই হইল। যক্ষ বেচারা যেখানে যায়, সেইখানেই দেখে রামসীতার আশ্রম – রামসীতার কুঞ্জ – রামসীতার লতামণ্ডপ। বড় বড় ছায়া-বৃক্ষের নিকট যায়, তাহারা রামসীতার বনবাসকালের বিবিধ বিশ্রম্ভের সাক্ষী ! বড় বড় গাছ কতকাল বাঁচিয়া আছে ঠিক নাই ; হয়ত রামসীতা পুতিয়াছিলেন, এখন প্রকাণ্ড মহীরুহ। জলে যায়, সেখানেও রামসীতার জলক্রীড়া মনে পড়ে। জলে যাইতে পারে না, স্থলে যাইতে পারে না, বনে যাইতে পারে না, গাছতলায় থাকিতে পারে না, এ অবস্থায় মানুষের কি দশা হয় ? মানুষ পাগল হয়। যক্ষ অনেক কষ্টে আট মাস কাটাইল। তাহার শরীর কৃশ হইল, হাতে সোণার বালা ছিল খসিয়া পড়িল, তাহা সে টেরও পাইল না। তাহার বুদ্ধিশুদ্ধিরও বিকৃতি হইল। সে উত্তর দিক হইতে বাতাস আসিলে দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিত, ভাবিত এই বাতাস যখন উত্তর দিক হইতে আসিতেছে, তখন এ নিশ্চয়ই প্রিয়ার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আসিয়াছে। সে প্রস্তর খণ্ডে প্রিয়ার ছবি আঁকিয়া আপনাকে তাহার চরণপতিত করিত। রাত্রে গাছতলায় শয়ন করিয়া স্বপ্নে প্রিয়াকে পাইয়াছে বলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিত ; হাত পা ঠিক আলিঙ্গনের ভাবেই থাকিত। কিন্তু প্রিয়া কোথায় ? এইভাবেই তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যাইত। দেখিত টপ্‌টপ্‌ করিয়া শিশির পড়িতেছে। বোধ হইত যেন বনদেবীরা তাহার দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। এ সকল পাগলামী ভিন্ন আর কি ?

এইরূপে আট মাস কাটিয়া গেল। এতদিন ত কষ্টে কাটিয়াছে ;

আর কাটে না। তাহার উপর আবার মেঘ উঠিল। আষাঢ়ের প্রথম মেঘ দেখা দিল। ছোট্‌ট একখানি মেঘ পর্ব্বতের নিতম্বে চড়িয়া আছে দেখা দিল। পর্ব্বত খানিকটা সমতল হইয়া যেখানটায় নামিতে থাকে, তাহাকে সানু বলে; উহার আর এক নাম নিতম্ব। এই পর্ব্বত-নিতম্ব ঢাকিয়া মেঘ রহিয়াছে, বাতাসে নড়িতেছে চড়িতেছে। বোধ হইতেছে যেন একটা তেল কুচকুচে কাল হাতী পাহাড়ের গায়ে দাঁত মারিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া খেলা করিতেছে। আর পায় কে? যক্ষ একেবারে উন্মাদ; তখন আর চেতন অচেতন জ্ঞান রহিল না, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান রহিল না। এই সময়ে কবি যক্ষের হইয়া একটা কথা কহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—মেঘ দেখিলে সকলেরই মন হু হু করে, যাহাদের সকল প্রিয় পদার্থ পার্শ্বে রহিয়াছে, তাহাদেরই মন কেমন কেমন করে; হৃদয় উদাস হয়, কি যেন কি নাই, কি যেন কি নাই, বলিয়া বোধ হয়। সেই প্রিয়বস্তু সব যদি আবার দূরে থাকে, তাহার আর কথা কি? সে ত উন্মাদ হইবারই কথা।

যক্ষের উন্মাদ একটু আলাদা রকমের। যক্ষ আবোল তাবোল বকে না। উহার উন্মাদে একটু শৃঙ্খলা আছে। সামাজিক বৈষয়িক সকল ব্যাপারের সামঞ্জস্য আছে। নাই কেবল একটী; প্রিয়ার কথা উঠিলে আর ঠিক থাকে না। প্রণয়ের কথা উঠিলে ঠিক থাকে না। সমস্ত জড় পদার্থ চৈতন্যময় হইয়া যায়। আপনিই হইয়া যায়; জড় বলিয়া জ্ঞানই থাকে না।

মেঘ দেখিয়াই মনে হইল শ্রাবণ আসিতেছে, প্রিয়া বাঁচে কি না বাঁচে। পরের দেশে পড়িয়া পরের সুখের স্মৃতিচিহ্ন দেখিয়া যদি আমার এই দশা হইল, তবে সেই বাড়ী, সেই ঘর, সেই বাগান, সেই বাগিচা, সব আছে, কেবল আমি নাই; আমার গৃহিণীর অবস্থা আরও শোচনীয়। তাই ভাবিয়া যক্ষ মনে মনে সংকল্প করিল, একটা সংবাদ পাঠান যাক। মেঘ উত্তর দিকে যাইতেছে, এইই আমার সংবাদ লইয়া যাইবে। যেমন মনে এই কথা উদয় হইল, অমনি—পাগলের মন—সেই দিকেই ছুটিল।

অমনি চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, কুর্‌চি ফুল ফুটিয়াছে, বন আলো করিয়া রহিয়াছে। বর্ষার প্রধান সম্পত্তি কুর্‌চি ফুল। কতকগুলা কুর্‌চি ফুল তুলিয়া মেঘকে উপহার দিল, এই লও মেঘ, আমার প্রীতি উপহার লও। দিয়াই মনে করিল আমার উপহার পাইয়া মেঘ বড় খুসী হইয়াছে। অমনি "আস্‌তে আজ্ঞা হোক" বলিয়া মেঘকে সম্বোধন করিল। ভাবিল, এই মেঘের কাছ থেকে কাজ আদায় করিতে হইবে। ইহার খোসামোদ করিতে হইবে। খোসামোদ যত রকম আছে, সকলের চেয়ে বংশের বর্ণনাই বড় খোসামোদ; আপনার টাকা আছে, কড়ি আছে, বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, যশ আছে, আপনি দাতা, ভোক্তা, বক্তা, বিবেচক ইত্যাদি কথায় যত ফল হয়, তাহার চতুর্গুণ ফল হয়, আপনি বড় বংশে জন্মিয়াছেন, আপনার পূর্ব্বপিতামহগণ কত বড় বড় কাজ করিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি বলিলে। পাগল যক্ষের কিন্তু সে নাড়ীজ্ঞানটুকু টনটনে ছিল, সে মেঘকে দেখিয়াই বলিল আপনি বড় বংশে জন্মিয়াছেন, পুষ্কর আবর্ত্তক প্রভৃতি বড় বড় মেঘ আপনার পূর্ব্বপুরুষ, আপনার বংশ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিখ্যাত। এত বড় বংশ কি আর হয়। তাহার উপর আপনি ইন্দ্রের একজন বড় অফিসার। আপনি ইচ্ছা মত দেহপরিবর্ত্তন করিতে পারেন; কখন বড় কখন ছোট হইতে পারেন। ইচ্ছামত বিচিত্ররূপ ধারণ করিতে পারেন। তাই আমি বড় দুঃখী—প্রিয়া-বিরহী—আপনার শরণাগত হইলাম। বড় লোকের কাছে যাচ্ঞা ব্যর্থ হইলেও তাহাতে দুঃখ নাই। ছোট লোকের কাছে যাচ্ঞা সার্থক হইলেও মনটা ছোট হইয়া যায়।

তোমার একটা বড় গুণ আছে। তুমি তাপিতদিগের তাপ নিবারণ কর। ভূলোক ভুবর্লোক বড় গরম হইয়া উঠিলে তুমি তাহাদের ঠাণ্ডা করিয়া দাও। আমি প্রিয়ার বিরহ-অগ্নিতে পুড়িতেছি। আমার প্রিয়াও প্রিয়বিরহ অগ্নিতে পুড়িতেছেন। অতএব তুমি আমাদের ঠাণ্ডা কর। তুমি আমার সংবাদ লইয়া প্রিয়ার কাছে যাও। কুবেরের শাপে আমাদের বিরহ—মিলনের উপায় নাই। তুমি না দয়া করিলে,

খবরটা লওয়ারও উপায় নাই। তাই বলি, যাও। সে তোমার তীর্থস্থান, সেখানে বাহিরের বাগানে মহাদেব আছেন, তাঁহার কপালের চাঁদের আলোতে চূণকাম করা বাড়ী ঘর সব আরও চূণকাম করা হইয়াছে। তাহার পর আবার বলিতে লাগিল, — তুমি যখন যাইতে থাকিবে, তুমি যখন আকাশে উঠিবে, তখন যাহাদের স্বামী বিদেশে, তাহাদের মনে কত আশা, কত ভরসা, কত সান্ত্বনা আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকিবে। তুমিই তাহাদের আশার মূল, ভরসার মূল ; তাই তাহারা হা করিয়া তোমায় দেখিতে থাকিবে ; পাছে ঝাপটায় চুলগুলা চোখের উপর উড়িয়া পড়িয়া বিঘ্ন করে, তাই সেগুলাকে উঁচা করিয়া মাথার উপর ধরিয়া রাখিবে। আর তাদের চাঁদপানা মুখখানা পুরাপুরিই দেখা যাইবে। তাহারা ভাবিবে, আমার স্বামী এইবার বাড়ী আসিবে। আমার মত পরাধীন বৃত্তি না হইলে আর কেহ কি তুমি সাঁজোয়া পরিয়া উপরে উঠিলে আপনার প্রিয়াকে উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে। যক্ষের যত কেন ঐশ্বর্য্য থাকুক না, যত মান, যত মহিমা, থাকুক না, পরের অধীন বলিয়া তাহার মনে বড়ই ধিক্কার হইয়াছিল। সে ভাবিল আমি যদি চাকরী না করিতাম, যদি দাসত্ব না করিতাম, আজ কি আমার এ দশা হয় ?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যক্ষের উন্মাদে বেশ একটু শৃঙ্খলা আছে। তাহার এক উদাহরণ দেখুন — মেঘকে সে কৈলাসযাত্রা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। যাত্রিক লক্ষণগুলি যে ভাল — তাহা একবার দেখাইয়া দিতে হইবে ; যক্ষ এখন সেই কাজেই ব্যস্ত হইল। সে দেখাইল পবন অনুকূল। আষাঢ় মাসে দক্ষিণ হইতে পবন উত্তরে যাইতেছে, সুতরাং পবন অনুকূল ; বামভাগে চাতক উড়িতেছে। এও একটা সুলক্ষণ। বলাকা মালাবদ্ধ হইয়া পথে তোমার সেবা করিবে। বকপংক্তিও সুলক্ষণ। চারিদিকে সুলক্ষণ। এমন মাহেন্দ্রযোগ আর হবে না। এইবার ওড়।

তবে একটী কথা আছে, মেঘ মনে করিতে পারে "তাকে কি

দেখিতে পাব ?” যক্ষ তাই বলিতেছে, পাবে বই কি ? দেখিবে, সে কেবল দিন গুণিতেছে। তাহার স্বামীর সে একমাত্র পত্নী। যদি স্বামীর বহুপত্নী থাকে সে স্বামীর বিরহটা তত লাগে না, কিন্তু যদি স্বামীর আর না থাকে ? পত্নীর ত আর নাইই, তবে সে পত্নীর আশা বড় আশা। সুতরাং সে মরিবে না। দেখিবে সে মরে নাই। তোমার যাত্রা বিফল হইবে না। তোমার সে ভ্রাতৃজায়া মরে নাই। সে কি মরিতে পারে ? এখনও যে মিলনের আশা আছে। সে কি মরিতে পারে ? বোঁটায় যেমন ফুলটী আটকাইয়া রাখে, সেইরূপ আশায় রমণীহৃদয় আটকাইয়া রাখে। বোঁটাটী শুকাইলে যেমন ফুলটী ঝরিয়া পড়ে, আশা ফুরাইলে রমণীর প্রাণ কর্পূরের মত উপিয়া যায়।

“পথ যে বড় দূর, বড় দুর্গম, একাকী এত পথ যাওয়া যায় কি গা ?” এ কথা মনে ভাবিও না। তোমার গর্জ্জনে কাণ জুড়াইয়া যায়, সেই গর্জ্জনে মাটী ফুঁড়িয়া ভূঁইচাঁপার ফুল বাহির হয়, বড় সুলক্ষণ পৃথিবী শস্যশালিনী হইবে। সুতরাং পৃথিবী তোমার অনুকূল। পথ দুর্গম হইবে না। আর তোমায় দেখিয়া মানসসরোবরে যাইবার জন্য হংসগুলা বড়ই উৎকণ্ঠিত হইবে, তাহারা পথে মৃণালের টুক্‌রা মুখে করিয়া কৈলাস পর্ব্বত পর্য্যন্ত অর্থাৎ তুমি যত দূর যাইবে তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। তোমার পয়সা খরচ করিয়া লোক লইতে হইবে না, তোমার সব দিকেই সুবিধা, আর দেরী নয়।

এখন চট্‌পট্‌ এই শৈলরাজকে আলিঙ্গন করিয়া উহার নিকট বিদায় গ্রহণ কর। এ তোমার পরম মিত্র, তোমায় অনেক দিনের পর দেখিলে উহার তাপ দূর হয়; তাই পর্ব্বতগাত্র হইতে ভাব উঠে। আর তোমার শরীরস্পর্শে উহার স্নেহ প্রকাশ হয়, তাই পর্ব্বতগাত্রে শিশিরের ন্যায় জলবিন্দু দেখা যায়। উহাকে আলিঙ্গন করিলে তোমার শরীর পবিত্র হইবে। কারণ তোমার বন্ধু বড় যে সে লোক নয়; উহার প্রতি নিতম্বে প্রতি মেখলায় জগৎপাবন রামচন্দ্রের জগৎপাবন পদচিহ্নসমূহ বিরাজ করিতেছে।

এই পর্ব্বত সরগুজারটী াজ্যের মধ্যে। উহা একটী ক্ষুদ্র সমতল হইতে আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। উহার মাথায় শিখর আছে। শিখরে অনেকটা সমতল ভূমি। যেখান হইতে শিখরটী উঠিয়াছে, তাহার চারিদিকে পর্ব্বতের নিতম্ব। ইহাতে উঠিবার জন্য তিন দিক হইতে পথ আছে। উত্তরের পথটী প্রশস্ত, পশ্চিমেরটী বড়ই খাড়াই। পূর্ব্বের দিকে আরও একটী আছে। সে নিম্নস্থিত ক্ষুদ্র সমতলে নানা স্থানে আশ্রম ছিল। প্রায় সকল আশ্রমেই রামচন্দ্র কখন না কখন কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যক্ষ বেচারা যে কোথায় থাকিত তাহার ঠিকানা নাই। তবে এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, যেদিন সে প্রথম মেঘ দেখিয়া পাগলপারা হইয়া যায়, সেদিন বৈকাল বেলায় সে পাহাড়ের দক্ষিণে এবং একটু দক্ষিণপূর্ব্বে — একটু দূরে উত্তর দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিল। রেলগাড়ি চলিয়া গিয়াছে, আর ধুমাও দেখা যায় না। তবুও যেমন স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া আধ ঘণ্টা ধরিয়া সেই দিকেই চাহিয়া থাকে, সেইরূপ যক্ষ বেচারা অলকা দূরে হইলেও, দেখা যাবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, সর্ব্বদাই উত্তরমুখে সেই দিকেই চাহিয়া থাকিত।

যক্ষ বলিতেছে। তাহার পর শোন, রাস্তা বাৎলিয়া দিতেছি, শোন। যে সে রাস্তায় ত তুমি যাইতে পারিবে না, যেখানে পাহাড় পর্ব্বত বেশী, যেখানে উচ্চ উচ্চ পাহাড়, সেখানে ত তুমি ঠেকিয়া যাইবে। প্রশস্ত পথ না পাইলে তোমার বিশাল বপু্ ত চলিতে পারিবে না। সুতরাং তুমি কোথাও খাড়াখাড়া যাইতে পারিবে না ; তোমায় বাঁকিয়া চুরিয়া যাইতে হইবে। বিশেষ এখন তুমি জলভরা। শরতের মেঘের মত খুব উচ্চে উঠিতে পারিবে না। তোমায় ২।৩ হাজার ফুটের মধ্যেই উড়িতে হইবে। সুতরাং অনেক ছোট পাহাড়েও তোমার বাধিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

তাই বলিতেছি, তোমার যাবার মত রাস্তা তোমায় বাৎলাইয়া দিতেছি। তাহার পর তোমায় আমার সখীসংবাদ শুনাইয়া দিব ;

তোমার কাণ ভরিয়া যাইবে, কাণ জুড়াইয়া যাইবে। তুমি যখন বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, পর্ব্বতের মস্তকে বিশ্রাম করিয়া যাইও। যখন বড় কাহিল হইয়া পড়িবে, স্রোতের জল পান করিও। সে জল অতি লঘু, শীঘ্র হজম হইয়া যাইবে ; সুতরাং শরীর ভার হইবে না। তুমি যখন সাঁ সাঁ করিয়া উত্তরমুখে চলিবে, তখন সরল-স্বভাব সিদ্ধ-কন্যারা শিহরিয়া উঠিয়া আগ্রহের সহিত দেখিতে থাকিবে। কারণ, তাহাদের হঠাৎ মনে হইবে যেন বাতাস পর্ব্বতশৃঙ্গ হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, হিমালয়ের পাদদেশবর্ত্তী বনরাজী ও বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণপাদস্থ বনরাজী সিদ্ধগণের নিবাসভূমি বলিয়া বিখ্যাত। লোকের এখনও বিশ্বাস, অনেক সিদ্ধ পুরুষ এখনও এই সকল অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। উঁহারা তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া সিদ্ধনামক দেবযোনিতে পরিণত হইয়াছেন। তাই উঁহাদের অঙ্গনা আছে, পরিবার আছে ; নচেৎ তপঃসিদ্ধের পরিবার কিরূপে হইবে ? এ স্থানের বেত গাছ দেখিতে বড় সুন্দর। তুমি এখান হইতে উত্তরমুখে আকাশে উঠ গিয়া। দিঙনাগেরা তোমার গায়ে শুঁড় বুলাইতে আসিলে, সেখান হইতে সরিয়া পড়িবে। মল্লিনাথ এইখানে নিচুল ও দিঙনাগ নামে দুইজন পণ্ডিতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নিচুল কালিদাসের পক্ষপাতী এবং দিঙনাগ অতিবিরোধী। তাঁহার মতে উভয়েই কালি-দাসের সমকালীন, তাই তিনি নিচুল বেত গাছকে নিচুল কবি, আর দিঙনাগকে দিঙনাগ পণ্ডিত বলিয়া মনে করিয়াছেন। এবং তাঁহার কথার উপর বিশ্বাস করিয়া লোকে কালিদাসকে দিঙনাগ নামক বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর সমকালীন ও ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক স্থির করিয়াছেন। বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী দিঙনাগের বাড়ী কাঞ্চী, মেঘ উড়িতেছে রামগিরি হইতে। রামগিরি সরগুজার অন্তর্গত রামগড়, সুতরাং কাঞ্চীর দিঙনাগ মেঘের গায়ে শুঁড় বুলাইবে কিরূপে ? কাঞ্চী রামগড় হইতে ৫০০ মাইল দক্ষিণে। এ দিঙনাগ সমূহের সঙ্গে সে দিঙনাগের কোনও সম্পর্ক আছে বোধ হয় না। আর যদিই হয়, এ দিঙনাগ ও বৌদ্ধ দিঙনাগ এক ব্যক্তি,

ইহাও প্রমাণ-সাপেক্ষ। মনে করি ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া প্রত্নতত্ত্বের কচকচি তুলিব না, কিন্তু ক্রনিক রোগ ; না তুলিয়া থাকিতে পারি না।

ঐ দেখ ঐ বল্মীকের অগ্রভাগ হইতে ইন্দ্রধনু উঠিতেছে। পর্ব্বতে ইন্দ্রধনু অনেক নীচু পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয় যেন একটা কোন অল্প উচ্চ জায়গা — উইএর ঢিপি হইতে উঠিতেছে। বোধ হইতেছে যেন নানাবিধ মণিমাণিক্যের রশ্মি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া ধনুকের আকার হইয়াছে। ঐ ধনু যখন তোমার মাথায় লাগিবে, বোধ হইবে যেন চিকণ কালার চূড়ায় ময়ূরের পেখম নাচিতেছে।

এখানে একটু বিশেষ কথা আছে। বৈকালবেলা রামধনু উঠিলে পূর্ব্ব দিকে উঠিবে। উত্তরায়ণ — একটু দক্ষিণে হেলিয়া উঠিবে। মেঘ যখন মলয়-মারুত-তাড়িত হইয়া উত্তরে যাইতে থাকিবে একবার না একবার ঐ বাঁকা ধনুর আগা তাহার মাথায় ঠেকিবে। তখন দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামের মাথায় ময়ূরের পেখমের মত নিশ্চয়ই দেখাইবে। কারণ সে পেখম সবাই জানে — তেড়া করিয়া বসান ও বামে হেলা। উত্তরগামী মেঘের মাথায় রামধনু তেমনি তেড়া করিয়া বসান। তফাৎ কেবল এটা ডাইনে হেলা।

সকলেই জানে বৃষ্টি নহিলে চাস হয় না। বৃষ্টি তোমার আয়ত্ত, তাই তুমি উঠিলে যত পাড়াগেঁয়ে মেয়েরা তোমার দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকে। তাহাদের সে দৃষ্টিতে হাব নাই, ভাব নাই, চাতুর্য্য নাই, বিলাস নাই, বিভ্রম নাই, আছে কেবল প্রাণ কেড়ে নেওয়া প্রীতি আর চোখ জুড়ান মধুরিমা। তাহাদের এতই আগ্রহ, এমনি সরলতা, আর হৃদয়ের এতই আবেগ যে, বোধ হয় যেন তাহারা তোমাকে পানই করিয়া ফেলিবে। এইভাবে তুমি উঁচু চসা ভূঁয়ের উপর উঠিবে। নীচু জমীর উপর হইতে পাহাড় উঠে। খানিক পাহাড় উঠিলে তাহার উপর সময়ে সময়ে সমতল বা প্রায় সমতল ভূমি হয়। উহার নাম মালভূমি। অনেক মালভূমি আছে বলিয়া ভারতের অনেক প্রদেশের নাম মালব। মালভূমি সূর্য্যের আতপে বড়ই তাপিত হয়,

তাই চাস করিবার পর এক আছড়া জল হইলে একটা খুব সোঁদা গন্ধ বাহির হয়। তুমি সেই গন্ধ সুঁকিতে সুঁকিতে সেই মালভূমির উপর দিয়া খানিক পশ্চিম দিকে যাও তাহার পর আবার উত্তরমুখে যাইও।

এইখানে কালিদাস একটু চাতুরী খেলিলেন। মেঘকে খানিকটা পশ্চিমমুখে পাঠাইলেন। কারণ মেঘ যদি বরাবর রামগিরি হইতে উত্তরমুখে যায়, সে আবার সেই গঙ্গাযমুনা সঙ্গম দিয়া অযোধ্যা দিয়া যাইবে, সুতরাং রঘুবংশের ত্রয়োদশে যে পথে পুষ্পক রথ গিয়াছিল, মেঘকেও সেই পথ দিয়া যাইতে হইবে। কবির প্রিয়ভূমি সকল দেখান হইবে না। তাই কবি কৌশল করিয়া উঁচু জমীর উপর দিয়া মেঘকে খানিকটা পশ্চিম দিকে সরাইয়া দিলেন। পথটা একটু তের্ছা হইল কিন্তু কবির নূতন জগৎ দেখাইবার বড় সুবিধা হইল। কবি ইহার পর উজ্জয়িনী দেখাইবার জন্য পথটা আরও তের্ছা করিয়াছেন।

অথবা রামগিরির আকার ও অবস্থান দেখিলে দেখা যাইবে যে উহা একটী ক্ষুদ্র সমতল হইতে উঠিয়াছে, ঐ ক্ষুদ্র সমতলের উত্তর-পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ধনুরাকারে অভ্রভেদিনী পর্ব্বতমালা। রামগিরিকে আলিঙ্গন করিয়া উত্তরমুখে উঠিতে গেলেই মেঘ মহাশয় এই ধনুরাকার পর্ব্বতে বাধিয়া যাইবেন, তাই কালিদাস বলিয়াছেন উত্তরমুখ উঠিয়াই একটু পিছু হঠিয়া যাইবে, তাহার পর আবার উত্তরমুখে যাইবে। কিন্তু এবারও অভ্রভেদী পর্ব্বত। দক্ষিণ হইতে বাতাস মেঘকে উত্তর দিকে ঠেলিলে পাহাড়ে বাধা পাইয়া মেঘ পশ্চিমে যাইবে। এইরূপ ভাবে উত্তরমুখে যাইতে গেলেই এই মালভূমি উঠিতে গেলেই – মালব-দেশে প্রবেশ করিতে গেলেই – প্রথমেই আম্রকূট পর্ব্বত – এখনকার অমরকণ্টক। এই বিস্তৃত পর্ব্বতের একটীমাত্র উচ্চ শিখর। পর্ব্বতটী অনেক দূর লইয়া মোচাগ্র আকারে উঠিয়াছে; ইহার এক দিক দিয়া নর্ম্মদা আর এক দিয়া মহানদী ও আর এক দিক দিয়া শোণ নদী প্রবাহিত হইতেছে। অনেক দূর লইয়া থর করিয়া মোচাগ্র আকারে আম্রকূটের উচ্চ শৃঙ্গ উঠিয়াছে। সে তোমার কাছে বড় ঋণী, তাহার

বন যখন দাবানলে পুড়িতে থাকে, তখন তুমিই ধারাবৃষ্টি করিয়া সে দাহ নিবারণ করিয়া থাক। তাই তোমার কথা মনে হইলে তাহার আনন্দ হয়। সে নিশ্চয় তোমায় মাথায় করিয়া রাখিবে। এক সময়ে তুমি তাহার যথেষ্ট উপকার করিয়াছ ; এখন তুমি যদি পথক্লান্ত হইয়া তাহার নিকট আশ্রয় চাও—সে ত আর ছোট লোক নয়—তাহার মস্তক উন্নত—সে এমন কাজ কখন করিবে না যাহাতে উচ্চ মাথা হেঁট হয়। সে অবশ্যই তোমায় মাথায় করিয়া রাখিবে। সেই মোচাগ্র আকার উত্তুঙ্গ পর্ব্বতচূড়ার উপর তুমি বসিবে। তোমার আকার যেন একটী তেল কুচকুচে কাল খোঁপা। শিংদার ফিরিঙ্গী খোঁপা নয়, দিশি—সেকেলে—মাথার মাঝখানে থাকা—নীচে মোটা, উপরে সরু, ঘন, কৃষ্ণকাল খোঁপা। তোমার নীচে মোচাগ্র আকার প্রকাণ্ড বিস্তার পর্ব্বতশিখর, অনেক জমী ব্যাপিয়া আছে, আর রাশি রাশি বনের আম পাকিয়া পর্ব্বতের বাহির দিকটা পাকা আমের রঙে রঙ করিয়া তুলিয়াছে। পাকা আমের রঙে আর রমণী শরীরের দুধে আলতা রঙে প্রভেদ আছে কি ? কিছুই নাই। এখন ভাব দেখি, দুধে আলতা রঙের সেই প্রকাণ্ড মোচাগ্র আকার পাহাড়টীর উপর, কাল মেঘ খোঁপার মত হইয়া বসিলে, উপর হইতে দেবতারা যখন যুগলমিলনে মিলিত হইয়া দেখিবে, তখন উহা পৃথিবীর কিসের মত দেখিবে।

সে পর্ব্বত আগাগোড়া গাছপালায় ঢাকা—অনেক জায়গায় কুঞ্জবন আছে, আর সে নির্জ্জন নিভৃত কুঞ্জগুলি বনবাসিনীদের আনন্দের স্থান। তুমি তথায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবে, অনেক জল বর্ষণ করিয়া দিবে, একটু হালকা হইবে ; শীঘ্র শীঘ্র খানিক দূর গিয়া দেখিবে নর্ম্মদা নদী। মনের উৎকট আবেগে রোগা হইয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতের পায়ে গড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কি উৎকট অবস্থা! বিন্ধ্যের পা গুলা কি যেমন তেমন পা, পাহাড়ে, পাথরে, ডেলায়, ডুমরিতে এব্ড়খেব্ড়। যেন কোন গোদা মিন্সের পায়ে ধরিয়া নর্ম্মদা আলুথালু ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। নিম্নে স্বচ্ছসলিলা বিস্তীর্ণা নর্ম্মদা, উপরে কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ

অবস্থিত বনরাজিবিরাজিত বিন্ধ্য পর্ব্বত। মাঝে মাঝে শাদা ঝরণা পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়া নর্ম্মদায় পড়িতেছে, উপর হইতে বোধ হইতেছে যেন একটা হাতীর শিঙার হইয়াছে। বড় বড় শাদা শাদা লাল লাল কাল কাল ডোরা দেওয়া হাতীর শিঙার যিনি দেখিয়াছেন তিনিই এ উপমার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিবেন।

তুমি জল ঢালিয়া নর্ম্মদার জল লইয়া প্রস্থান করিবে। এইখানে জাম গাছের নিবিড় বন। জলের বেগ জাম গাছের ঝাড়িতে ঝাড়িতে আটকাইতেছে। গাছে গাছে লাফাইয়া পড়িতেছে, আর মলা কাটিয়া হাল্‌কা হইতেছে। বিন্ধ্য পর্ব্বত গজের আকর অর্থাৎ হাতীখেদার একটা প্রধান স্থান। পালে পালে হাতী পড়িয়া নর্ম্মদার জলকে তাহাদের মদজলে সুরভি করিয়া তুলিয়াছে। তুমি ঐ জল পেট পূরিয়া লইও, তাহা হইলে বায়ু তোমায় তুলার মত উড়াইয়া দিতে পারিবে না। খালি হইলেই লঘু হয়, পূরা হইলেই ভারি হয়। তুমি জল পূরিয়া ভারি হইও। কথাগুলি সংস্কৃতে এমনি করিয়া সাজান আছে যে উহার ভিতরে ভিতরে আর একটা অর্থ রহিয়া গিয়াছে। যদি রোগীকে বমন করাইয়া তাহাকে লঘু তিক্ত কষায় জল খাওয়ান যায় এবং ক্রমে তাহার বলাধান হয় তাহা হইলে বাতে তাহার কাঁপনি জন্মাইয়া দিতে পারে না।

তুমি যেখানে যেখানে যাইবে কদম্ব ফুল ফুটিবে। কদম্ব-গোলের গাত্রস্থিত অসংখ্য কুঁড়িগুলি ফাটিয়া কেশর বাহির হইতে থাকিবে, কতক বাহির হইয়াছে কতক হয় নাই। এরূপ অবস্থায় উহার বিচিত্র বর্ণ বিকাশ হইবে। খানিকটা কাঁচা সুতরাং সবুজ, খানিকটা পাকা, সুতরাং পাঁশুটে, উভয়ের মিশ্রণে কি বিচিত্র শোভাই হইয়া উঠিবে। তুমি যেখানে যেখানে যাইবে দেখিবে জলভূমে ভুঁইচাপার প্রথম কুঁড়িগুলি বাহির হইতেছে, আর তুমি যেখানে যেখানে যাইবে ভূমি হইতে বিচিত্র সোঁদা গন্ধ বাহির হইবে। হরিণগুলি কদম্ব ফুল দেখিয়া, ভুঁইচাপার ফুল খাইয়া, ও সোঁদা গন্ধ শুঁকিয়া, মদভরে লম্ফঝম্ফ করিবে

আর লোককে দেখাইয়া দিবে এই পথে তুমি বৃষ্টি করিয়া গিয়াছ।

হে সখে, তুমি আমার প্রিয়ার জন্য যাইতেছ। আমার প্রাণও আকুল হইয়াছে আর দেরী সয় না। তথাপি আমি দেখিতেছি যে প্রতি পর্ব্বতেই তোমার বিলম্ব হইবে। কুর্চি ফুল তোমার বড় প্রিয়। পর্ব্বতগুলি টাটকাফোটা কুর্চির গন্ধে ভর ভর করিতেছে, তুমি নিশ্চয়ই একটু গড়িমাসি করিবে; তাহার উপর আবার যখন ময়ূরেরা তাহাদের শ্বেতবর্ণ নয়নপ্রান্ত ঘুরাইয়া সজলনয়নে কেকা উচ্চারণ করিয়া তোমার সম্বর্দ্ধনা করিবে, প্রাণের বঁধু, এস হে এস হে বলিয়া তোমায় আগু বাড়াইয়া লইতে আসিবে; আহা যাহারা তোমার সাড়া পাইলে নাচিয়া উঠে তাহারা যখন প্রাণ খুলিয়া ডাকিবে, তোমার সাধ্য কি যে তুমি চট্‌পট্ তাহাদের ছাড়িয়া যাও।

তুমি অধিষ্ঠান হইলে দশার্ণ-দেশ অর্থাৎ পূর্ব্ব মালবের কি সুন্দর অবস্থা হইবে জান কি? উহার প্রান্তদেশে নিবিড় জাম গাছের বন। তোমার আগমনে জামের ফল সব একেবারে পাকিয়া উঠিবে, গাঢ় সবুজ জামের পাতা, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ জামের ছাল, তাহার উপর কুচকুচে কাল রাশি রাশি ফল, কালয় সবুজে কালয় কালয় কালতর কালতম হইয়া উঠিবে। মালব দেশ ভারতের বাগান, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাগান, বেড়ায় কেবল কেয়া ফুলের গাছ, তুমি গেলে কেয়া ফুলের কুড়িগুলির ডগার কাঁটা ছাড়িতে ছাড়িবে। পাপড়ি এখনও দেরি আছে, রাশি রাশি ফুল, কেবল শাদা, যেটুকু ফুটিয়াছে তাহাও শাদা; আবার শাদায় শাদায় শাদা হইয়া যাইবে। তুমি গেলে কাককুল বড় বড় গাছের আগায় বাসা করিতে থাকিবে, আর তাহাদের কলরবে গাছটা শুদ্ধ কলরবময় হইয়া উঠিবে। তুমি তথায় গেলে তোমার সঙ্গে যে হাঁসগুলা মানস-সরোবরে যাইতেছিল তাহারা দশার্ণ-দেশে কয়েক দিন থাকিয়া যাইবে।

দশার্ণের রাজধানী বিদিশা। উহার যশে ভুবন ভরিয়া আছে। তুমি বিলাসী; তুমি সেখানে গেলে তোমার বিলাস বাসনা সফল হইবে; তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। কারণ তুমি তথায় বেত্র-

বতীর জল প্রচুর পরিমাণে পান করিবে। বেত্রবতী নদী, সুতরাং তোমার রসরঙ্গিণী; সে বিদিশার পাশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে; উহার জল চলিতেছে, তরঙ্গে তরঙ্গে লাফাইতেছে, বোধ হইতেছে যেন কোন প্রৌঢ়া কামিনী মুখে ভ্রূভঙ্গি করিয়া তোমায় ডাকিতেছে। সুতরাং সে জল পান তোমার মুখে চুম্বনের ফল হইবে। শুধু কি তাই কেবল, জল গভীর নদীগর্ভে পার্শ্বস্থ উপলে গভীর নাদে আছড়াইয়া পড়িতেছে, দূর হইতে তাহার প্রতিধ্বনি হইতেছে; বোধ হইতেছে যেন বিলাসিনী আবেগ ভরে না আ আ না আ আ এই অব্যক্ত মধুর ধ্বনি করিয়া "আশা পূরে নাই আশা পূরে নাই" এই কথা বলিয়া দিতেছে। ভ্রূ-ভঙ্গির সহিত গিরিনদীর তরঙ্গের তুলনা কি মধুর! ভ্রূ কুঞ্চিত হয়, প্রসারিত হয়, কাঁপে, তরঙ্গের আকারও কোথাও প্রশস্ত কোথাও কুঞ্চিত কোথাও বা নর্ত্তিত হয়।

সেখানে গিয়া তুমি নীচৈ নামে সহরতলীর পাহাড়ে বাসা লইও। তোমার স্পর্শে তাহার শরীর পুলকে পূরিত হইয়া উঠিবে। দেখিবে তাহার পুলক কদম্ব ফুলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পাহাড়টী কূর্ম্মপৃষ্ঠ ৩০০।৪০০ ফুটের অধিক উচ্চ নহে। ইহা বৌদ্ধ বিহার, বৌদ্ধ স্তূপ ও বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে এককালে মণ্ডিত ছিল, আর স্থানে স্থানে পাথর দিয়া গাঁথা এক একটা খালি ঘর নির্জ্জনে পড়িয়া থাকিত। এরূপ নগরের বাহিরে নির্জ্জন ঘর দেখিতে চাও, হিমালয়ের সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবে। ও ঘরে কি হয়? — এমন কিছু নয় — একটা ঢেটরা হয়। কিসের ঢেটরা — এই কথা যে, নগরবাসীদের যৌবন দড়ি ছেঁড়ে — স্মৃতির লাগামে, ধর্ম্মের বন্ধনে, উপদেশের নাগপাশে, আর বাঁধা থাকে না। মিথ্যা কথা; নির্জ্জন ঘর ঢেটরা দিতেছে — সৎপ্রতিপক্ষ বাক্য — (contradiction in terms)। দূর মুর্খ দেখিতেছিস না — নাক কি নাই? ও কিসের গন্ধ? ও যে পরিমল, — চটকান ফুলের গন্ধ — ঐ ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইতেছে — বুঝিতেছিস না কে ঐ ফুল চটকাইল —

কখন চটকাইল, কেমন করিয়া চটকাইল—যদি না বুঝিয়া থাকিস যা—তোর মেঘদূত পড়িতে হইবে না।

নীচু পাহাড়ে একটু বিশ্রাম করিবে। তাহার পর আবার চলিতে থাকিবে। ছোট নদীটী, ধারে ধারে বড় বড় ফুলবাগান কেবল যুঁই ফুলের গাছ; কত ফুল ফুটিয়াছে, সেই ফোটাফুলে দুএক আছড়া টাটকা জল দিবে। সেখানে তোমার অনেকের সঙ্গে আলাপ হইবে। তুমি যেমন লোক তেমনি লোকের সঙ্গে আলাপ হইবে। রসিকারা ফুল তুলিতেছেন—গাল বাহিয়া ঘাম পড়িতেছে—আঁচল ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। মুছিবার কিছুই নাই, তাই কাণ হতে যে পদ্মের কুণ্ডল ঝুলিতেছিল তাই দিয়া ঘাম মুছা হইতেছে, আর পদ্মটী মলিন হইয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় তোমার দেহের নীচে যদি তাহারা একটু ছায়া পায়, আনন্দ-বিস্ফারিত-নেত্রে মুখ উচা করিয়া কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তোমায় দেখিবে। সেই নিষ্কলঙ্ক মুখের সঙ্গে তোমার খানিক আলাপ হইবে।

তুমি উত্তর দিকে চলিয়াছ। উজ্জয়িনী বিদিশা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম। সুতরাং উজ্জয়িনী যাইতে হইলে তোমায় বাঁকিয়া যাইতে হইবে। তথাপি আমার অনুরোধ—আমারই কাজে তুমি যাইতেছ—উজ্জয়িনী না দেখিয়া যাইও না। উহার অট্টালিকার ক্রোড়ে না বিশ্রাম করিয়া যাইও না। তুমি যখন উপর দিয়া যাইবে, অট্টালিকার উপরগুলি—ছাদগুলি—ক্রোড়গুলি তোমায় ডাকিবে। তাহাদের মনোরথ পূর্ণ করিয়া যাইও। উজ্জয়িনীর পুরবাসিনীগণের নয়ন বড়ই মনোহর। উহাদের অপাঙ্গ নিরন্তর চঞ্চল, চোখের কোলে নৃত্য যেন লেগেই আছে। সে নৃত্যের চাঞ্চল্যই বা কত? তার কাছে বিদ্যুতের খেলা কোথায় লাগে। তাদের সেই বিদ্যুদ্বিলাসী নয়নের সঙ্গে যদি খেলা খানিক না করিতে পারিলে, তবে তুমি নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইলে—আত্মবঞ্চনা করিলে—জন্মটা বিফলে গেল।

বিদিশা হইতে একটু পশ্চিমে নির্ব্বিন্ধ্যা। কূর্ম্মপৃষ্ঠ বিন্ধ্যের উপর

হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তরমুখে চম্বলে পড়িতেছে। নদীর খোলা ঢালু জমীর বশে যাইতেছে। দক্ষিণে উঁচা যত উত্তরে যাইতেছে ততই নীচু হইতেছে। নদীটী গিরিনদী, খাদটী বড় বড় পাথরে ভরা। স্রোতের জল যেন পাথরে পাথরে হোঁচট খাইয়া পড়িতেছে। যেখানে পাথর নাই জল গভীর স্থিরভাবে চলিতেছে তাহার মাঝে মাঝে ঘোল হইতেছে ; বোধ হইতেছে যেন বিলাসিনী তোমায় নাভি দেখাইতেছে। স্মৃতিশাস্ত্রে নাভি দেখান নিষেধ। নির্ব্বিন্ধ্যা বড় বেহায়া, তাই নাভি দেখাইতেছে ; হোঁচট খাইয়া পড়িতেছে ; আর কি করিতেছে জান ? চন্দ্রহার ছড়াটা ঝম্‌ঝম্ করিয়া নাড়িতেছে। ও চন্দ্রহার পাইল কোথায় ? কেন ঐ যে হাঁসগুলা সারি দিয়া পার হইয়া যাইতেছিল, তাহার সারিটী কেমন বাঁকিয়া চন্দ্রহারের মত অর্দ্ধবৃত্তাকার হইয়া পড়িয়াছে দেখিতেছ না ? স্রোতের মুখে কি ও সার ঠিক থাকে। তাহার পর আবার স্রোতের যত ধাক্কা লাগিতেছে, ততই হাঁসগুলা প্যাঁক্ প্যাঁক্ করিয়া খাদে শব্দ করিতেছে। চন্দ্রহারের শব্দটী কি ঐ রকম নয় ! নির্ব্বিন্ধ্যা যখন তোমার জন্য এত পাগলিনী তখন তোমার উহাকে বঞ্চিত করা কি উচিত ! যদি বল নির্ব্বিন্ধ্যা আমায় ডাকে কই—আমি বলি ঐ যে অত রঙ্গভঙ্গী—ও কি ডাক নয় ?

স্ত্রীলোকে যাহাকে কামনা করে সংস্কৃতে তাহাকে সুভগ বলে অর্থাৎ ladies' man। হে মেঘ তুমি বড় সুভগ—সকল নদীই তোমাকে কামনা করে। ঐ দেখ—সিন্ধু কূর্ম্মপৃষ্ঠ বিন্ধ্যের উপর হইতে উৎপন্ন হইয়া ঠিক সোজা খাড়া খাড়া উত্তরমুখে গিয়া চম্বলে পড়িতেছে। তোমার বিরহে বেচারা রোগা হইয়া গিয়াছে, একটী সরু জলধারামাত্র আছে। এ পাশ হইতে দেখিতেছ না উহা ক্রমে আরও সরু, আরও সরু, হইয়া একটা চুলের বিনুনীর মত হইয়া শেষে মিলাইয়া গিয়াছে। বিরহে বেচারা পাণ্ডাস হইয়া গিয়াছে—তীরতরু সমূহের যত রাজ্যের শুকনা পাতা চড়ায় পড়িয়া আছে, বোধ হইতেছে নদীটাই বিরহে পাণ্ডাস হইয়া গিয়াছে—তোমারই সৌভাগ্য। যাহার বিরহে রমণী

এত কাতরা তাহার চেয়ে সুভগ আর কে ? দেখ সে কত পতিপ্রাণা ; এখন সে বেচারার ক্ষীণতা যাহাতে ঘুচে, সেটা করিয়া দাও—সে ত তোমারই হাত।

সিন্ধু নদী পার হইয়াই অবন্তী। সেখানে সকলেই বৃহৎকথা পড়িয়াছে। গ্রামবৃদ্ধেরা বৃহৎকথার গল্প—উদয়নের গল্প লইয়া দিন-যামিনী যাপন করে। অবন্তীর রাজধানী বিশালা বা উজ্জয়িনী। এত সম্পদ আর কোথাও নাই। পূর্ব্বেই তোমায় বলা আছে, তুমি উজ্জয়িনী যাও। সে ত পার্থিব নগর নয়—সে যে স্বর্গের একটা খণ্ড—বড় শোভাময় খণ্ড—স্বর্গের খণ্ড পৃথিবীতে আসিল কিরূপে ? যে সকল স্বর্গবাসী লোক পৃথিবীতে আসিয়াছেন তাঁহাদের যে পুণ্যটুকু এখনও ক্ষয় হয় নাই সেই পুণ্যটুকুর জোরে ঐ স্বর্গটুকু পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে।

সেখানে রমণীরা কেলিলীলায় ক্লান্ত হইয়া পড়িলে শীতলস্পর্শ শিপ্রা নদীর বায়ু তাহাদের ক্লান্তি দূর করিয়া দেয়। শিপ্রাবায়ু ফুটন্ত পদ্ম হইতে সৌরভ গায়ে মাখিয়া সুরভি হইয়া উঠে, আর সারসেরা সরোবরে যে অব্যক্ত মধুর ধ্বনি করিতে থাকে সে ধ্বনিকে অনেক দূরে লইয়া যায় ; অনেক দীর্ঘ করিয়া দেয়। শিপ্রাবাত যে কার্য্য করে দেয়, তাহা আবার একজন মাত্র করিতে পারে সে কে ? প্রিয়তম। তিনি কি করিয়া ক্লান্তি দূর করেন, প্রথম অঙ্গানুকূল কার্য্য করিয়া অর্থাৎ গা হাত পা টিপিয়া আর দলিত পুষ্পের পরিমল শুঁকাইয়া এবং অনেক মন জোগান কথা কহিয়া অনেক মনরাখা কথা কহিয়া—সে কথাও এত লম্বা ও এত মিষ্ট যে কোথায় লাগে সারসের কূজন তাহার কাছে ? তাঁহার এত খোসামোদের দরকার ? এত ক্লান্তি ত তাঁহারই পূজায়, আবার খোসামোদ কেন ?—ভবিষ্যতের আশার—সেও বেশী দূর ভবিষ্যৎ নয় !!!

উজ্জয়িনী গেলে তোমার অনেক উপকার। রমণীরা ধূপ জ্বালাইয়া চুলে বাস দিবে, আর সেই ধূপের ধূঁয়া জানালা দিয়া বাহির হইয়া

তোমার গায়ে লাগিবে ও তোমার দেহ পুষ্ট করিয়া দিবে। নিজের দেহটা স্বচ্ছন্দ হবে, Waltairএ যাইতে হইবে না। সেখানে বাড়ী বাড়ী তোমার অনেক বন্ধু আছে; তাহারা আনন্দে উন্মত্ত হইয়া তোমার সম্মানার্থ নৃত্য করিবে। যেমন বড় লোক আসিলে তাঁহার সম্মানার্থ বাইনাচ হয়, তোমার জন্য সেইরূপ ময়ূরনাচ হইবে। দেখিবে উজ্জয়িনীর বড় বড় বাড়ীর কত শোভা—ফুলের গন্ধে সব তর—আর সব বাড়ীতেই সুন্দরীদের আলতাপরা পায়ের দাগ—বোধ হয় যেন লক্ষ্মী পূজার দিনে বাড়ীময় লক্ষ্মীঠাকুরাণীর পায়ের দাগ দেওয়া রহিয়াছে।

উজ্জয়িনীতে গন্ধবতী নদীর তীরে মহাকালের মন্দির। তুমি যখন সেখানে যাইবে, মহাদেবের প্রমথগণ একদৃষ্টে তোমার দিকে চাহিয়া থাকিবে। কারণ তাহারা তোমার কুচকুচে কাল রঙে মহাদেবের গলার শোভা দেখিতে পাইবে। তাই একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিবে। মন্দির সংলগ্ন একটী প্রকাণ্ড ফুল বাগান। গন্ধবতীর বায়ু পদ্মের গন্ধ মাখিয়া, পদ্মের রজ সর্ব্বাঙ্গে অঙ্কিত করিয়া, আর যুবতীরা যে গন্ধতৈল মাখিয়া নাহিতেছেন তাহার গন্ধ অপহরণ করিয়া, বাগানের প্রত্যেক ফুলগাছ—প্রত্যেক লতা কাঁপাইতেছে।

হে জলধর, যদি অন্য সময়েও মহাকালের মন্দিরে উপস্থিত হও, তাহা হইলেও সূর্য্যদেব যতক্ষণ না অস্তাচলে যান, ততক্ষণ তোমার প্রতীক্ষা করা উচিত; কারণ আরতির সময় মেঘগর্জ্জন হইলে তাহাতে আরতির ঢাকের কার্য্য করিবে। তোমার গর্জ্জন করা সার্থক হইবে।

আরতির সময় বেশ্যারা চামর ঢুলায়। তালে তালে তাহাদের পা নড়ে, তাহাদের চন্দ্রহারে ঝুন্ ঝুন্ শব্দ হয়। তাহাদের গহনার মণিমাণিক্যের শোভায় চামরের মণি বসান ডাঁটা ঝক্‌মক্ ঝক্‌মক্ করিতে থাকে। কিন্তু শেষ পর—স্ত্রীলোক ত—সুকুমার দেহ ত—খানিক চামর ঢুলাইলেই তাহাদের হাত ঝিমাইয়া আসে। যে হাতে রাত্রের নখের দাগ এখন একটু একটু চিড়্ চিড়্ করিতেছে, সেই হাত অবশ হইয়া আসে। সেই সময়ে—সেই মাহেন্দ্রযোগে—তুমি যদি

সেই চিড়্ চিড়্ করা দাগের উপর দুফোঁটা টাটকা জল ফেলিয়া দিতে পার, তাহাদের শরীর জুড়াইয়া আসিবে। আর তাহারা, তুমি বড় রসিক বুঝিয়া আড়ে আড় নয়নে তোমার দিকে চাহিতে থাকিবে। কাজল-পরা চোখের কোলে ঘোরাল কাল তারা দুইটী আসিয়া পড়িবে। প্রতি চাহনিতে বোধ হইবে একটী কাল ভোমরা বাহির হইয়া গেল; ক্রমে একটা দুইটা করিয়া এক সার ভোমরা সে চোখ হইতে বাহির হইয়া গেল।

এই সন্ধ্যার সময় মহাদেব তাণ্ডব নৃত্য করেন, একটা টাটকামারা হাতীর ছাল লইয়া তিনি নৃত্য করেন। রক্তাক্ত দিকটা নীচের দিকে থাকে, আর শুকনা পিট্‌টা উপর দিকে থাকে। তিনি চার হাত—চার হাতই বলি কেন—হিন্দু ভাস্করেরা ইচ্ছানুসারে ঠাকুরদের হাত জোড়া জোড়া বাড়াইয়া দিতে পারিত—মেলা হাত তুলিয়া সেই চামড়া-খান লুফেন আর লাফান। এ নৃত্য পার্ব্বতীর চক্ষুঃশূল—হাজার হোক স্ত্রীলোক ত, অত রক্তারক্তি ব্যাপার তাঁহার বড়ই গরপছন্দ। তাই বলিতেছিলাম, তুমি যদি পার্ব্বতীর প্রতি ভক্তি দেখাইতে চাও, তিনি স্নেহচক্ষে স্তিমিতনয়নে তোমায় দেখিবেন, ইহা যদি তুমি চাও, তবে গর্জ্জন করিও না; ডাকডোক ছাড়িও না। নীচের দিকে টাটকাফোটা জবাফুলের মত সন্ধ্যাকালের লালরঙ মাখিয়া মন্দিরের সামনে থাকিও; মহাদেব হাতীর চাম না লইয়া তোমায় লইয়াই নৃত্য করিবেন, পার্ব্বতী তোমায় আশীর্ব্বাদ করিবেন।

রাত্রি গভীর হইলে "শাট্যঞ্চলে বদনাবগুণ্ঠিত" করে যখন মদন-মনোমোহিনীরা নিজবাস পরিহার করত "প্রাণকান্তের নিকটাভি-সারিকা" হতে থাকবেন, যখন রাজপথ নিরেট অন্ধকারে আবৃত, এমনি নিরেট, যে ছুঁচ ফুটান যায়, তখন তুমি একটী কাজ করিও—তোমার সৌদামিনীকে একটু প্রকাশ করিও—তাহাকে চঞ্চলা চপলা হইতে বারণ করিও—সে যেন তোমার গায়ে কষ্টিপাথরে স্বর্ণরেখার ন্যায় খানিক নিশ্চল হইয়া থাকে। অভিসারিকারা যেন পথ দেখিয়া লইতে

পারে। দেখিও—সে সময়ে জল ঢালিও না—সে সময়ে গুড়্ গুড়্ শব্দে ডাকিও না—তাহারা, তুমি ডাকিলে,—একে অবলা—তাহাতে আবার পাছে কেহ টের পায়, সেই ভয়ে সদাই চকিতা—ভয়ে একেবারে হতবুদ্ধি-দিশাহারা হইয়া যাইবে।

সৌদামিনী এরূপ দীর্ঘকাল প্রকাশ হওয়ায়, অনেকক্ষণ ঝিক্‌মিক্ করায়, ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন। আহা সে ত তোমার চিরসঙ্গিনী রমণী, তাকে ত একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার। তাই বলি সে রাত্রিটা কোন উঁচা বাড়ীর চালে শুইয়া কাটাইয়া দিও। ওখানে কেহ তোমায় বিরক্ত করিবে না ; করার মধ্যে পায়রাগুলা, তা তাহারাও ঘুমাইয়া আছে। তাহার পর সূর্য্য দেখা দিলে পুনরায় বাকী পথটুকু চলিয়া যাইবে। বন্ধুর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া ভদ্রলোক ত কখন চুপ করিয়া থাকে না।

দেখ, সূর্য্যদেব একটী বড় খারাপ কাজ করিয়াছেন ; তিনি তাঁহার প্রিয়রমণী নলিনীকে ফেলিয়া সারারাত কোথায় ছিলেন ;—নলিনী বেচারা সারারাত কাঁদিয়া শিশিরের জলে ভরিয়া আছে। সকালবেলা অন্য লম্পট যেমন ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দুই হাতে অভাগিনী বিবাহিতা পত্নীদের চোখের জল মুছাইয়া দিয়া থাকে, আদর করে, সূর্য্যদেবও তেমনি আপনার সহস্রকরে নলিনীর চোখের জল মুছাইতে আসিবেন। তিনি দেবতা, যেমন বুঝিবেন তেমনি করিবেন, তুমি যেন মাঝে পড়িয়া তাহার কর রোধ করিও না। তাহা হইলে সূর্য্যের সঙ্গে তোমার মিছামিছি ঝগড়া বাড়িয়া যাইবে।

এইবার গম্ভীরা নদী—জল কি স্বচ্ছ—তরতর করিতেছে ; তলা দেখা যাইতেছে, যৌবনের প্রথম আরম্ভে ভাবুকের—কবির—প্রেমের প্রথম উদ্‌গমে প্রণয়িনী শকুন্তলার—হৃদয় এ জলের তুলনা পায় কি ? তুমি ত সুভগ—অঙ্গনার কামনার বস্তু, তুমি ছায়ারূপে একেবারে গম্ভীরার হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিবে। সে দেখিবামাত্র তোমায় তাহার নির্ম্মল হৃদয়ে ধরিয়া রাখিবে। আর অতি চপল পুঁটিমাছগুলাকে উল্‌টাইয়া উল্‌টাইয়া লাফাইতে দিয়া তোমার প্রতি চঞ্চল কটাক্ষে-

চাহিতে থাকিবে ; এ কটাক্ষে কাল নাই ; কুমুদ ফুলের মত শাদা — সব শাদা ; এ কটাক্ষের অর্থ জান ত — দেখিও যেন এই সময় জিতেন্দ্রিয় হইয়া বসিও না ; দেখিও তাহার সে উজ্জ্বল চক্ষের শাদা চাহনি নিষ্ফল করিও না।

হে সখে, তাহার খাদ অতি সরু ; তাহার খোলা প্রশস্ত ; খাদের জলের দুই পার্শ্বে দুই প্রকাণ্ড বালির চড়া, আর পাড় খুব উঁচা ; পাড় হইতে ঘোরাল নীলরঙের বেত গাছ ঝুলিয়া বালির চড়ায় পড়িয়াছে ; একটু সম্মুখে উচ্চ হইতে চাহিয়া দেখিলে বোধ হইবে খোলার দুই পাড় ক্রমে সরু হইয়া শেষ মিলিয়া গিয়াছে ; খাদের দুই পাড়ও অল্পের মধ্যেই ক্রমেই সরু হইয়া মিলিয়া গিয়াছে — এখন চড়াটার আকার কিরূপ হইয়াছে বুঝিয়াছ কি ? আরও বলি, নদীটা কূর্ম্মপৃষ্ঠ বিন্ধ্যের উপর হইতে উৎপন্ন হইয়া ঢালু জমীর উপর দিয়া নীচু মুখে চলিয়া যাইতেছে আর তুমি সেই বিন্ধ্যের উপর হইতে দেখিতেছ, বুঝিয়াছ কি চড়ার চেহারাটা কি রকম হইয়াছে ? তোমার নদী নায়িকা যেন তাহার পিছনের দিকে জলের নীলাম্বরী হাত দিয়া গুটাইয়া রাখিয়া তোমায় ডাকিতেছে ; আমার অদৃষ্ট মন্দ — আবার দেরি হইবে। তুমি কি ও অবস্থায় তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে ? তুমি ত ঝুলিতে ঝুলিতে যাও — তুমি কি এ মাহেন্দ্রযোগ ছাড়িতে পারিবে — ও যে ব্যানত রতি ; যত রতিবন্ধ আছে সবার উৎকৃষ্ট ; রতিবন্ধের চরম আস্বাদ ; যে একবার ইহার আস্বাদ পাইয়াছে সে কি কখনও ওরূপ বিবৃতজঘনা বিলাসবতী কামিনীকে ছাড়িয়া যাইতে পারে ? আমারই অদৃষ্ট মন্দ ; — দেরি হইয়া উঠিবে দেখিতেছি। হা ভগবান !

দেবগিরি উজ্জয়িনী হইতে মান্দাশোর যাইবার পথে চম্বল নদের অবিদূরে একটি উচা পাহাড়। গম্ভীরার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া তুমি যখন দেবগিরি যাইবে, তখন দারুণ গরম লুএর বাতাসের বদলে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে থাকিবে। প্রথম জলের আছড়া পাইয়া পৃথিবী হইতে যে সোঁদা গন্ধ বাহির হইবে, বায়ু সে গন্ধ মাখিয়া মাতিয়া উঠিবে।

হাতীগুলা গরমের চোটে অস্থির ; তাহাদের নাকের ভিতর গরমে জ্বলিয়া যাইতেছে ; শুঁড় তুলিয়া ঘড় ঘড় করিয়া সেই প্রথম ঠাণ্ডা বাতাস টানিতে থাকিবে, আর সেই ঠাণ্ডা বাতাসে সুদূর বিস্তীর্ণ যে যজ্ঞডুমুরের বন আছে, তাহার সব ফল পাকিয়া উঠিবে, ঠাণ্ডা মৃদু সুগন্ধে দেশ তর হইয়া যাইবে। মগজ ভরিয়া যাইবে।

দেবগিরি কার্ত্তিকের চিরবাসস্থান। কার্ত্তিক বড় কম দেবতা নন ; সাক্ষাৎ মহাদেবের সন্তান। তুমি দেবগিরিতে গিয়া ফুলে ভরা মেঘ হইবে ; ফুলগুলি মন্দাকিনীর জলে ভিজাইয়া লইবে আর শ্রাবণের ধারার ন্যায় সেই ফুলের ধারাবৃষ্টি করিয়া কার্ত্তিককে স্নান করাইয়া দিবে।

কার্ত্তিকের একটী ময়ূর আছে। তাহার মত ভাগ্যবান আর কি কেহ জগতে আছে ? তাহার যদি একটী পাখ্না খসিয়া পড়িল— সেই চাঁদওয়ালা চকচকে পাখ্না যদি খসিয়া পড়িল পার্ব্বতী অমনি - আহা কার্ত্তিকের ময়ূরের পাখা—বলিয়া তাহা কুড়াইয়া পদ্মের সঙ্গে মিশাইয়া কানে তুলিয়া লইলেন। এত ভাগ্য এ ভূভারতে আর কার আছে ? শুধু কি তাই—মহাদেব সে ময়ূরটীকে চোখে চোখে রাখেন, তাঁহার কপালের চাঁদের শাদা আলোয় তাহার শাদা চোখের একটা আশ্চর্য্য শোভা হয়। এমন যে ময়ূর, কার্ত্তিকের প্রিয়, শিবের প্রিয়, শিবার প্রিয়, তুমি তার একটু নোটিস নিও। তুমি গর্জ্জন করিও, সে গর্জ্জন গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত হইবে, আর সে ময়ূর তালে তালে নাচিতে থাকিবে।

কার্ত্তিকের পূজা সারিয়া তুমি ক্রমেই অগ্রসর হইতে থাকিবে। সিদ্ধ সিদ্ধা যুগলমিলনে আকাশপথে বীণা বাজাইয়া গান করিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারা—, পাছে জল লাগিয়া তার বেসুরা মারিয়া যায়, তাই তোমার পথ ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবে। তাহার পর তুমি চর্ম্মণ্বতীর মান রাখিবার জন্য ঝুলিয়া ঝুলিয়া নামিবে। চর্ম্মণ্বতী সামান্য নদী নহে। রন্তিদেব গোমেধযজ্ঞে এত গোবধ করিয়াছিলেন যে

তাহাদের চামড়া হইতে ঝরিয়া পড়া রক্তে একটী নদী হয়, — চর্ম্মণ্বতী সেই নদী।

চর্ম্মণ্বতীর প্রবাহ খুব বিস্তৃত, কিন্তু তথাপি উপর হইতে — দূর হইতে — দেখিলে অতি ক্ষীণ দেখাইবে। দেখিবে কোথাও বড় বড় পাথরের পাশ দিয়া কড় কড় করিয়া জল যাইতেছে ; কোথাও সড়াৎ করিয়া খানিকটা স্থির জল চলিয়া যাইতেছে। কোথাও একটু উপর হইতে পড়ায় ফেনময় হইয়া যাইতেছে। ফেনরাশি উপর হইতে মুক্তার মত দেখাইতেছে — নদীটী একটী মুক্তার হারের মত দেখাইতেছে। তাহারই মাঝখানে তুমি যদি চিকণ কালার রঙ চুরি করিয়া জল খাইতে নাম, গগনচারী দেবগণ নীচের দিকে চাহিয়া দেখিবেন — যেন মুক্তার মালায় একখানা বড় নীলমণি বসান রহিয়াছে।

চর্ম্মণ্বতী পার হইয়া দশপুর, এখন উহার নাম মান্দাশোর। দশপুর হইতে দশোর হইয়াছে। মহকুমা দশোর ক্রমে "মন্দ" অর্থাৎ সংক্ষেপ হইয়া মান্দাশোরে দাঁড়াইয়াছে। সেখানকার স্ত্রীলোকেরা সাভিলাষ দৃষ্টিতে তোমায় দেখিবে। তাহাদের ভ্রূলতা সদাই কাঁপিতেছে — সে ভ্রূভঙ্গিতে কত হাব কত ভাব প্রকাশ করিতেছে। তাহারা উপর দিকে চাহিলে প্রথম চোখের শাদা রঙ তাহার পর চোখের তারার কাল রঙ ছুটিতে থাকে ; বোধ হয় যেন কতকগুলা কুঁদ ফুল উপরের দিকে ছুড়িয়া ফেলা হইয়াছে ; ভোমরাগুলা সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছে।

তাহার পরে — অনেক পরে — ব্রহ্মাবর্ত্ত ; সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যে দেবনির্ম্মিত দেশ। আদিম আর্য্যভূমি — চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের উৎপত্তিস্থান। তুমি তাহার উপর ছায়াপাত করিয়া গমন করিবে। ক্রমে কুরুক্ষেত্র, তথায় আজিও সেই ঘোরতর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চিহ্নসকল বিদ্যমান আছে। এখানে, তুমি যেমন কমলবনের উপর জলধারা বর্ষণ কর, গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন তেমনি ক্ষত্রিয়গণের মুখোপরি শরবর্ষণ করিয়াছিলেন।

জান ত, বলরাম কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে কোন পক্ষ [redacted] করিয়া

সরস্বতীতীরে যোগসাধনে মগ্ন ছিলেন। তখন তিনি মদের পিয়ালা ত্যাগ করিয়াছিলেন—যে পিয়ালায় রেবতীর চক্ষু প্রতিফলিত হইত—সে পিয়ালা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তখন কেবল সরস্বতীর জলই তাঁহার পিপাসা দূর করিত ; তুমিও সেই সরস্বতীর জল পান করিবে, সে পবিত্র জলে তোমার ভিতরটা শুদ্ধ হইয়া যাইবে, কেবল বর্ণ টা মাত্র কাল থাকিবে।

সেখান হইতে কনখল যাইবে। কনখলে দক্ষযজ্ঞ হয়। সে যজ্ঞের কুণ্ড এখনও আছে। পাণ্ডারা পয়সা পাইলে এখনও তথায় হোম করিতে দেয়। কনখলের নিকটেই, ২।৩ মাইলের মধ্যেই গঙ্গা হিমালয় ছাড়িয়া সমতলে প্রবেশ করিতেছেন এবং সগরতনয়েরা স্বর্গে যাইবে বলিয়া সোপান পরম্পরার ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। হরিদ্বারের উচ্চতা সমুদ্রের জল হইতে ৫০০।৬০০ ফুট। সেখান হইতে যত উচ্চে যাইবে দেখিবে গঙ্গা ধাপে ধাপে উঠিয়াছেন ; ক্রমে ২২০০০ ফুট পর্য্যন্ত গঙ্গা উঠিয়াছেন। এই ধাপে ধাপে সগরতনয়েরা স্বর্গে গিয়াছেন। যেমন ধাপে ধাপে গঙ্গার জল নামিয়াছে, অমনি ধাপে ধাপে ফেনা রাশীকৃত হইয়া আছে। তুমি যখন উপর হইতে দেখিবে, বোধ হইবে, তুধারে উচ্চ উচ্চ পাহাড়ের মধ্য দিয়া গঙ্গার খোলা—তাহাতে দূরে দূরে রাশি রাশি ফেনা—যেন তুইটা ঠোঁটের মধ্যে কেবল হাসি ; ২২০০০ ফুট হইতে ৫০০ ফুট পর্য্যন্ত নামা পাহাড়ে এই হাসি দেখিলে বোধ হইবে যেন মা গঙ্গা গাল কাত করিয়া বিদ্রূপের হাসি—সর্ব্বনেশে হাসি হাসিতেছেন। গঙ্গোত্রী হইতে গঙ্গা উপর দিকে—যে দিকে বিষ্ণুর পাদ হইতে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে—কমণ্ডলু হইতে শিবের জটায়, এবং তথা হইতে হিমালয়ে পড়িতেছেন—তরঙ্গ হস্ত বিস্তার করিয়া গঙ্গা মহাদেবের মাথার কেশ ধরিয়াছেন। তরঙ্গ, কপালে যে চাঁদের কলা আছে, তথায় আঘাত করিতেছে ; দেখিল সতিনী গৌরী ঈর্ষাকষায়িত লোচনে ভ্রূকুটী করিতেছেন, তাই গঙ্গা গাল কাত করিয়া হাসিতেছেন।

গঙ্গার জল শাদা—নির্ম্মল, ফটিকের মত শাদা। তোমার সহিত সুরগজের বেশ তুলনা হইতে পারে ; তুমি কাল। তুমি শুঁড়ের মত ডগ বাড়াইয়া জল খাও, তুমি যেখানে গঙ্গার জল খাইবার জন্য নামিবে তথায় তোমার কাল ছায়া সেই শাদা জলে খেলিতে থাকিবে ; বোধ হইবে প্রয়াগ ছাড়া আর এক জায়গায় গঙ্গা যমুনার মিলন হইল।

ক্রমে উঠিয়া তুমি হিমাচলে যাইবে। ইনিই গঙ্গার পিতা ; ইনি বরফে সর্ব্বদা আবৃত। এই পর্ব্বতে উঠিয়া তুমি যখন বরফের চূড়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিবে, বোধ হইবে যেন মহাদেবের ষাঁড়ের সিংএ পাঁক—এঁটেলা মাটি লাগিয়া আছে।

তুমি দেখিবে হয়ত সরল গাছের কাঁধে কাঁধে ঘেঁষ লাগিয়া দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ফুলকি উড়িয়া চমরী মৃগের লেজে পড়িতেছে আর তাহার লেজটী পুড়িয়া যাইতেছে। যদি এরূপ দেখিতে পাও তবে সহস্র সহস্র বারিধারা বর্ষণ করিয়া সে অগ্নি নির্ব্বাণ করিও। বড় লোকের সম্পদের ফল কেবল বিপন্নগণের বিপদ নিবারণ।

সেখানে আটপেয়ে মৃগ আছে। তাহারা যদি লাফাইয়া তোমায় ডিঙ্গাইয়া যাইবার জন্য আসে, শিল, বৃষ্টি, ঝড়, অন্ধকার করিয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিবে। বিফল কাজে চেষ্টা করিতে গেলে কাহার না অবমান হয়।

সেখানে দেখিবে পাথরের উপর স্পষ্ট মহাদেবের চরণচিহ্ন বিদ্য-মান রহিয়াছে। সিদ্ধগণ সততই সেখানে পূজা দিতেছে। তুমি ভক্তি ভাবে ভোর হইয়া নীচে নামিয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিবে। শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক ঐ পাদপদ্ম দর্শন করিলে ভক্তেরা দেহান্তের পর অবিনশ্বর গণপদ পাইবার অধিকারী হন।

সেখানে বড় বড় বাঁশ গাছ আছে। সেই বাঁশে মাঝে মাঝে ছেঁদা আছে ; সেই ছেঁদার মুখে বায়ু বহিতে থাকিলে পোঁ ওঁ ওঁ ওঁ করিয়া শব্দ হয়। সেখানে কিন্নরী অর্থাৎ বাঙ্গালায় যাহাদের কান বলে (যথা মধো কান) তাহাদের স্ত্রীলোকেরা একযোগে মহাদেবের মহিমা-

ঘোষণার্থ ত্রিপুর বিজয় গাহিতেছে। ইহার উপর যদি মেঘ ডাকিতে থাকে—সে ডাক যদি কন্দরায় কন্দরায় প্রতিধ্বনিত হইয়া পাখো-য়াজের কাজ করে, তাহা হইলে মহাদেবের গান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠে। একেবারে concert হয়।

হিমালয়ে অনেক দেখার জিনিস আছে। সে সব একে একে দেখিয়া ঞীতি পাসে উপস্থিত হইবে। ১৬০০০ ফুটেরও উপর একটা পাস আছে অতি উচ্চ দুইটা পাহাড়ের মধ্য দিয়া একটা ঘুলঘুলি মত আছে, তাই দিয়া তিব্বতে ও ভারতে যাতায়াত চলে। সেই গলির—ঘুলঘুলির ভিতর দিয়া তোমায় যাইতে হইবে। ঐ গলিই কি আগে ছিল? আগে উহা নিরেট পর্ব্বত ছিল। পরশুরাম বাণ মারিয়া পাহাড় ফাঁড়িয়া ঐ গলিটুকু বাহির করিয়া দেন।

এতক্ষণ তোমার যাবার মত প্রশস্ত অবাধ পথ পাইয়াছিলে, এখন আর তেমন পথ নাই। ঐ গলির ভিতর দিয়া তোমায় যাইতে হইবে। তুমি সহজে ডানা মেলা পাখীর মত যাইতে পারিবে না। তোমায় কাত হইয়া যাইতে হইবে—আরও কাত—আরও কাত—আরও কাত হইয়া যাইতে হইবে। নারায়ণ বলিচ্ছলনাকালে যেমন একটা পা উঁচা করিয়া—তের্‌চা করিয়া দিয়াছিলেন, তোমায় তেমনি ভাবে যাইতে হইবে। এই পাস পার হইয়াই দেখিবে কৈলাস। সব শাদা—স্বর্গের রমণীগণের আর এখানে আরসীর দরকার হয় না। স্বচ্ছ বরফাবৃত কৈলাসই তাহাদের দর্পণের কাজ করে। তাহার বড় বড় শিখর—সব বড় বড় বরফাবৃত—শাদার উপর শাদা—গাদা গাদা শাদা—যেন কুমুদ ফুলের রাশি চারিদিকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। যেন মহাদেবের অট্টহাস, দিনকের দিন জমা করিয়া বড় বড় গাদা দিয়া রাখিয়াছে।

কাজলের রঙে চোখ জুড়াইয়া যায়; কাজলের ডেলা যদি ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়, ভিতরের রঙ কতই নয়নরঞ্জন হয়, তোমার রঙ ঠিক কাজলের ডেলাভাঙ্গা রঙ; আর কৈলাসের রঙ কেমন? এইমাত্র যে

হাতীর দাঁতটী চেরা হইল, তাহার ভিতরকার রঙের মত চকচকে, চোখ-জুড়ান প্রাণ-জুড়ান শাদা। এই কাল তুমি যখন এই শাদা চূড়ায় বসিবে তখন লোকে একদৃষ্টে দেখিবে যেন বলরামের বিরাট শাদা দেহে – কাঁধে নীলাম্বরী ফেলা আছে।

এখানে গিয়া যদি দেখ মহাদেব হাত বাড়াইয়া দিয়াছেন, পাছে পার্ব্বতী ভয় পান বলিয়া সাপের বালা ফেলিয়া দিয়াছেন, আর পার্ব্বতী সে হাত ধরিয়া পদব্রজে ক্রীড়াশৈলে উঠিতেছেন, তবে এক কাজ করিবে। তোমার দেহমধ্যে যে জল আছে সে জলকে স্তম্ভন করিবে ; পর্ব্বত যে ভঙ্গীতে উঠিতেছে সেই ভঙ্গীতে আপনার দেহটী পর্ব্বতের গায়ে বসাইবে। তুমি যেন একটা গদীপাতা সিঁড়ি হইবে ; আর পার্ব্বতীর উঠিতে কোনই কষ্ট হইবে না।

বেদের মতে আর কালিদাসেরও মতে মেঘটা একটা জল ভরা ভিস্তীর মত। তুমি হাতের কাছে আসিলে সুরযুবতীরা বালার হীরার খোঁচা মারিয়া তোমার গায়ে ছেঁদা করিয়া দিবে, তাহাতে তোমা হইতে সহস্র ঝারার ন্যায় জল পড়িবে। তোমার সঙ্গে যাহারা এরূপ কু-ব্যবহার করিবে, তুমি জল ঢালিয়া তাহাদের জব্দ করিবার চেষ্টা করিবে। যদি সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়, খুব গড় গড়, গড় গড়, করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিবে। খেলা করিতে গিয়া তাহারা চাপল্য দেখাইয়াছে বই নয় ; তাহারা ভয়ে জড় সড় হইয়া উঠিবে।

তুমি মানসসরোবরের জল গ্রহণ করিবে। ঐ জলে সোনার শত-সহস্র পদ্ম ফুটিয়া আছে। তুমি ঐরাবতের মুখে লাগিবে। মুখে কাপড় দিলে যেমন আনন্দ হয় ঐরাবতের ক্ষণকাল তেমনি আনন্দ হইবে। যেমন বাতাসে কাপড় নড়ে তেমনি তুমি কল্পদ্রুমের পাতা-গুলি নাড়িবে। এইরূপে নানা প্রকারে – হে জলদ, তুমি সেই পর্ব্বত-রাজকে উপভোগ করিবে।

সেই পর্ব্বতের ক্রোড়ে নগরী। পর্ব্বত যেমন উঁচানীচা হইয়াছে, সেই বশে পর্ব্বতগাত্রে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া নগরী হইয়াছে, বোধ

হইতেছে কোন রসিকা প্রণয়ী পর্ব্বতের ক্রোড়ে এলোথেলো হইয়া শুইয়া আছে। পাশ দিয়া গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে। মেঘ দক্ষিণে একটু দূর হইতে—উচ্চ হইতে—দেখিতেছে যেন একখানা আঁচলা পড়িয়া আছে। বোধ হইবে এ আর কিছুই নহে—ঐ কামিনীর কাপড়খান; একটী কোণ মাত্র গায়ে ঠেকিয়া আছে। মেঘের সময়ে এই নগরের বড় বড় বাড়ীতে (যাহার ছাত খোলার তৈয়ারি চালমাত্র) চালে মেঘ পড়িয়া আছে। খোলা বাহিয়া জলবিন্দু পড়িতেছে, বোধ হইতেছে যেন কামিনীকুলের নিবিড় কৃষ্ণ ঝাপটার কেশে মুক্তার মালা ঝুলিতেছে। এই নগর দেখিয়া তুমি উহাকে যে অলকা বলিয়া চিনিতে পারিবে না —এমত কথাই নহে।

এতদূরে পূর্ব্বমেঘের ব্যাখ্যা শেষ হইল। পূর্ব্বমেঘে সমস্ত জড়-পদার্থ ই চৈতন্যময়। মেঘ চেতন, রামগিরি চেতন, আম্রকূট চেতন, নর্ম্মদা চেতন, বেত্রবতী, নির্ব্বিন্ধ্যা, গম্ভীরা, গন্ধবতী সবই চেতন। নদীগুলি বিশেষ চৈতন্যময়, প্রেমময়, প্রেমোন্মাদময়। কালিদাস প্রতি কথায় তাহাদের চৈতন্য, বুদ্ধি, ও হৃদয় দেখাইয়াছেন; তাহারা সকলেই মেঘের প্রেমে আকুল। প্রেমে আকুল হইলে মানুষে যাহা করিয়া থাকে—তাহারা সে সকলই করিতেছে; আমরা আর তাহাদিগকে জড় বলিয়া বুঝিতেই পারিতেছি না। এইরূপে কালিদাস রামগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া অলকা পর্য্যন্ত সমস্ত জড় জগৎকে চৈতন্যময় করিয়াছেন; যেন এই সমস্ত স্থানের নদনদী, পর্ব্বত, কন্দর, ভূচর, খেচর, জলচর, এমন কি পুঁটি মাছটী পর্য্যন্ত যক্ষের দুঃখে দুঃখী, যক্ষের বিরহে কাতর। যক্ষের দূত হইয়া মেঘ অলকায় যাইতেছে; সকলে মিলিয়া মেঘকে খুসী করিবার চেষ্টা করিতেছে; কেহ শিখরে স্থান দিতেছে; কেহ অট্টালিকার অগ্রদেশে ধারণ করিতেছে; কেহ জল দিয়া উহার দেহে বল জন্মাইয়া দিতেছে। কেহ বা জল বাহির করিয়া উহার গতিলাঘব সম্পাদন করিতেছে। সমস্ত জড় জগতে যেন কেমন একটা একপ্রাণতা জন্মিয়া গিয়াছে। মেঘটী যক্ষের প্রাণ—মেঘ যাই-

তেছে, আমরা যেন দেখিতেছি যক্ষের প্রাণই ছুটিতেছে ; আর যাহা কিছু দেখিতেছে আপনার উপযোগী করিয়া—আপনার করিয়া লইতেছে ; আপনার প্রাণের সহিত—প্রেমময় আবেশময় ভাবের সহিত মাখিয়া লইতেছে। তাই জড়ের এত সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে। রঘুবংশের ত্রয়োদশে সমস্ত জগৎ, সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, কানন যেমন রামসীতার পুনর্মিলনে একটা আনন্দের, সুখের, স্বপ্নের ছায়ায় আনন্দময়, সুখময়, স্বপ্নময় হইয়া উঠিতেছে, মেঘদূতে তেমনি সমস্ত জগৎ যক্ষের বিরহে—যক্ষের ভোগলালসায়—যক্ষের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া যাইতেছে। রঘুর ত্রয়োদশে রাম আনন্দে বিভোর হইয়া—শত্রুনাশ হইয়াছে,—সীতার উদ্ধার হইয়াছে,—জগৎ জুড়িয়া বীরকীর্ত্তি ঘোষণা হইয়াছে,—বংশের কলঙ্ক ক্ষালন হইয়াছে,—তাই—আনন্দে বিভোর হইয়া সীতাকে জগৎ দেখাইতেছেন ; জগৎও যেন সেই মহা আনন্দে বিভোর। যক্ষ বেচারা পরম আনন্দে ছিল। মনের মত মানুষ পাইয়াছিল, প্রেমে—সুখে—মোহে—আর মোহিনীতে মজিয়াছিল, হঠাৎ তাহার উপর ঘোর দণ্ডাজ্ঞা। সে একেবারে মরমে মরিয়া গেল। উহারা দেবযোনি, মানুষ ত নয়, যে প্রতিহিংসার চেষ্টা করিবে ; কুবেরকে শিক্ষা দিবে। সে জানিল এ শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে—এখন কেবল একটা সংবাদ দিয়া স্ত্রীটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলেই মঙ্গল। তাহার আর ভাবনা নাই ; কেবল স্ত্রীর ভাবনা, সেই ভাবনা সে জগৎময় ছড়াইয়াছে।

রঘুবংশে রাম ও সীতা সশরীরে যাইতেছেন, তাঁহারা নারায়ণ ও লক্ষ্মীর অবতার ; জড় জগৎ তাঁহাদের অনেক নীচে। তাঁহারা উপর দিয়া যাইতেছেন,—কখন মেঘের নীচে দিয়া, কখন মেঘের মধ্য দিয়া, কখন মেঘের অনেক উপর দিয়া যাইতেছেন। দেবতাদেরও যাঁহারা দেবতা তাঁহাদের যেরূপ সরঞ্জামে যাওয়া উচিত, রামসীতাও সেইরূপ সরঞ্জামে যাইতেছেন। জড় জগৎ হইতে তাঁহারা অনেক দূরে—অনেক উপরে। তাঁহারা চৈতন্যেরও চৈতন্য। জড় জগৎ তাঁহাদের

কাছে সামান্য, তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর—খেলার জিনিস। আর মেঘদূতে যক্ষ বেচারা আপনার দুঃখমাখা, বিরহমাখা, প্রাণটাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার জড় দেহ কোথায় পড়িয়া আছে। যে ছুটিতেছে সে অধিক উঠিতে পারিতেছে না, কিন্তু অনেক নীচে নামিতেছে। নদীর খোলায় পড়িতেছে, খাদে পড়িতেছে, জড় জগতের সঙ্গে মিলিতেছে, মিশিতেছে, এক হইয়া যাইতেছে। দুঃখ দুর্ভরতা-সত্ত্বেও—প্রাণের কান্না সত্ত্বেও—সে যেন জড় জগৎ উপভোগ করিয়া যাইতেছে। উপভোগ করিয়া যাইতেছেই বা বলি কেন? সে যেন সমস্ত জড় জগতের নিকট সমবেদনার মুষ্টি ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াইতেছে। আর কবির কবি, কবিকুলের গুরু, তাহার উপর সেই সমবেদনা ঢালিয়া দিতেছেন; জগৎময় তাহার জন্য সমবেদনার উৎস খুলিয়া রাখিয়াছেন।

'কালিদাস-ব্যাখ্যা' ১৩০৯